Peace

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

ইসলামী দিবসসমূহ

বার চাঁন্দের ফযিলত
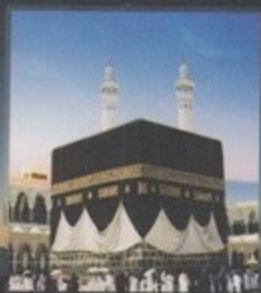
মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

ইসলামী দিবস

বারো চাঁদের ফযিলত

মূল

সাঈদ ইবন আলী আল-কাহতানী

আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

এম.এম, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম

এম.এফ, এম.এ

মুফাসসির

তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন

বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম

পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি

আরবি প্রভাষক

নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা

মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ইসলামী দিবস

বারো চাঁদের ফযিলত

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২; ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর - ২০১২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : আরজু বাঁধাই, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : বাকো প্রেস

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

প্রকাশকের কথা

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

'ইসলামী দিবস ও বারো চাঁদের ফযিলত' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। রাসূলে করীম ﷺ-এর একটি হাদীস যদি এ প্রসঙ্গে না লিখি তাহলে এ গ্রন্থটি সম্পূর্ণই অপূর্ণতা থেকে যাবে। তা হলো- اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ - তোমার দ্বীনকে বিশুদ্ধ কর তাহলে অল্প আমলই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে (বুখারী)। রাসূলে করীম ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে ইরশাদ করেছেন- আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি একটি হলো কুরআন অন্যটি হাদীস। তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

আর তাছাড়া আল্লাহ তাআলা সূরা মুলকের ২ নং আয়াতে বলেছেন কে উত্তম আমল করে সেটা তিনি পরীক্ষা করবেন। তাই বেশি আমলের চিন্তা না করে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক অল্প আমল করলেই নাজাতের আশা করা যায়।

বর্তমানে বারো চাঁদের ফযিলত নামক অনেক গ্রন্থই বাজারে পাওয়া যায়। যা কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা তো প্রমাণিত নয়; বরং জাল হাদীস দ্বারাও নয়। সুতরাং যে আমল কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয় তা কখনো ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে না।

যেমন একটি উদাহরণ দিলে আরো সহজে বুঝা যাবে বিষয়টি, বছরে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ, সে ৫ দিন হলো দুই ঈদের দুই দিন এবং কোরবানী ঈদের পরের ৩ দিন। কেউ যদি তাকওয়ার আরো বেশি পরিচয় দিতে গিয়ে এ হারাম ৫ দিন রোযা রাখে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে অসন্তুষ্টই হবেন এবং পাপী বলে গণ্য হবেন। কেননা

আল্লাহ তায়ালাই এ ৫ দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ ৫ দিন রোযা না রাখাই তাকওয়ার সর্বোচ্চ পরিচয়।

সুতরাং যে কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। কোনো পীর, বাবা, গাউছ কুতুব বা কোনো বড় আলেমের কথা দ্বারা কোনো কাজ ইবাদত বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না।

এ গ্রন্থটি আমরা ৪টি অংশে বিভক্ত করেছি। যথা– ১. মাস, সপ্তাহ ও দিনের পরিচয়, ২. ইসলামী দিবসসমূহ, ৩. প্রচলিত দিবস যা ইসলাম স্বীকৃত নয়, ৪. দৈনন্দিন আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার।

তবে পাঠকদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন আমরা এ মূল্যবান গ্রন্থটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সংকলন করতে চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি করিনি। তবে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে, তা পাঠকরা আমাদের গোচরে আনলে কৃতজ্ঞ থাকব।

এ গ্রন্থটি সংকলন ও প্রকাশ করতে আমরা যে সকল গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি তা হলো–

১. হিসনুল মুসলিমিন– সাঈদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী।

২. বরকতময় দিনগুলো – আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন।

৩. বারো মাসের তের পর্ব– আবদুল হামিদ ফাইযী।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট বিনীত ও কায়মনো বাক্যে দোয়া করি সূরা বাকারার ২০১ আয়াত দ্বারা এভাবে যে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

বইটি প্রকাশ করতে যার কথা ও ফতোয়া আমার বিবেককে খুব বেশি অনুপ্রেরণা দিয়ে জাগ্রত করেছে তিনি হলেন-

মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র.)। তিনি তাঁর তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনে বলেন, "ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয।"

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
মাস, সপ্তাহ ও দিনের পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামী দিবসসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রচলিত দিবস যা ইসলাম স্বীকৃত না

চতুর্থ অধ্যায়

দৈনন্দিন আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার

প্রথম অধ্যায়

মাস, সপ্তাহ ও দিনের পরিচয়

১. আরবি ১২টি মাস পেলাম যেভাবে

মানুষ তার জীবনের স্মৃতিময় দিনগুলোকে স্মৃতি হিসেবে পালন করার জন্য বিভিন্নভাবে দিন, মাস ও সময় গণনা করে থাকে। চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমে সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। হিজরী সাল প্রবর্তনের পূর্বে আরবরা তাদের বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনার উপর নির্ভর করে দিন গণনা করত। যেমন : রাসূল ﷺ-এর আগমনের প্রায় ৪০ দিন পূর্বে সংঘটিত আবরাহা কর্তৃক কাবা ঘর ধ্বংস করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা দিন গণনা করত। এই গণনার জন্য হিজরী সন অন্যতম ইসলামী পদ্ধতি।

উমর (রা)-এর যুগে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হিসেব করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আলী (রা)সহ বিভিন্ন সাহাবীদের পরামর্শে একটি নির্দিষ্ট সন গণনার পরামর্শ চলে। এতে কেউ রাসূল ﷺ-এর জন্ম থেকে সাল গণনা করার কথা বলেন, কেউ বা তার ওপর ওহী আসার দিন থেকে, কেউ আবার তার ওফাত থেকে সাল গণনা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর হিজরতের ঘটনা থেকে সাল গণনার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এতে সকল সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেন। কেননা, হিজরত সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

২. হিজরী সনের ইতিহাস

"আল-উকদুদ দিরায়া" নামক গ্রন্থে রয়েছে- ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এর শাসনামলে উমর (রা)-এর নিকট একটি চুক্তি পত্র উপস্থিত করা হলো। সেখানে শা'বান মাসের কথা উল্লেখ ছিল। তখন উমর (রা) বললেন, এটা কি গত শা'বান না আগামী শাবান মাস? অতঃপর তিনি তারিখ গণনার নির্দেশ প্রদান করলেন এবং রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরী সন গণনার সূচনা করেন। আর মুহাররমকে প্রথম মাস হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল ﷺ হিজরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই। সেই দিনকে মুহাররম মাসের শুক্রবার হিসেবে ধরে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়। উক্ত হিজরী হিসেবের প্রথম প্রয়োগ ঘটে উমর (রা)-এর শাসনামলের ৩০ জমাদিউল উখরা / ১৭ হিজরী অর্থাৎ, ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় আজও হিজরী সন চলে আসছে।

৩. হিজরী মাসের নামকরণ

হিজরী সন গণনার পূর্বে আরবরা আরবী মাসসমূহকে ব্যবহার করত। অন্যান্য সকল সনের মতো হিজরী সনেরও ১২টি মাস। কেননা, আল্লাহর কাছেও ১২ মাসে এক বছর।

যেমন, তিনি ঘোষণা করেন–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۔

“নিশ্চয় আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।” (সূরা তাওবাহ: আয়াত-৩৬)

মহানবী ﷺ যখন হিজরত করেন তখন ছিল রবিউল আউয়াল মাস। প্রশ্ন দেখা যায়, তাহলে ঐ মাসে না হয়ে মুহররম মাসে হলো কিভাবে? মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, “নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনার মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থাকে। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। (সূরা তাওবা : আয়াত-৩৬)

এ আয়াতের চারটি সম্মানিত মাসকে চিহ্নিত করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলেন, তিনটি মাস হলো যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহররম এবং অপরটি হলো রজব। (তাফসীর ইবনে কাসির)

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনে লিখেছেন– উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত রয়েছে, তা মানব রচিত নয়; বরং মহান রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই মাসের তারতীব ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্র মাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্র মাসের হিসাব মতেই রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মজীদ চন্দ্রকে

যেমন, তেমনি সূর্যকেও সাল তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে। সুতরাং, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সাল-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। তাই শরীয়তের বিধি-বিধানকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এ জন্য চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে কেফায়া। সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রে হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইমাম বাগাভী (রহ) তাঁর গ্রন্থ তাফসীরে বাগাভীতে উল্লেখ করেছেন–

وَهِيَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرُ وَرَبِيْعُ الْاَوَّلِ وَشَهْرُ رَبِيْعُ الثَّانِيْ وَجَمَادَى الْاُوْلَى وَجَمَادِىُ الْاُخْرَةَ وَرَجَبُ وَشَعْبَانُ وَشَهْرُ رَمَضَانُ وَشَوَّالُ وَذُوالْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ ـ مِنَ الشُّهُوْرِ اَرْبَعَةُ حُرُمٌ وَهِيَ : رَجَبُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ـ

“বারো মাস হলো, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস ছানী, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী, রজব, শা'বান, রমজান, শাওয়াল, জুলকদ এবং যুলহজ্ব। আর হারাম বা সম্মানিত চারটি মাস হলো– মুহররম, রজব, যুলক্বদ ও যুলহজ্ব।

(তাফসীরে বাগাভী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৪) ও (শামেলা) www.qurancomplex.com)

৪. আরবি বারো মাসের নামকরণের কারণ

১. اَلْمُحَرَّمُ **মুহাররম :** মহররম-এর অর্থ হলো পবিত্র, সম্মানিত। যেহেতু, এটি হারাম মাসের একটি। তাই একে মুহাররম হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

২. صَفَرٌ **সফর :** সফর শব্দের অর্থ খালি হওয়া। কেননা, হারাম মাস মুহাররমের পরে সবাই ঘর ছেড়ে যুদ্ধে বের হতো, তাই একে সফর বা খালি নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৩ ও ৪. رَبِيْعُ الْاَوَّلِ، رَبِيْعُ الثَّانِيْ **রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী :** এ দুই মাস নামকরণের সময় রবি' তথা বসন্তকালে এসেছে। তাই এ দুই মাসকে প্রথম বসন্ত ও দ্বিতীয় বসন্ত অর্থাৎ, রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানী নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৫ ও ৬. وَجَمَادَى الْاُوْلَى وَجَمَادِىُ الْاُخْرَةُ **জমাদিউল উলা, জমাদিউল উখরা :** জমদ' শব্দের অর্থ হলো– বরফ জমাট বাধা। যেহেতু, এ দু মাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়া হওয়ার কারণে বরফ জমাট বাধে, তাই মাসদ্বয়ের নাম জমাদিউল উলা ও জমাদিউল উখরা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৭. رَجَبُ **রজব :** রজব শব্দের অর্থ সম্মান করা। যেহেতু এ মাসকে সম্মান করে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা হয়, তাই এ মাসকে রজব নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৮. شَعْبَانُ **শা'বান :** এর অর্থ হলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া। যেহেতু হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকার পর আরবরা শা'বান মাসে আবার তাদের আক্রমণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতো, তাই একে শা'বান নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৯. رَمَضَانُ **রমযান :** 'রমজ' শব্দের অর্থ– দগ্ধ হওয়া। রমযান মাসে গরমের প্রচণ্ডতার কারণে এ মাসকে রমযান নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ মাসের নাম মহা গ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ আছে।

১০. شَوَّالُ **শাওয়াল :** শাওয়াল শব্দের অর্থ– কমে যাওয়া। যেহেতু, সে সময়ে আরবদের উটের দুধ নানা কারণে কমে যেত। তাই এ মাসকে শাওয়াল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১১. ذُوالْقَعْدَةُ **যুলক্বদ :** 'কদ' শব্দের অর্থ বসে থাকা। যেহেতু, সম্মানিত ও হারাম মাস হওয়ার কারণে আরবরা যুদ্ধ-বিগ্রহে না গিয়ে বসে থাকতো, তাই একে যিলক্বদ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১২. ذُو الْحَجَّةُ **যুলহজ্জ :** যুলহজ্জ শব্দের অর্থ হজওয়ালা। যেহেতু এ মাস হজ্জের মাস। তাই একে যুলহজ্জ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(www.ahlalhdeeth.com أَسْمَاءُ الشُّهُوْرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ)

৫. চন্দ্রমাস বা হিজরী সনের গুরুত্ব

১. আল্লাহর আদেশ : হিজরী সন হলো চন্দ্রমাস। আর আল্লাহ্ তায়ালা চন্দ্রকে সময় নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মানার্থে হিজরী সন গণনা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاس وَالْحَجِّ ـ

অর্থাৎ, লোকেরা আপনাকে নবচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তা হলো মানুষের এবং হজের জন্য সময় নির্ধারণকারী। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে পঞ্জিকাস্বরূপ চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য, চন্দ্রমাস তথা হিজরী সনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. আল্লাহর নিদর্শন : মহান আল্লাহ্ চন্দ্রমাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ـ

অর্থাৎ, আমি রাত ও দিনকে করেছি দৃষ্টি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্জ্বল করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে সক্ষম হও এবং রাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যাও হিসাব করতে পার এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করছি।

(সূরা ইসরা: আয়াত-১২)

এ আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর বান্দাদের সাল গণনা ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশের দিন-রাতকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. রাসূল ﷺ-এর স্মৃতিচারণ : হিজরী সাল গণনা করা হয় রাসূল ﷺ-এর হিজরতের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ফলে হিজরী সন ব্যবহার ও গণনার ফলে রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা) সেই হিজরতের ঘটনা মুসলিম হৃদয়ে বার বার দোলা দেয়।

৪. ইবাদত-বন্দেগী আদায় : ইসলামের অধিকাংশ ইবাদত-বন্দেগী যেমন : রোযা, হজ্জ, কুরবানী, শবে-কদর, শবে-বরাত, আশুরা ইত্যাদি ইবাদত হিজরী সনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে হিজরী সনের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ইবাদাত-বন্দেগী পালন করে: মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন লাভ করা সম্ভব হয়। এজন্য তাফসীরে মাআ'রেফুল কুরআনে, হিজরী সন তথা চন্দ্রমাস গণনাকে ফরযে-কেফায়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যদি উম্মতের একজনও এর ব্যবহার না করে তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ গোনাহগার হিসেবে সাব্যস্থ হবে।

৫. খোলাফায়ে রাশেদার অনুকরণ : হিজরী সন হলো উমর (রা)-এর শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত। আর, রাসূল ﷺ তাঁর এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরার জন্য আদেশ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ .

"তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরা।" (মুশকিলুল আসার লিত তহাবী, হাদীস-৯৯৮)

৬. মুসলিম ঐতিহ্যের অনুকরণ : হিজরী সন গণনা ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণ। এজন্য চন্দ্রমাস হিসেবে হিজরী সন গণনা করা মুসলমানদের জন্য কর্তব্য।

৭. ইহুদী ও নাসারাদের বিরোধিতা : হিজরী সন ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তব নমুনা। যা অন্যান্য জাতির ঐতিহ্য বিরোধিতা করতে শেখায়, শেখায় নিজ ঐতিহ্যকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে।

কেনেনা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلاَبِالنَّصَارٰى -

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে অন্যান্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখে। তোমরা ইহুদী অথবা নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না।" (জামে তিরমিযী, হাদীস-২৬৯৫)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রমাস গণনা তথা হিজরী সন গণনা করা আল্লাহর বিধান ও মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ। কাজেই একজন মুসলমান হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ইংরেজি সনের পাশাপাশি হিজরী সনের ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

আরবি সপ্তাহের ৭ দিনের নাম ও অর্থ

সপ্তাহের নাম	আরবি	উচ্চারণ	অর্থ
রবিবার	يَوْمُ الْاَحَدِ	ইয়াওমুল আহাদি	১ম দিন
সোমবার	يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ	ইয়াওমুল ইছনা-নি	২য় দিন
মঙ্গলবার	يَوْمُ الثُّلَثَاءِ	ইয়াওমুল ছুলাছা-ই	৩য় দিন
বুধবার	يَوْمُ الْاَرْبَعَاءِ	ইয়াওমুল আরবা'আ-ই	৪র্থ দিন
বৃহস্পতিবার	يَوْمُ الْخَمِيْسِ	ইয়াওমুল খামিসি	৫ম দিন
জুমাবার	يَوْمُ الْجُمُعَةِ/الْعَرْضِ	ইয়াওমুল জুম'আতি	৬ষ্ঠ দিন
শনিবার	يَوْمُ السَّبْتِ	ইয়াওমুল সাবতি	বিশ্রামের দিন

১. ইহুদিদের মতে বিশ্ব সৃষ্টির দিন হলো শনিবার।

২. খ্রিস্টানরা মনে করে বিশ্বসৃষ্টির দিন হলো রবিবার।

তাই ইহুদীদের জন্য বন্ধের দিন শনিবার আর খ্রিস্টানদের জন্য রবিবার।

আল্লাহ তায়ালা ৬ দিনে তাঁর সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেন।

কুরআন মাজীদের ৭টি সূরার ৭টি আয়াতে বিস্তারিত আছে–

১. ৭–সূরা আ'রাফ : আয়াত-৫৪,
২. ১০–সূরা ইউনুস : আয়াত-৩
৩. ১১–সূরা হূদ : আয়াত-৭,
৪. ২৫–সূরা ফুরকান : আয়াত-৫৯
৫. ৩২–সূরা সিজদাহ : আয়াত-৪,
৬. ৫০–সূরা ক্বাফ : আয়াত-৩৮
৭. ৫৭–সূরা হাদীদ : আয়াত-৪

এ হিসেবে ১ম দিন রবিবার শেষ দিন জুমাবার এবং বিশ্রামের দিন শনিবার। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অন্তত ৬টি সূরায় উল্লেখ আছে–

১. ৭–সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৬৩,
২. ২–সূরা বাকারা : আয়াত-৬৫
৩. ৪–সূরা আন নিসা : আয়াত-৪৭,১৫৪,
৪. ১৬–সূরা নাহল : আয়াত-১২৪
৫. ২৫–সূরা ফুরকান : আয়াত-৪৭,
৬. ৭৮–সূরা নাবা : আয়াত-৯

৭. জুমু'আর নামকরণের ইতিহাস

হাফিয আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ এবং হাফিয আব্দুর রাযযাক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার এবং জুমু'আর নামাযের হুকুম আসার পূর্বে একবার মদীনাবাসীগণ একত্রিত হলে আনসারগণ বলেন, ইয়াহুদীরা প্রতি সপ্তাহে (শনিবার) একদিন একত্রিত হয় এবং খ্রিস্টানরাও (রবিবার) একদিন সমবেত হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত কোন একদিন একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর ও শুকর আদায় করা। অতঃপর এর জন্য আনসাররা 'আরূবার' দিনটিকে ধার্য করে এবং আসআদ ইবনে যুরারার বাড়িতে একত্রিত হয়। তিনি সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন এবং কিছু ওয়ায-নসীহত প্রদান করেন। ফলে লোকদের জমায়েত হবার কারণে ঐ দিনটির নাম 'জুমু'আর দিন' অর্থাৎ জমায়েতের দিন নামে অভিহিত করা হয়।
(মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক)

হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ) বলেন, এই হাদীসটি মুরসাল। কিন্তু এর রাবীগণ সবাই বিশ্বস্ত। (ফাতহুল বারী)

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো : জুমু'আর দিনকে জুমু'আর দিন বলা হয় কেন? তিনি বললেন : কেননা সেই দিনে তোমার পিতা আদম (আ)-এর কাদামাটি একত্র করা হয়েছে, জুমু'আর দিনেই বিশ্বের ধ্বংস সাধন ও জীবকুলকে পুনরুত্থান করা হবে। জুমু'আর দিনেই কঠোরভাবে কাফিরদের পাকড়াও করা হবে এবং জুমু'আর শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যদি কেউ তখন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। (আহমদ)

৮. ইসলামী তারিখের শুভ সূচনা

ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, ওই দিন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন রবিউল আউয়াল মাস থেকে তারিখ লিখার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাদ্দিস হাকিম এ বর্ণনাটি তাঁর 'ইকলীল' নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, কিন্তু বর্ণনাটি মু'দাল (مُعْضَلٌ) বা জটিল।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো, উমর (রা)-এর খিলাফাতকালে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। ইমাম শা'বী (রা) এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু মূসা আশআরী (রা) উমর (রা)-কে লিখে পাঠান, আপনার নির্দেশসমূহ আমাদের নিকট এসে পৌছে; কিন্তু এতে তারিখ উল্লেখ নেই। উমর (রা) ১৭ হিজরীতে তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সহযোগিতা কামনা করেন।

উপস্থিতিদের মধ্যে কেউ বলেন, তারিখের সূচনা নবুওয়তের সূচনা থেকে করা হোক। কেউ বলেন, হিজরত থেকে আবার কেউ বলেন, রাসূল ﷺ-এর ওফাতের দিন থেকে। উমর (রা) বলেন, তারিখের সূচনা হিজরতের দিন থেকেই গণনা করা উচিত। এজন্যে যে, হিজরতের মাধ্যমেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়। সম্মিলিতভাবে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্ত সাদরে গ্রহণ করেন। যুক্তিকতার দাবি তো এটাই ছিল যে, রবিউল আউয়াল মাসই হিজরী সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত।

কেননা এ মাসেই রাসূল ﷺ মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন; কিন্তু রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে মুহাররম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে, রাসূল ﷺ মুহররম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। মদীনার আনসারগণ দশই যিলহজ্জ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং যিলহজ্জের শেষ তারিখে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমকে করা হয়েছে। এছাড়া উসমান এবং আলী (রা) উমর (রা)-কে পরামর্শ দেন যে, হিজরী সনের সূচনা মুহাররাম মাস থেকেই হওয়া উচিত।

কেউ কেউ বললেন, রমাযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। উমর (রা) বললেন, মুহাররম মাসই উপযুক্ত মাস, কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহাররম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর ওপরই সকলেই একমত হন। (বাবুত তারীখ, ফাতহুল বারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৯, তারীখে তাবারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৫২, যারকানী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫২, উমদাতুল কারী, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১২৮)

ইমাম সারাখসী (রহ) 'সিয়ারুল কাবীর'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, উমর (রা) যখন তারিখ নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করেন, তখন কেউ পরামর্শ দেন যে, তারিখের সূচনা রাসূল ﷺ-এর শুভ জন্ম থেকে করা উচিত; কিন্তু উমর (রা) এ প্রস্তাব পছন্দ করলেন না। কেননা এটাতে খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যায় যে, তাদের তারিখ ঈসা (আ)-এর শুভ জন্ম থেকে গণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের তারিখ থেকে নির্দিষ্ট করা হোক। এটাও উমর (রা) অপছন্দ করলেন এ জন্যে যে, তাঁর ওফাত তো একটি বড় দুর্ঘটনা এবং বড় ধরনের মুসিবত, এদিন থেকে তারিখ সূচনা করা আদৌ ঠিক নয়।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত হন যে, হিজরতের বছর থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। ফারুকে আযম (রা) এ রায়টি পছন্দ করলেন এজন্যে যে, হিজরতের দ্বারাই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রসার অর্থাৎ দুই ঈদ এবং জুমুআ প্রকাশ্যে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। (যেমনটি শরহে সিয়ারুল কাবীর বর্ণিত হয়েছে, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৩)

৯. বাংলা সন

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর সম্রাট আকবর দ্বিতীয় পানি পথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ করেন। তখন থেকেই রাজস্ব আদায়কে সহজ ও তার বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি তারিখ-ই-এলাহি সনটির প্রবর্তন করেন। প্রথমে এটি তারিখ-ই-এলাহি নামে পরিচিতি লাভ করে এবং পরে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত হয়। সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার রাজত্বের উনত্রিশতম বর্ষে বাংলা বর্ষপুঞ্জি প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ নতুন এই সালটি তারিখ-ই-এলাহি থেকে বঙ্গাব্দে পরিচিতি পায়।

বাংলা বর্ষপুঞ্জি প্রবর্তনের ফলে বাংলায় এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এর আগে মোগল সম্রাটরা রাজস্ব আদায়ের জন্য হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতেন। কিন্তু এতে কৃষকরা বিপাকে পরতেন। আবুল ফজল আকবরনামা গ্রন্থে বলেন, হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা কৃষকদের জন্য খুবই সাংঘর্ষিক ছিল। কারণ চন্দ্র ও সৌর বর্ষের মধ্যে ১১ থেকে ১২ দিনের ব্যবধান ছিল, ফলে দেখা যায় ৩০ সৌরবর্ষ ৩১ চন্দ্রবর্ষের সমান ছিল। তখন কৃষকরা সৌরবর্ষ অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করত কিন্তু চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো।

ফলে এটি কৃষকদের জন্য শুধুই বিড়ম্বনার ছিল। তাই আকবর তার রাজত্বের শুরু থেকেই দিন-তারিখ গণনার সুবিধার্থে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও যুগোপযোগী বর্ষপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এ জন্য আকবর জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী বর্ষপঞ্জি সংস্কার করে তা যুগোপযোগী করে তোলার দায়িত্ব অর্পন করে। সে সময় বঙ্গে শক বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা হতো আর চৈত্র ছিল শক বর্ষের প্রথম মাস।

বিজ্ঞানী শিরাজী ৯৬৩ হিজরী সালের শুরু থেকে বাংলা বর্ষ ৯৬৩ অব্দের সূচনা করেন। ৯৬৩ অব্দের পূর্বে বাংলা বর্ষে আর কোনো সন বিদ্যমান ছিল না। আরবি মুহাররম মাসের সাথে বাংলা বৈশাখ মাসের সামঞ্জস্য থাকায় বাংলা অব্দে চৈত্রের পরিবর্তে বৈশাখকে প্রথম মাস করা হয়। তারিখ-ই-এলাহি'র সূচনা থেকে ৪৫৬ বছর পর বাংলা (১৪১৯) ও হিজরী (১৪৩৩) বর্ষপঞ্জিতে প্রায় ১৪ বছরের ব্যবধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ হিজরী সাল বাংলা সন থেকে প্রায় ১৪ বছর এগিয়ে। তার কারণ হিজরী বর্ষ হচ্ছে চন্দ্রনির্ভর আর বাংলা বর্ষ হচ্ছে সূর্যনির্ভর। চন্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে, আর সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে।

অর্থাৎ চন্দ্রবর্ষ থেকে সৌরবর্ষ ১১ বা ১২ দিন এগিয়ে। তবে উভয়ই সৌরবর্ষ ভিত্তিক হওয়ায় বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষের মধ্যে পার্থক্য নিতান্তই কম। তারিখ-ই-এলাহি'র সূচনার সময় বাংলা ও গ্রেগরিয়ান বর্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল ১৫৫৬-৯৬৩ = ৫৯৩ বছর যা বর্তমানেও (২০১২-১৪১৯ = ৫৯৩ একই। অর্থাৎ বাংলা সনের সাথে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিস্টীয় সন পাওয়া যায়।

১০. বাংলা মাসের নামকরণ

বঙ্গাব্দের বারো মাসের নামকরণ করা হয়েছে নক্ষত্রমণ্ডলের চন্দ্রের আবর্তনে বিশেষ তারার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে। এই নামসমূহ গৃহীত হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'সূর্যসিদ্ধান্ত' থেকে। বাংলা মাসের এই নামগুলো হলো–

মাসের নাম	নামকরণ
বৈশাখ	বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
জ্যৈষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
আষাঢ়	উত্তর ও পূর্ব আষাঢ়া নক্ষত্রের নাম অনুসারে
শ্রাবণ	শ্রবণা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
ভাদ্র	উত্তর ও পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের নাম অনুসারে
আশ্বিন	আশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে
কার্তিক	কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
অগ্রহায়ণ(মার্গশীর্ষ)	মৃগশিরা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
পৌষ	পুষ্যা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
মাঘ	মঘা নক্ষত্রের নাম অনুসারে
ফাগুন	উত্তর ও পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে
চৈত্র	চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে

সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত তারিখ-ই-ইলাহীর মাসের নামগুলো প্রচলিত ছিল ফার্সি ভাষায়, যথা–

১. ফারওয়াদিন ২. আর্দি ৩. ভিহিসু ৪. খোরদাদ ৫. তির ৬. আমারদাদ ৭. শাহরিয়ার ৮. আবান ৯. আযুর ১০. দাই ১১. বহম ১২. ইসকন্দার মিজ।

১১. সপ্তাহের সাতদিনের বাংলা নামকরণ

বাংলা সন অন্যান্য সনের মতোই সাত দিনকে গ্রহণ করেছে এবং এ দিনের নামগুলো অন্যান্য সনের মতোই তারকামণ্ডলীর ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

দিনের নাম	নামকরণ
শনিবার	শনি গ্রহের নাম অনুসারে
রবিবার	রবি বা সূর্য দেবতার নাম অনুসারে
সোমবার	সোম বা শিব দেবতার নাম অনুসারে
মঙ্গলবার	মঙ্গল গ্রহের নাম অনুসারে
বুধবার	বুধ গ্রহের নাম অনুসারে
বৃহস্পতিবার	বৃহস্পতি গ্রহের নাম অনুসারে
শুক্রবার	শুক্র গ্রহের নাম অনুসারে

বাংলা সনে দিনের শুরু ও শেষ হয় সূর্যোদয়ে। ইংরেজি বা গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির শুরু হয় যেমন মধ্যরাত হতে।

১২. ইংরেজি মাসের নামকরণ

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের আগে ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারেরও আগে রোমানরা গ্রিক পঞ্জিকা অনুযায়ী বছর ধরত ৩০৪ দিনে। যাকে ১০ মাসে ভাগ করা হয়েছিল। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির জন্ম তখনও হয়নি। মার্চ ছিল বছরের প্রথম মাস। এক সময় রাজা পম্পিলিয়াস দেখলেন ৩০৪ দিন হিসাবে বছর করলে প্রকৃতির সঙ্গে মিলছে না। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে তিনি বছরের সাথে যোগ করলেন আরও ৬০ দিন। বছরের দিন বৃদ্ধি পেল ঠিকই সঙ্গে সমস্যাও বৃদ্ধি পেল ঋতুর চেয়ে সময় এগিয়ে আছে তিন মাস। তখনই জুলিয়াস সিজার ঢেলে সাজালেন বছরকে। নতুন দুটি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে এলেন বছরের প্রথম দিকে।

1. **January (জানুয়ারি) :** রোমে 'জানুস' নামক এক দেবতা ছিল। রোমবাসী তাকে সূচনার দেবতা বলে মানত। যে কোন কিছু শুরু করার আগে তারা এ দেবতার নাম স্মরণ করত। তাই বছরের প্রথম নামটিও তার নামে রাখা হয়েছে।

2. **February (ফেব্রুয়ারি) :** রোমান দেবতা 'ফেব্রুস'-এর নাম অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের নামকরণ করা হয়েছে।

3. **March (মার্চ) :** রোমান যুদ্ধ-দেবতা 'মরিস'-এর নামানুসারে তারা মার্চ মাসের নামকরণ করেন।

4. **April (এপ্রিল) :** বসন্তের দ্বার খুলে দেয়াই এপ্রিলের কাজ। তাই কেউ কেউ ধারণা করেন ল্যাটিন শব্দ 'এপিরিবি' (যার অর্থ খুলে দেয়া) হতে এপ্রিল এসেছে।

5. **May (মে) :** রোমানদের আলোক-দেবী 'মেইয়ার'-এর নামানুসারে মাসটির নাম রাখা হয় মে।

6. **June (জুন) :** রোমানদের নারী, চাঁদ ও শিকারের দেবী ছিলেন 'জুনো'। তার নামেই জুনের সৃষ্টি।

7. **July (জুলাই) :** জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে জুলাই মাসের নামকরণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে বছরের প্রথমে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিকে স্থান দিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে দূরে সরিয়ে দেন।

8. **August (আগস্ট) :** জুলিয়াস সিজার বছরকে ঢেলে সাজানোর পর আগস্ট মাসটি তার নিজের নামে রাখার জন্য সিনেটকে নির্দেশ দেন। সেই থেকে শুরু হয় আগস্ট মাসের পথচলা।

9. **September (সেপ্টেম্বর) :** সেপ্টেম্বর শব্দের শাব্দিক অর্থ সপ্তম মাস। কিন্তু সিজার বর্ষ পরিবর্তনের পর তা এসে দাঁড়ায় নবম মাসে। তারপর এটা কেউ পরিবর্তন করেনি।

10. **October (অক্টোবর) :** 'অক্টোবরের' শাব্দিক অর্থ বছরের অষ্টম মাস। সেই অষ্টম মাস আমাদের ক্যালেন্ডারে এখন স্থান পেয়েছে দশম মাসে।

11. **November (নভেম্বর) :** 'নভেম' শব্দের অর্থ নয়। সেই অর্থানুযায়ী তখন নভেম্বর ছিল নবম মাস। জুলিয়াস সিজারের কারণে আজ নভেম্বরের স্থান এগারতে।

12. **December (ডিসেম্বর) :** ল্যাটিন শব্দ 'ডিসেম' অর্থ দশম। সিজারের বর্ষ পরিবর্তনের আগে অর্থানুযায়ী এটি ছিল দশম মাস। কিন্তু আজ আমাদের কাছে এ মাসের অবস্থান ক্যালেন্ডারের শেষ প্রান্তে।

১৩. সপ্তাহে সাত দিনের ইংরেজি নামকরণ

প্রত্যেকটি দিনের নামের অর্থ ভিন্নরকম। আমাদের সকলের নখদর্পণে সাতদিনের নাম। কিন্তু এই সাতদিনের নামের উৎপত্তিস্থল কোথায়, কিভাবে হলো তা আমাদের সকলের অজানা বা আমরা এর সম্পর্কে অবগত নই। তাহলে চলুন, আমরা নামগুলোর ইতিহাস থেকে ঘুরে আসি।

১. **শনিবার : ইংরেজিতে বলা হয় Saturday :** সে অনেক পুরনো কথা। রোমান সাম্রাজ্যের আমলের লোকেরা এই বলে বিশ্বাস করত যে, চাষাবাদের জন্য 'স্যাটান; নামের একজন দেবতা আছেন। যার হাতে আবহাওয়া ভালো খারাপ করা লেখাটি আছে। তাই তাকে সম্মান করার জন্যই তার নামে একটি গ্রহের সাথে সপ্তাহের একটি দিনের নাম স্যাটর্নি ডেইজ রাখা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে স্যাটানের দিন। বর্তমানে তা 'স্যাটারডে' নামেই পরিচিত।

২. **রবিবার : ইংরেজিতে বলা হয় Sunday :** অনেকদিন আগের কথা, দক্ষিণ ইউরোপের সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করত এবং ভাবত যে একজন দেবতা রয়েছেন যিনি শুধুমাত্র আকাশে গোলাকার আলোর বল অংকন করেন। ল্যাটিন ভাষায় যাকে বলা হয় 'সলিছ'। এর থেকেই সলিছ ডে অর্থাৎ সূর্যের দিন। উত্তর ইউরোপের লোকেরা এই দেবতাকে ডাকত 'স্যানেল ডেইজ' নামে। যা পরবর্তীতে বর্তমান সান ডে-তে রূপান্তরিত হয়।

৩. **সোমবার : ইংরেজিতে বলা হয় Munday :** এই নামের সাথেও দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা জড়িত। রাতের বেলায় আকাশের গায়ে রূপালী বল দেখে তারা ডাকত 'লুনা' নামে। ল্যাটিন শব্দ লুনা ডেইস। উত্তর ইউরোপের লোকেরা ডাকত মোনান ডেইজ। এ মানডে কিন্তু মোনান ডেজ থেকে রূপান্তর হয়।

৪. **মঙ্গলবার : ইংরেজি রূপ Tuesday :** আগেকার রোমান রাজ্যের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, টিউ নামক একজন দেবতা আছেন যিনি যুদ্ধ দেখাশুনা করেন। তারা ভাবত যারা টিউকে আশা করত টিউ তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করত যুদ্ধের ময়দানে এবং যারা পরোলোক গমন

করেছে তাদেরকে টিউ পাহাড় থেকে নেমে একদল মহিলা কর্মী নিয়ে বিশ্রামের জায়গা ঠিক করত। তারা একে ডাকত 'ডুইস' নামে। যার ইংরেজি অর্থ টুইস ডে।

৫. **বুধবার : ইংরেজি রূপ Wednesday :** দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী 'উডেন' বলে দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা ভাবত। তিনি সারা দিন ঘুরে জ্ঞান লাভ করতেন যার জন্য তার একটি চোখ হারাতে হয়েছিল। এই হারানো চোখকে তিনি সবসময় লম্বাটুপি দিয়ে আবৃত করে রাখতেন। দুটো পাখি উডেনের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করত, তারা উডেনের কাঁধে বসে থাকত। রাতে তারা সারা পৃথিবীর ঘটনাবলি উডেনকে শুনাত। এভাবেই উডেন সারা পৃথিবীর খবর শুনতে সক্ষম হন। এ জন্য লোকেরা নাম রাখল ওয়েডনেস ডেইস। যা বর্তমান ওয়েডনেস ডে নামে পরিচিত।

৬. **বৃহস্পতিবার : ইংরেজি রূপ Thursday :** বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর সম্পর্ক না জানার ফলে মানুষ মনে করত যে, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য একজন দেবতা দায়ী। তারা শুধু আলো জ্বলতে ও বিদ্যুৎ চমকাতে দেখত। তারা দেবতার নাম রাখে থর। তাদের মধ্যে এই অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, দেবতা থর যখন রাগান্বিত হন তখন তিনি রাগে আকাশে একটা হাতুড়ি নিক্ষেপ করেন দুটি ছাগলের গাড়িতে বসে। ছাগলের গাড়ি চাকার শব্দ হচ্ছে বজ্রপাত ও হাতুড়ির আঘাত হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকানো। থরের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে তারা সপ্তাহের একটি দিনের নাম রাখেন থার্স ডেইস। যাকে আজ আমরা থার্স ডে বা বৃহস্পতিবার বলে ডাকি।

৭. **শুক্রবার : ইংরেজিতে বলা হয় Friday :** ওডিন একজন শক্তিশালী দেবতা। তার স্ত্রী দেবী ফ্রিগ ছিলেন ভদ্র এবং সুন্দরী। ওডিনের পাশে সব সময় তার স্ত্রী থাকতেন। পৃথিবীকে দেখতেন, প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন, প্রকৃতির দেবী ভালোবাসা ও বিবাহের দেবীও ছিলেন ফ্রিগ। এই জন্য লোকেরা বাকি একটি দিনের নাম 'ফ্রিগ ডেইজ' বা ফ্রাইডে রাখেন।

১৪. মুসলমানদের নববর্ষ

প্রিয় পাঠকগণ! ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, খ্রিস্টানদের নববর্ষ যিশুখ্রিস্টের জন্ম থেকেই সূচনা হয়েছে। তাই তারা অতি আমোদ-প্রমোদে তা যথাযথ উদযাপন করে থাকে। এ মর্মে বর্তমানে ২০১২। আর বাংলা সন গণনার উৎপত্তি মোগল শাসকদের মধ্যে বাদশাহ আকবারের যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। তাই বাঙালি জাতি পহেলা বৈশাখকেই ধুমধামের সাথে পালন করে আসছে; সে মর্মে বর্তমান ১৪১৮ বঙ্গাব্দ হয়। কিন্তু মুসলমানদের নববর্ষ হলো ১ মুহাররম। সে মতে, বর্তমান ১৪৩২ হিজরী সাল চলছে। আফসোস! অনেক মুসলমান তা জানেও না। অথচ কুরআন মাজীদের সূরা তাওবার ৩৫ নম্বর আয়াতে–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত-৩৬)

এর তাফসীরে জনাব মুফতী শফী' (র) লেখেন, সকল মুসলমানের জন্য আরবি তারিখ জানা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। যদি এলাকার কেউ আরবি তারিখ না জানে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। আরবি তারিখ জানার পর অন্য তারিখ (বাংলা-ইংরেজি) জানা বৈধ হবে, অন্যথা নয়।

আফসোস! আজকাল মুসলমানগণ আরবি তারিখ পরিত্যাগ করে বাংলা-ইংরেজি তারিখ নিয়ে জাতি ব্যস্ত। শুধুমাত্র ১০ মুহাররম, ১লা রবিউল আউয়াল, রমযান ১০ই যুলহজ্জ, ২৭শে রজব ১৫ই শাবান ইত্যাদির তারিখ জানে। কারণ এতে খাওয়া-দাওয়া ও ইফতারী ভোজনের সুবিধা রয়েছে। তাই এগুলো ছাড়া অন্য কোনো আরবি তারিখ জানতে ও মানতে রাজী নয়। যদি মুসলমানের অবস্থার এরূপ হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে ইসলামী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে মুসলমানগণ বঞ্চিত যথেষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ ইবাদতের সব বিষয় সম্পর্ক আরবি তারিখ এবং চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

তাই সকল মুসলমান ভাই-বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনারা প্রথমে মুসলমান হয়েছেন, পরে বাঙালি হয়েছেন। তাই আরবি তারিখগুলো গুরুত্ব সহকারে সংগ্রহ করার পাশাপাশি বাংলা-ইংরেজি তারিখও সংরক্ষণ করতে পারেন এবং মুহাররম মাস থেকে নিজেদের অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী, স্কুল-কলেজ, ডায়েরিতে আরবি তারিখ লেখার প্রচলন জারি করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী দিবসসমূহ

১. মুহররম মাস (আশুরা) সম্মানিত মাস

হিজরী সনের প্রথম মাস হলো মুহররম মাস। মুহররম মাসসহ আরো তিনটি মাস গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন মাস।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ

অর্থ : "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনার বারোটি মাস, তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত।"

(সূরা তাওবাহ, আয়াত-৩৬)

এই চারটি মাস হলো, ১. যিলকদ ২. যুলহজ্জ ৩. মুহররম ও ৪. রজব। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত আদিকাল থেকেই হারাম ছিল। কারণ এই কয়েক মাসে সমগ্র আরব দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকত। এর ফলে মানুষ নির্বিঘ্নে, নিরাপদে হজ এবং উমরাহ পালন করতে পারত।

এই কারণে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, যেমন ইয়াহূদী, নাসারা, কাফির ও মুশরিক প্রভৃতি অমুসলিম জাতিও এ মাসগুলোর মর্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত এবং এ মাসগুলোতে নিজেরা পরস্পরে মারামারি, হানাহানি হতে বিরত থাকার চেষ্টা করত এবং এ মাসগুলোতে খুন-খারাবী ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করত। কারণ আরবের মুশরিক ও কাফিরগণও ইবরাহিমী ধর্মের দাবিদার ছিল। কাজেই তারাও এই হারাম মাসগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত। কখনো এর মধ্যে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে কিংবা যুদ্ধ করতে করতে কোনো হারাম মাস এসে পড়লে তারা মনগড়া বলত, এই বছর এ মাসটি হারাম বলে গণ্য হবে না; বরং এর পরের মাস এর বদলে হারাম বলে গণ্য হবে।

যেহেতু এই পরিবর্তনটি তারা মনগড়া করত তাই এর প্রতিবাদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَاحَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ اَعْمَالِهِمْ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

অর্থ : মাসকে পিছিয়ে দেয়া কেবল কুফুরি বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোনো বছর বৈধ করে এবং কোনো বছর অবৈধ করে, যাতে তারা তাকে আল্লাহ যেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে তাদের মন্দ কাজগুলো। তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে, আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে প্রদর্শন করেন না।

(সূরা তাওবা : আয়াত–৩৭)

১. হারাম মাসগুলোর মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন হলে

যদি কাফিরগণ হারাম মাসগুলোর মধ্যে মুসলমানদের সাথে লড়াই বা যুদ্ধ শুরু করে দেয়, তখন মুসলমানদের কী কর্তব্য?

সেই প্রসঙ্গে অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ : সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে আর এ সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর (হারাম মাসগুলোতে) উৎপীড়নে লিপ্ত হয় তোমরা তাদের ওপর উৎপীড়ন করবে, যেরূপ তোমাদের ওপর উৎপীড়ন করা হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে থাকেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৪)

এ ছাড়া একবার ঘটনাক্রমে সাহাবাদের সাথে কাফিরদের এক সংঘর্ষ হয় এবং আমরা হাযরামী নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি তাতে নিহত হয়। এটা ছিল মুসলমানদের ধারণা মতে জুমাদাস সানী মাসের ২৯ তারিখ। অথচ রজবের চাঁদ

হয়ে যাওয়ায় এবং হারাম মাস এসে যাওয়ার কারণে। যাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল, কাজেই বিধর্মীরা বলতে লাগল, "মুসলমানগণ কেন এই সম্মানিত মাসের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেননি? তদুত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌبِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ۔

অর্থ : যখন মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তদুত্তরে আপনি বলে দিন যে, এতে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ। আর (হে কাফির-মুশরিকগণ! জেনে রাখো) আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফুরী করা, মসজিদে হারামের সাথে কুফুরী করা, মসজিদে হারামের অধিবাসীদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও আরো বেশি গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৭)

অর্থাৎ, যদিও মুসলমানেরা ভুলবশত সাময়িকভাবে হারাম মাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করে অপরাধ করেছে, বটে, কিন্তু তোমরা তো এর চেয়েও আরো জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত রয়েছে; যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়ছে। সুতরাং নিজ অপরাধগুলোর প্রতি না দেখে অন্যের অপরাধ নিয়ে সমালোচনা করা তোমাদের মোটেও উচিত নয়; বরং এটা তো নিজের বাড়ির নারিকেল না দেখে অন্যের বাড়ির সুপারি দেখার মতো।

২. মুহররম মাস শুভ না অশুভ

সর্বপ্রথম এ কথাটি পরিষ্কার হওয়া অতি প্রয়োজনীয় যে, মুহররম মাসটি কি শুভ না-কি অশুভ মাস। শিয়া সম্প্রদায়গণ এ মাসটিকে অশুভ মাস মনে করে (কারণ তাদের নিকট শাহাদাতবরণ করা একটি জঘন্য অন্যায়) যেহেতু হুসাইন (রা)-এর শাহাদাত এ মাসেই হয়েছিল। এ কারণেই শিয়ারা এ মাসে বিবাহ-শাদী এবং আনন্দ-খুশীর কোনো অনুষ্ঠান করাকে অশুভ মনে করে। পক্ষান্তরে ইসলাম এবং মুসলমানগণের নিকট এ মাসটি অতিশুভ এবং অতীব সম্মানিত মাস। কারণ যার নাম (মুহররম)-এর মধ্যেই সম্মান এবং মর্যাদার অর্থ নিহিত রয়েছে, তাকে অশুভ কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না; বরং এ কথা বলা যায় যে, এ মাসে হুসাইন (রা) শহীদ হওয়ার কারণে তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং যখন মুহররম মাসের এবং ১০ মুহররমের ফযিলত প্রমাণিত হলো, তখন এ মাসটি কখনও অশুভ মাস হতে পারে না। এর জন্য কালো পতাকা ওঠাতে হবে না, কালো ঝাণ্ডা উত্তোলন করতে হবে না। তাই মুহাররম মাসেই অধিক বিবাহ-শাদী এবং নেককাজের ও বৈধ খুশীর অনুষ্ঠান করা মুসলমানদেরই করণীয় ও বরকতের কাজ।

তাই '১লা মুহররম' উদযাপন করার যোগ্য। এর বিপরীতে '১লা বৈশাখ' উদযাপনের মধ্যে কোনো নেক ও সম্মান নিহিত নেই। কারণ যার নামের শুরুতে 'কাল' শব্দ রয়েছে। যেমন বলা হয়, কালবৈশাখী। কালবৈশাখীর ছোবলে বহু ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে, বহু লোক মারা গেছে। তাই এটি মুসলমানদের জন্য কিছুতেই শুভ মাস হতে পারে না।

৩. মুহররম মাস শুভ হওয়ার কতিপয় কারণ

মুহররম আনন্দের মাস হওয়ার কারণ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার ইতিহাসে যে সব বড় বড় ঘটনা ঘটেছে সেগুলো অধিকাংশই মুহররমের ১০ তারিখেই ঘটেছে। যথা–

১. ফিরাউনের নির্যাতন থেকে মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের মুক্তি এ দিনেই হয়েছিল। এ কারণে তাদেরকে এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দিনে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে।

 এছাড়া ইবনে নাবাতা তাঁর দ্বিতীয় খুতবায় লিখেছেন–

২. আদম (আ)-এর তাওবা এই দিনে গ্রহীত হয়েছে।

৩. ঈসা (আ)-কে এই দিনেই জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

৪. এই দিনেই নূহ (আ) এবং তাঁর সাথে নৌকায় অবস্থিত ঈমানদারগণকে মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

৫. এদিনেই আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ)-কে কুখ্যাত নমরূদের আগুন হতে মুক্তি দান করেছেন।

৬. উক্ত দিনেই আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-এর সাথে প্রথম কথপকথন করেছেন এবং তাঁর ওপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

৭. এদিনেই আইয়ূব (আ)-কে রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

৮. ইউসুফ (আ)-কে ইয়াকুব (আ)-এর নিকট এই দিনেই ফেরত দিয়েছেন।

৯. এ দিনেই ইউনুস (আ)-কে মাছের পেট হতে বের করেছেন।

১০. এই দিনেই বনী ইসরাঈলের জন্য নীল নদীতে ১২টি কুদরতী রাস্তা তৈরি করেছেন।

১১. এ দিনেই দাউদ (আ)-এর গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মার্জনা করেছেন।

১২. সুলাইমান (আ)-এর বাদশাহী ছিনিয়ে নেয়ার পর ফিরিয়ে দিয়েছেন।

১৩. উক্ত দিনেই জিবরাঈল (আ) রহমত নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

১৪. এদিনেই রাসূল ﷺ-এর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

১৫. এছাড়া ১০ই মুহররম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন যেই দিনে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন।

১৬. এদিনেই আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আসমান থেকে বৃষ্টি ও রহমত বর্ষণ করেছেন। এছাড়া আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এদিনে সংঘটিত হয়েছে।

১৭. তন্মধ্যে হুসাইন (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী, তাবেয়ীগণের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের কারণে এ মাসটি গুরুত্বপূর্ণ হয়নি; বরং এটা বলা চলে যে, ন্যায় ও সত্যের জন্য তাঁর শাহাদাত এ মাসে হওয়ার কারণে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ আদিকাল হতে যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ (হত্যা) হারাম ছিল, সে মাসেই জালিমরা রাসূলে করীম ﷺ-এর স্নেহের নাতিকে শহীদ করতে দ্বিধাবোধ করেনি।

৪. মুহাররমের ১০ তারিখে করণীয় কাজসমূহ

১. রোযা রাখা : এ দিনে রোযা রাখা সুন্নাত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুহাররমের ১০ তারিখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখবে, তার পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমতে এটা দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হবে। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা করা জরুরি। তাই এ দিন রোযা রেখে কান্নাকাটি করে খাঁটি দিলে তাওবা করে নিলে অতীতের এক বছরের সমস্ত গুনাহ মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

কোনো এক সাহাবী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দিনে তো ইয়াহূদীগণও রোযা রাখে। তার উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য বা মিল হতে পৃথক হওয়ার জন্য ১০ তারিখের রোযার সাথে আরো একটি দিন মিলিয়ে রোযা

রাখবো। এ কারণে আমাদের উচিত আমরা যেন শুধুমাত্র ১০ তারিখে রোযা না রাখি; বরং ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখ দু'দিন রোযা রেখে এই সুন্নাতটি পালন করি।

২. এছাড়া ইবনে নাবাতা তাঁর দ্বিতীয় খুতবায় দুর্বল হাদীসের আলোকে লিখেছেন যে, এদিনে যে ব্যক্তি কোনো উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় পরিয়ে দেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

১. এ দিনে যে ব্যক্তি কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এর জন্য উত্তম বিনিময় দান করবেন।

২. এদিনে যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে অথবা কোনো ক্ষুধার্তকে আহার করাবে। অথবা কোনো পিপাসিত ব্যক্তিকে পান করাবে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতের দস্তরখান হতে খানা খাওয়াবেন এবং সালসাবীল হতে শরবত পান করাবেন।

৩. এ দিনে যে ব্যক্তি গোসল করবে আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তিকে রোগ, দুর্বলতা ও অলসতা হতে মুক্ত রাখবেন।

৪. এ দিনে যে ব্যক্তি সুরমা লাগাবে তার চোখে কোনো অসুখ হবে না।

৫. এ দিনে যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনকে সাধ্য অনুযায়ী ভালোভাবে খাওয়াবে, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ বছর তার ওপর রিযিক প্রশস্ত করবেন। (তবে কদরের রাত তো ইবাদাতের রাত)

৫. মুহাররম বা আশুরা কেন্দ্রিক অভিনব বিদআত

১. ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন বলে কান্নাকাটি করা।

২. বুকে থাপ্পড় মেরে বিলাপ করা।

৩. বুকে ও পিঠে ব্লেড বা ছুরি দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করা।

৪. কালো পোষাক পরিধান করে শোক প্রকাশ করা।

৫. তাজিয়া (শোক) মিছিল করা।

৬. ১০ই মুহাররম খালি পায়ে সারা দিন চলাচল করা।

৭. কালো ঠেলাগাড়ী বানিয়ে সারা শহর ঘুরে ঐ গাড়ী থেকে দুধ জাতীয় কিছু বন্টন করা।

৮. ১০ই তারিখে মিলাদ-কিয়াম করে শিন্নি বিতরণ করা।

এ সকল আমল আল হাদীসে তো নেই এমনকি জাল হাদীসেও নেই।

৬. মুহাররম সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

মুহররম মাসের রোযা রাখার কথা এবং বিশেষ করে এ মাসের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তার অতিরিক্ত ফযিলত যে কোন ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা আমার জানা নেই।

যে ব্যক্তি মুহররম মাসের প্রথম ১০ দিন রোযা রাখল, সে যেন দশ হাজার বছর দিনে রোযা ও রাত্রে নফল ইবাদত করল, এ পরিমাণ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে।" এই মাসে ইবাদত করলে শবেকদর রাত্রে ইবাদত করার মতো সওয়াব লাভ হয়। ইত্যাদি হাদীস কোথায় আছে এবং তার মান কি তা আপনি আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করুন।

মুহররম মাসের প্রথম তারিখের রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার পাঠ করবে।

এই রাতে আরো ৬ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেশতে ২০০০ মহল লাভ হবে; প্রত্যেক মহলে মহলে ইয়াকূতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজার সবুজ রঙের তখতার উপর হুর গেলমান বসে থাকবে। ৬০০০ বালা দূর হবে এব ৬০০০ সওয়াব লাভ করবে!

এই তারিখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু'জন ফিরিশতা বডিগার্ড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আশুরার রাতে ২ রাকআত প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রৌশন থাকবে।

এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ্ মাফ হয়!

আশুরার দিনে ৪ রাকআত সালাত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ্ মাফ হয়! বেহেশতে ১০০০ নূরের মহল তৈরি হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী সালাত।

অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআত ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সূরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক ৫ বার। সালাত শেষে ইস্তিগফার ৭০ বার। এ সালাত বিদআত।

(মু'জামুল বিদা ৩৪০-৩৪১ পৃ:)

এই মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এ সালাত হাসান-হোসেনের রূহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতের দিন তাঁদের সুপারিশ (!) লাভ হবে।

৭. মুহাররম বা আশুরার শিক্ষা

১. আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা।
২. বাতিলের সাথে কোন আপোষ না করা।
৩. হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন।
৪. বাতিল শক্তির সামনে মাথা নত না করা।
৫. খিলাফাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকা।
৬. দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জেল, জুলুম, হামলা, মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখিন হতে হবে।

২. সফর

হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস হচ্ছে সফর। এ মাসে নির্দিষ্ট কোন ফযিলত ও আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তক ও পঞ্জিকায় এ মাসের মধ্যে আখেরী চাহার শোম্বা বলে একটি দিবসের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় এবং সেই দিন সওম পালন ও দান-খয়রাত করার অনেক ফযিলতের কথাও সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খুব ভালোভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কুরআন ও হাদীসের কোথাও আখেরী চাহার শোম্বা বলে কোন কিছু নেই এবং কোন সাহাবীগণের আমল দ্বারাও এ দিনের বিশেষ কোন আমলের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং আখেরী চাহার শোম্বা পালন কোন ফযিলতের আমল নয়; বরং এটি একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত ও গোমরাহী।

১. সফর সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

সফর মাসের প্রত্যেকটি দিন নাকি বান্দার গোনাহ মাফের দিন হিসেবে চিহ্নিত। এই তারিখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন ১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক্ব ১৫ বার এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশি সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের ১ম সপ্তাহের জুমআর রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে। এ সালাত শেষে মুনাজাতে নাকি বান্দার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

এই মাসের শেষ বুধবার বা আখেরী চাহার শোম্বার চাশতের সময় ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করে সালাত পড়তে হয়।

কুরআন হাদীসে এ ধরনের আমলের কোনো ভিত্তিই নেই।

৩. রবিউল আউয়াল

হিজরী সনের তৃতীয় মাস হচ্ছে রবিউল আউয়াল। মাসটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছে এ মাসে। তবে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূল ﷺ-এর জন্ম তারিখ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ মাসের জন্য নির্দিষ্ট কোন ফযিলতের আমলের কথা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, এ মাসটিকে কেন্দ্র করে সওয়াবের আশায় অনেকেই এমন কিছু কাজ করে থাকেন ইসলামী শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই; বরং তা মনগড়া বিদআত। যেমন নবী ﷺ-এর জন্মদিন তথা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা, এ উপলক্ষে শিরনী বিতরণ, মিলাদের আয়োজন, র‍্যালি ইত্যাদি। এ ধরনের কোন কাজই নবী ﷺ করেননি; বরং সাহাবায় কিরাম, তাবেঈনগণ, বিশিষ্ট চার ইমাম ও তাদের পরবর্তী নেককার ইমামগণ কেউই এরূপ করেননি। সুতরাং এগুলো বিদআত, যা বর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। ইসলাম কোন নিছক অনুষ্ঠান ও প্রথা পালনের ধর্ম নয়; বরং আমলের ধর্ম। নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হলে নবী ﷺ-এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা অপরিহার্য।

১. রবিউল আউয়াল সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এ মাসের প্রথম থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত নাকি প্রত্যেক দিন ২০ রাকআত সালাত পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তে হয় ২১ বার করে। এ সালাত নবী ﷺ-এর নামে বখশে দিলে তিনি সালাত আদায়কারীকে নাকি বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন!

অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত ১০৭০ বার দরূদ পড়লে নাকি অতুলনীয় ধন-সম্পদের মালিক হওয়া যায়।

এ মাসের প্রত্যেক এশার পর ১২৫ বার করে দরূদ পড়লে স্বপ্নযোগে নাকি নবীয়ে দোজাহানের দীদার লাভ হয়, অশেষ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়, রুযী-রোযগারে বরকত হয় এবং সুখময় জীবন-যাপনের অধিকারী হওয়া যায়।

এ ধরনের আমল কুরআন হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই।

৪. রবিউস সানী

হিজরী সনের রবিউস সানী মাসেও বিশেষ কোনো আমলের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। উল্লেখ্য, রবিউস সানি মাসে কেউ কেউ ফাতেহা ইয়াযদাহাম নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। ঐ দিন নাকি 'আবদুল কাদের জিলানী (রহ) মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তার ঈসালে সওয়াবের জন্য ফাতেহা ইয়াযদাহাম পালন করা হয়। মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী শরিয়তে ফাতেহা ইয়াযদাহাম বলে কোনো জিনিস নেই। কোনো নবী, রাসূল, সাহাবায় কিরাম ও বুযুর্গদের এমনকি সাধারণ মানুষেরও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত নয়। এগুলো বিদ'আত, এগুলো কোন সওয়াবের কাজ নয়; বরং গুনাহের কাজ। কাজেই এগুলো বর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য।

১. রবিউস্-সানী সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারিখে নাকি ৪ রাকআত সালাত পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ গোনাহ মাফ এবং ৪টি হুর লাভ হয়।

অনেকের ধারণা মতে এ মাসের ১৫ তারিখে মাগরিবের পর ৪ রাকআত সালাত পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত সালাত পড়লে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এ মাসের যে কোনো বৃহস্পতিবার এশার নামাযান্তে নির্জনে বসে সূরা মূলক ১০০ বার পাঠ করে ২ রাকআত নফল সালাত আদায় করলে এবং প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করলে কিয়ামতে সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। তদানুরূপ এই মাসের শেষ রাতেও ৪ রাকআত সালাত যথানিয়মে আদায় করলে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং সেখানে শান্তি পাওয়া যায়। উল্লেখিত আমল কুরআন হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই।

৫. জুমাদিউল উলা

এ মাসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ফযিলতের আমলের কথা হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই অন্যান্য মাসের মতো এ মাসেও স্বাভাবিকভাবেই ইবাদত, বন্দেগী পালন করা উচিত।

১. জুমাদিউল আউয়াল সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে ৪ রাকআত সালাত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১ বার করে পড়ে আদায় করলে নাকি তাতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হয় এবং ৯০,০০০ বছরের গোনাহ মার্জনা হয়ে যায়।

কারো ধারণা মতে, এ মাসের প্রথম তারিখে ২০ রাকআত সালাত পড়তে হয়।

কেউ কেউ বলেন, এ মাসের প্রথম তারিখে নবী মুহাম্মদ ﷺ নাকি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে দুই দুই রাকআত করে মোট ২০ রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং সালাত শেষে দরূদে ইব্রাহীম ১০০ বার পাঠ করে আল্লাহর দরবারে ইহকাল ও পরকালের শান্তির ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন।

এ ধরনের আমলের ভিত্তি কোনো কুরআনে নেই।

৬. জুমাদিউল উখরা

এ মাসেরও নির্দিষ্ট কোনো ফযিলতের আমলের কথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। সুতরাং স্বাভাবিক দিনের মতো এ মাসে আমল করে যাবে।

১. জুমাদিউস সানী সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে নাকি ৪ রাকআত সালাত পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি ১ লাখ নেকী লাভ হয় এবং ১ লাখ গোনাহ মাপ হয়!

অনেকের ধারণা মতে, এ মাসে চাঁদ দেখার পর থেকে মাগরিবের সালাতের পর আবু বকর (রা) ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ ১২ রাকআত নফল সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি রাকআতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করতেন। সালাত শেষে আল্লাহর দরবারে দুআ ও মাগফিরাত কামনা করতেন। এগুলো মনগড়া আমল যা কুরআন হাদীসে এর কোনো ভিত্তি নেই।

৭. রজব

হিজরী সনের সপ্তম মাস হলো রজব মাস। এ মাসের বিশেষ আমল সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর হাদীসে আছে এ মাস আসলে রাসূল ﷺ-এ দুআ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শাইবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রমযান মাসে পৌঁছে দিন। তবে এ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ এ মাসের ২৭ তারিখে শবে মিরাজ পালন করে থাকে। আবার কেউ কেউ এ রাতকে শবে কদরের মতো ফযিলতপূর্ণও মনে করেন। অথচ ২৭ রজব শবে মেরাজ পালন করা একটি ভিত্তিহীন আমল। আর শবে কদরের সাথে এর তুলনা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। ইসলামী শরীয়তে শবে মিরাজ পালন করার কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া ইতিহাসবিদগণের মধ্যে শবে মিরাজের সঠিক তারিখ নিয়েই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাই ২৭ রজবই এটা সংঘটিত হয়েছে কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। শুধু তাই নয়, শবে মিরাজ রজব মাসে হয়েছে কিনা এ নিয়েও মতনৈক্য আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, এ শবে মেরাজ রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। মোটকথা এ দিনকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠান পালন করা বা ইবাদতের কথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই। আর যা নেই তা ইসলামী শরীয়তের কোন অংশ নয়। কাজেই মিরাজ সংগঠিত হয়েছিল এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে তবে একে কেন্দ্র করে মনগড়া কোন ইবাদত প্রচলন করা যাবে না।

১. রজব সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসে ১, ১৫ ও শেষ তারিখে গোসল করলে নাকি (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মতো নিষ্পাপ হওয়া যায়!

এই মাসে ৩০ রাকআত সালাত এবং তার ৫টি রাত ইবাদত করার খেয়ালী ফযিলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বর্ণনা করা হয়ে থাকে আরো বুহ ফাযায়েল।

কারো মতে, এ মাসের ১৫ তারিখে এশার পরে ৭০ রাকআত সালাত পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। (মু'জামুল বিদ' ৩৪১ পৃ: দ্র:)

আমল করার আগে আপনার দায়িত্ব হল এ সবের সঠিক দলীল সম্পর্কে অবগত হওয়া। নচেৎ ইবাদত করতে গিয়ে বিদআত করে বসলে ফল হবে উল্টো।

বাস্তব সত্য এই যে, রজব মাসের ফযিলত সম্বন্ধে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ মাসের ইবাদতে; সালাত, রোযা বা উমরা পালনে কোন পৃথক মর্যাদা শরীয়তে নেই। সুতরাং নির্দিষ্ট সালাত বা রোযার ব্যাপারে যে সব ফযিলত পাওয়া যায়, তা সব মনগড়া ও ভিত্তিহীন।

৮. শাবান

শাবান আরবি চন্দ্র মাসের ৮ম মাস। এ মাসকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা শুনা যায়। এ মাসে একটি বড় বিষয় হলো শবে বরাত। এ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

১. শবে বরাত-এর অর্থ

'শব' একটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ রাত। 'বারায়াতকে যদি আরবি শব্দ ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, পরোক্ষ অর্থে মুক্তি। যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তাওবা নামেও পরিচিত।

ইরশাদ হয়েছে–

بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ .

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা।
(সূরা তাওবা : আয়াত-১)

এখানে বারায়াতের অর্থ হলো সম্পর্ক ছিন্ন করা। 'বারায়াত' মুক্তি অর্থেও আল কুরআনে এসেছে যেমন–

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ .

অর্থ : তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাবসমূহে? (সূরা কামার : আয়াত-৩৪)

আর 'বারায়াত' শব্দকে যদি ফার্সী শব্দ ধরা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে সৌভাগ্য। সুতরাং 'শবে বরাত' শব্দটার অর্থ দাড়ায় মুক্তির রজনী, সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী, অথবা সৌভাগ্যের রাত।

'শবে বরাত' শব্দটিকে আরবিতে অনুবাদ করলে বলতে হবে "লাইলাতুল বারায়াত'। এখানে বলে রাখা উত্তম যে এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরবি ও ফার্সি ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন বা আলাদা।

যেমন 'গোলাম' শব্দটি আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একইভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরবিতে এর অর্থ হলো কিশোর আর ফার্সিতে এর অর্থ হলো হলো দাস।

সার কথা হলো, 'বারায়াত' শব্দটিকে আরবি শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফার্সি শব্দ ধরা হলে এর অর্থ সৌভাগ্য।

২. আল-কুরআনে শবে বরাত

শবে বরাত বলা হোক আর লাইলাতুল বারায়াত বলা হোক কোন আকৃতিতে শব্দটি কুরআন মাজীদে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোনো আলোচনা নেই। সরাসরি তো দূরের কথা আকার ইঙ্গিতও নেই।

অনেককে দেখা যায়, শবে বরাতের গুরুত্ব আলোচনা করতে যেয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। আয়াতসমূহ হলো–

حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ - اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۔

অর্থ : হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। (সূরা দুখান : আয়াত-১-৪)

শবে বরাতপন্থী আলেম উলামারা এখানে বরকতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। এখানে স্পষ্টভাবেই বলব যে, যারা এখানে বরকতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের কথা বুঝিয়ে থাকেন তারা এত বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মতো অপরাধ। কারণ হলো–

১. কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কদর দ্বারা করা হয়। সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ - سَلاَمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۔

ফর্মা-০৪; ইসলামী ফিকহ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এটি অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে আপনি জানেন কী? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রভূর অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি! সেই রাত-ফজরের অভ্যুদয় পর্যন্ত। (সূরা কাদর : আয়াত-১-৫)

অতএব বরকতময় রাত হলো লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল বারায়াত নয়। সূরা দুখানের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এ সূরা আল-বদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বীন করা হলো সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

২. সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় আল কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রমযান মাসেই লাইলাতুল কদরে।

যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ـ

অর্থ : রমযান মাস, যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে আল-কুরআন।

৩. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরে কিরামের অভিমত উক্ত আয়াতে বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরকেই বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র তাবেয়ী ইকরামা (র)-এর একটি মত উল্লেখ করে বলা হয় হয় যে, তিনি বলেছেন, বরকতময় রাত বলতে শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাতকেও বুঝানো যেতে পারে।

তিনি যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। এ বরকতময় রাতের দ্বারা উদ্দেশ্য যদি শবে বরাত হয় তাহলে শবে কদর অর্থ নেয়া যাবে না।

৪. উক্ত আয়াতে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা শবে বরাত করা হলো তাফসীর বির-রায় (মনগড়া ব্যাখ্যা), আর বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দ্বারা করা হলো কুরআন ও হাদীস সম্মত তাফসীর। সকলেই জানেন কুরআন ও হাদীস সম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিতিতে মনগড়া ব্যাখ্যা (তাফসীর বির-রায়) গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

৫. সূরা দুখানের ৪ নং আয়াত ও সূরা কদরের ৪ নং আয়াত মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বরকতময় রাত বলতে লাইলাতুল কদরের রাতকেই বুঝানো হয়েছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ মুফাস্সিরে কিরাম এ কথাই জোর দিয়ে বলেছেন এবং সূরা দুখানে 'লাইলাতুম মুবারাকার' অর্থ শবে বরাত নেয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

ইমাম কুরতবী (রহ) তাঁর তাফসীরে বলেছেন : "কোনো কোনো আলেমের মতে, "লাইলাতুম মুবারাকাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।"

কাজেই এ আয়াতে 'লাইলাতুম মুবারাকাহ' –এর অর্থ লাইলাতুল কদর। শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত নয়।

৬. ইকরামা (র) বরকতময় রজনীর যে ব্যাখ্যা শাবানের ১৫ তারিখ দ্বারা করেছেন তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও প্রচার করতে হবে এমন কোনো নিয়ম-কানুন নেই; বরং তা প্রত্যাখ্যান করাই হলো সত্যতার দাবি। তিনি যেমন ভুলের উর্ধ্বে নন, তেমনি যারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন তারা ভুল শুনে থাকতে পারেন অথবা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বানোয়াট বর্ণনা দেয়াও অসম্ভব নয়।

৭. শবে বরাতের গুরুত্ব বর্ণনায় সূরা দুখানে উক্ত আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ আকীদাহ বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শবে বরাতে সৃষ্টিকূলের হায়াত-মউত, রিযিক-দৌলত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। আর শবে বরাত উদযাপনকারীদের শতকরা নিরানব্বই জনের বেশি এ ধারণাই পোষণ করেন। তারা এর উপর ভিত্তি করে লাইলাতুল কদরের চেয়ে ১৫ শাবানের রাতকে বেশি গুরুত্ব দেয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়গুলো লাইলাতুল কদরের সাথে সম্পর্কিত। তাই যারা শবে বরাতের গুরুত্ব বুঝাতে উক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন তারা মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ থেকে দূরে সরানোর কাজে লিপ্ত, যদিও মনে-প্রাণে তারা তা ইচ্ছা পোষণ করেন না।

এ সকল বিষয় জেনে বুঝেও যারা 'লাইলাতুম মুবারাকা'র অর্থ করবেন শবে বরাত, তারা সাধারণ মানুষদের পথভ্রষ্ট করা এবং আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না।

৩. হাদীসে শবে বরাতের আলোচনা

প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামের কোন রাতের নাম খুঁজে পাবেন না। যে সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হলো 'লাইলাতুন নিস্‌ফ মিন শাবান' অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই, হাদীসেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবতে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুআনে নেই। সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নফল আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে।

৪. ফিকহের কিতাবে শবে বরাত

শুধু আল-কুরআন অথবা সহীহ হাদীসেই নয়; বরং আপনি ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো পড়ে দেখুন, কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাবেন না। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে ফিক্‌হের যে সিলেবাস রয়েছে যেমন মালাবুদ্দা মিনহু, নূরুল ইজাহ, কুদুরী, কানযুদ্‌আকায়েক, শরহে বিকায়া ও হিদায়াহ খুলে দেখুন না! কোথাও শবে বরাত নামের কিছু পাওয়া যায় কিনা! অথচ আমাদের পূর্বসূরী ফিকাহবিদগণ ইসলামের প্রতি সামান্য বিষয়গুলোও আলোচনা করতে কোন ধরনের কার্পণ্যতা দেখাননি। তারা সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের সালাত সম্পর্কেও অধ্যায় রচনা করেছেন। অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন, কবর যিয়ারতের মতো বিষয়েরও। যদি এ সম্পর্কে কিছু থাকত তাহলে ফিকাহবিদগণ এর আলোচনার মাসয়ালা-মাসায়েল অবশ্যই বর্ণনা করতেন।

সুতরাং এ রাতকে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত অভিহিত করা মানুষের মনগড়া বানানো একটি বিদ'আত যা কুরআন বা হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

৫. শবে বরাত সম্পর্কিত প্রচলিত আকীদাহ বিশ্বাস ও আমল

শবে বরাত যারা পালন করেন তারা শবে বরাত সম্পর্কে যে সকল ধারণা পোষণ করেন ও একে উপলক্ষ্য করে যে সকল কাজ করে থাকেন তার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

তারা বিশ্বাস করে যে, শবে বরাতে আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর এক বছরের রিযিক বরাদ্দ করে থাকেন। এ বছর যারা মারা যাবে ও যারা জন্ম নিবে তাদের

তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতে বান্দার পাপ ক্ষমা করা হয়। এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এ রাতে কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ রাতে গোসল করাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের রূহ এ রাতে দুনিয়ায় তাদের সাবেক গৃহে আসে। এ রাতে হালুয়া রুটি তৈরি করে নিজেরা খায় ও অন্যকে দেয়া হয়। বাড়িতে বাড়িতে মিলাদ পড়া হয়।

আতশবাজি করা হয়। সরকারি-বেসরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করা হয়। সরকারি ছুটি পালিত হয়। পরের দিন সিয়াম পালন করা হয়। কবরস্থানগুলো আগরবাতি ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। লোকজন দলে দলে কবরস্থানে যায়। মাগরিবের পর থেকে মসজিদগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ও জুমু'আয় মসজিদে আসে না তারাও এ রাতে মসজিদে আগমন করে। মসজিদগুলোতে মাইক চালু করে ওয়াজ-নসীহত করা হয়। শেষ রাতে সমবেত হয়ে দু'আ-মুনাজাত করা হয়। বহু লোক এ রাতে ঘুমানোকে অন্যায় মনে করে থাকে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একশত রাকআত, হাজার রাকআত ইত্যাদি সালাত আদায় করা হয়।

লোকজন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে 'হুজুর! শবে বরাতের সালাতের নিয়ম ও নিয়তটা একটু বলে দিন।' ইমাম সাহেব আরবি ও বাংলায় নিয়ত বলেন দেন। কিভাবে সালাত আদায় করবে, কোন রাকআতে কোন সূরা তিলাওয়াত করবে তাও বলে দিতে কৃপণতা করে না।

যদি এ রাতে ইমাম সাহেব বা মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের চাকুরি যাওয়ার উপক্রম হয়।

৬. শবে বরাতের সম্পর্ক শুধু আমলের সাথে নয়

শবে বরাত সম্পর্কে উপরোল্লিখিত কাজ ও আকীদাহসমূহ শবে বরাত উদযাপনকারীরা সকলেই করেন তা কিন্তু নয়। কেউ আছেন উল্লিখিত সকল কাজের সাথে একমত পোষণ করেন। আবার কেউ আতশবাজী, আলোক সজ্জা পছন্দ করেন না, কিন্তু কবরস্থানে যাওয়া, হালুয়া-রুটি, ইবাদত-বন্দেগী করে থাকেন। আবার অনেকে আছেন যারা এ রাতে শুধু সালাত আদায় করেন ও পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করেন। এ ছাড়া অন্য কোনো আমল করেন না। আবার অঞ্চল ভেদে আমলের পার্থক্য দেখা যায়।

কিন্তু একটি বিষয় হলো, শবে বরাত সম্পর্কে যে সকল ধর্ম বিশ্বাস ও আকীদাহ পোষণ করা হয় তা কিন্তু কোনো দুর্বল হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় না। যেমন ভাগ্যলিপি ও বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি। যারা বলেন, আমলের ফযিলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়। কাজেই এর উপর ভিত্তি করে শবে বরাতে 'আমল করা যায়, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো– তাহলে শবে বরাতের আকীদাহ সম্পর্কে কি দুর্বল হাদীসেও দরকার নেই?

অথবা এ সকল প্রচলিত আকীদার ক্ষেত্রে যদি কোনো দুর্বল হাদীস পাওয়াও যায় তাহলে তা দিয়ে কি আকীদাহগত কোনো মাসয়ালা প্রমাণ করা যায়? আপনারা শবে বরাতের আমলের পক্ষ সমর্থন করলেন কিন্তু আকীদার ব্যাপারে কি জবাব দিবেন?

কাজেই শবে বরাত শুধু আমলের বিষয় নয়, আকীদারও বিষয়। তাই এ ব্যাপারে ইসলামের দায়ীদের সতর্ক হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি।

শবে বরাত সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা এ রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি এ রাতে মানুষের হায়াত, রিযিক ও ভাগ্যের ফায়সালা করে থাকেন, এ রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মতো অন্যায় নয়?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ.

অর্থ : তার চেয়ে বড় যালিম আর সে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে?

(সূরা সাফ : আয়াত-৭)

৭. শবে বরাতের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীসমূহের পর্যালোচনা

১নং হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِطَّلَعَ اللهُ اِلٰى خَلْقِهٖ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُمْلِىْ لِلْكَافِرِيْنَ وَيَدَعُ اَهْلَ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ حَتّٰى يَدْعُوْهُ.

অর্থ : আবু সালাবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাত উপনীত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেন। মু'মিদেরকে ক্ষমা করেন, কাফিরদের শাস্তি বৃদ্ধি করেন, আর হিংসুকদের তিনি অবকাশ দেন যেন তারা হিংসা পরিত্যাগ করে। (সহীহ জামে)

হাদীসটি বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন। নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

২নং হাদীস

٢- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى لِيَطَّلِعَ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ شَاحِنٍ۔

অর্থ : সাহাবী আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মধ্য শাবান মাসের রাতে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকূলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত সকল মাখলুককে ক্ষমা করেন।

হাদীসটি এ সূত্রে ইবনে মাজাহ (রহ) বর্ণনা করেছেন, আর ইবনে হিব্বান মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

৩নং হাদীস

٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَطَّلِعُ اللهُ اِلٰى خَلْقِهٖ فِىَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لِاَهْلِ الْاَرْضِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مَشَاحِنٍ۔

অর্থ : সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা মধ্য শাবানের রাতে তার সৃষ্টিকূলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের ক্ষমা করে দেন।

(সহীহ জামে)

বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল-বানী (রহ) হাদীসটিকে সহীহ' বলেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উপরের তিনটি হাদীস মূলতঃ একই বিষয়ের একই হাদীস। তিনটি আলাদা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রকে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল-বানী (রহ) 'হাসান' বলেছেন। আর তৃতীয় সূত্রের বর্ণনাকে তিনি 'সহীহ' বলেছেন। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হাদীস তিনটির মর্ম সহীহ। এ হাদীস দ্বারা উক্ত রাতের ফযিলত প্রমাণিত হয়। তাহলে এ ধরনের ফযিলতপূর্ণ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করতে দোষ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীতে দেয়া হবে।

৪নং হাদীস

٤.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتَ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَرَسُوْلُهُ؟ قُلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ .

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ .

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় দেখতে পেলাম না, তাই আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম বাকী নামক কবরস্থানে। রাসূল ﷺ বললেন : তুমি কি আশংকা কর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করবেন?

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি মনে করেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন। তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। বকরী এবং কুকুরের পশমের পরিমাণের চেয়েও অধিক পরিমাণ লোকদের ক্ষমা করেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন : আয়েশা (রা)-এর হাদীস আমি হাজ্জাজের বর্ণিত সনদ (সূত্র) ব্যতীত অন্য কোনোভাবে চিনি না। আমি মুহাম্মদকে (ইমাম বুখারী) বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলতেন। তিরমিযী (রহ) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর উরওয়াহ থেকে হাদীস শোনেননি এবং মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেছেন : হাজ্জাজ ইয়াহ্ইয়াহ ইবনে কাসীর থেকে শ্রবণ করেননি।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি দুটি দিক থেকে মুনকাতি অর্থাৎ এর সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন।

অপরদিকে এ হাদীসের একজন বর্ণকারী হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ মুহাদ্দিসীনদের নিকট দুর্বল বলে পরিচিত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা শবে বরাতের বেশি বেশি ফযিলত বয়ান করতে অভ্যস্ত তারা তিরমিযী (রহ)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি খুব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেন অথচ যারা হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ভালো জানেন তাদের এ মন্তব্যটুকু গ্রহণ করতে চান না। এ হাদীসটি আমলের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য হওয়ার জন্য ইমাম তিরমিযীর ও মন্তব্যটুকু কি যথেষ্ট নয়? যদি তর্কের খাতিরে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে কি প্রমাণিত হয়? আমরা যারা ঢাকঢোল পিটিয়ে মসজিদে একত্রিত হয়ে যেভাবে শবে বরাত উদযাপন করে থাকি, তাদের আমলের সাথে এ হাদীসটির মিল কোথায়? বরং এ হাদীসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িত আয়েশা (রা)-কে ডাকলেন না। ডাকলেন না অন্য কাউকে। তাকে জাগালেন না বা সালাত আদায় করতেও বললেন না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রমযানের শেষ দশকে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। বেশি পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোনো ইবাদাত করার ফযিলত থাকত তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেন আয়েশা (রা) বললেন না? কেন রমযানের শেষ দশকের মতো সকলকে জাগিয়ে দিলেন না, তিনি তো নেক কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোনো অলসতা বা কৃপণতা করেননি।

৫নং হাদীস

٥. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :
قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيْ، فَاَطَالَ
السُّجُوْدَ، حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ
حَتّٰى حَرَّكْتُ اِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ
السُّجُوْدِ وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : يَا عَائِشَةُ اَوْ يَا حُمَيْرَاءُ

اَظَنَنْتِ اَنَّ النَّبِيَّ قَدْ خَانَ بِكَ؟ قُلْتُ لاَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لٰكِنَّ ظَنَنْتُ اَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُوْلِ سُجُوْدِكَ فَقَالَ اَتَدْرِيْنَ اَىَّ لَيْلَةٍ هٰذِهٖ؟ قُلْتُ اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ : هٰذِهٖ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلٰى عِبَادِهٖ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحَمِيْنَ وَيُؤَخِّرُ اَهْلَ الْحَقْدِ كَمَا هُوَ.

অর্থ : আলা ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) বলেন : কোনো এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি এ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম, আঙ্গুলটি নড়ে উঠল। আমি চলে এলাম। অতঃপর যখন তিনি সেজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং সালাত থেকে অবসর হলেন তখন তিনি বললেন : হে আয়েশা! অথবা বললেন হে হুমায়রা! তুমি কি মনে করেছ আল্লাহর নবী তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন? আমি বললাম : আল্লাহর কসম হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ধারণা পোষণ করিনি; বরং আমি আপনার দীর্ঘ সেজদায় ধারণা করেছি না জানি আপনি ইন্তেকাল করলেন! অতঃপর তিনি বললেন : তুমি কি জান এটা কোন রাত? আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটা মধ্য শাবানের রাত। এ রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীদেরকে ক্ষমা করেন, দয়া প্রার্থনাকারীদের দয়া করেন এবং তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। (বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমান কিতাবে বর্ণনা করেছেন।)

হাদীসটি মুরসাল। সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। কেননা বর্ণনকারী 'আয়েশা (রা) থেকে শোনেননি।

৬নং হাদীস

٦. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ

اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ : اَلاَ مَنْ مُسْتَغْفِرْ فَاغْفِرُ لَهٗ اَلاَّ مَنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقُ لَهٗ اَلاَ مَنْ مُبْتَلَى فَاَعَافِيْهِ اَلاَ كَذَا اَلاَ كَذَا حَتّٰى يَطْلُعُ الْفَجْرِ .

অর্থ : আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিবসে সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে থাকেন। এবং বলেন : কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কোন রিযিক প্রার্থনাকারী আমি রিযিক দান করব। আছে কি কোন বিপদে নিপতিত ব্যক্তি আমি তাকে সুস্থতা দান করব। এভাবে ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।

(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

প্রথমত : এ হাদীসটি দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদ (সূত্রে) ইবনে আবু সাবুরাহ নামে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের নিকট হাদীস জালকারী হিসেবে পরিচিত। এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।

দ্বিতীয়ত : অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সে সহীহ হাদীসটি হাদীসে কুদুসী নামেও পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهٗ وَمَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاَعْطِيَهٗ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهٗ .

অর্থ : আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলতে থাকেন : কে আছ আমার কাছে দুআ করবে

আমি কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী ও মুসলিম)

আর উল্লিখিত ৬ নং হাদীসের বক্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাদের দুআ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই সহীহ্ হাদীসের বক্তব্য হলো– আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাতের শেষের দিকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দুআ কবুলের ঘোষণা দিতে থাকেন।

আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহায়েন ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই মশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ৬ নং হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে।

কেউ বলতে পারেন যে, এই দু' হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ ৬ নং হাদীসের বক্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা মধ্য শাবানের রাতের শুরু থেকে দুনিয়ার আকাশের অবতরণ করেন। আর এ হাদীসে অবতরণ করেন। কাজেই দু' হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই যে কারণে ৬ নং হাদীসকে পরিত্যাগ করতে হবে। আমি বলব আসলেই এ দু' হাদীসের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। কেননা আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসের বক্তব্য হলো আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি রাতের শেষ অংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আর প্রতি রাতের মধ্যে শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ হাদীস মতে অন্যান্য রাতের মতো শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে আসেন। কিন্তু ৬ নং হাদীসের বক্তব্য হলো শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাতের প্রথম প্রহর থেকে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

৭নং হাদীস

٧- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادٰى مُنَادٍ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ، فَلاَ يَسْاَلُ اَحَدٌ اُعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةٍ بِفَرْجِهَا اَوْ مُشْرِكٍ -

অর্থ : উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয় : কে আছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করব। আছে কি কেউ কিছু প্রার্থনার আমি তাকে তা দিয়ে দিব। রাসূল ﷺ বলেন : মুশরিক ও ব্যভিচারী ব্যতীত সকল প্রার্থনা কবুল করা হয়। (বায়হাকী, শুয়াইবুল ঈমান)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহ) হাদীসটিকে তার সংকলন 'যয়ীফ আল-জামে' নামক কিতাবের ৬৫২ নং ক্রমিকে দুর্বল প্রমাণ করেছেন।

শবে বরাত সম্পর্কে এ ছাড়া বর্ণিত অন্যান্য সব হাদীস সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী (রহ) বলেন : এ মর্মে বর্ণিত অন্য সকল হাদীসই দুর্বল।

এ মাসে বেশি বেশি নফল সওম পালন করা যেতে পারে। বিশেষ করে মাসের প্রথম দিকে। আয়েশা (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এতো অধিক সওম পালন করতেন না।"

(সহীহ বুখারী, আবু দাঊদ, বায়হাকী)

শা'বান সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের ১ তারিখের রাতে নাকি ৪ রাকআত সালাত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার করে পড়তে হয়। এতে নাকি অগণিত সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসে যে কোনো রাতে এক সালামে ৮ রাকআত সালাত পড়ে ফাতেমা (রা)-এর নামে বখ্শে দিলে তিনি নাকি ঐ নামাযীর জন্য শাফাআত না করে বেহেশতে এক পা-ও দিবেন না।

আপনি ঐ শাফাআতের আশাধারী হওয়ার আগে দেখেন, যা চকচম করছে, তা আসলেই সোনা কি না?

৯. রমযান

রমযান মাস হলো আরবী দিনপঞ্জির আলোকে নবম মাস। এ মাসের বিশেষ আমল ও ফযিলতপূর্ণ অনেক দিক রয়েছে। যেমন–

১. ফযিলতের মাস হিসেবে রমযান

মহান আল্লাহ বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -

রমযান তো সেই মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে।

(সূরা আল-বাক্বারা : ১৮৫)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : اِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাস আসলে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শিকল দিয়ে বন্দি করে রাখা হয়।

(সহীহ হাদীস : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আহমদ, বায়হাকী)

فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِىْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ حَجَّةٍ ـ

রমযান মাস এলে তোমরা উমরা করো। কেননা, রমাযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমান। (সহীহ : সহীহুল বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَتَاكُمْ شَهْرٌ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهٗ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সামনে রমযান মাস সমাগত। তা বরকতময় মাস। আল্লাহ তোমাদের উপর সে মাসের সওম পালন ফরয করেছেন। (সহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৫, নাসায়ী, বায়হাকী, মিশকাত হা/১৯৬২)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَتْ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادٰى مُنَادٍىْ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে একজন ঘোষাণাকারী এই বলে ঘোষণা দিতে থাকেন। হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর

হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও! আর এ মাসে মহান আল্লাহর বিশেষ দয়ায় জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে। (হাদীস হাসান : ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, তিনি একে গরীব বলেছেন। ইমাম হাকিম বলেন : এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। আহমদ, সহীহ আত-তারগীব, মিশকাত হা:/১৯৬০, তা'লীকুর রাগীব ২ /৬৮। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذا كَانَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ـ

রমযান মাসে রহমতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, আবু আওয়ানাহ। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে : "আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (আত-তারগীব)

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ : صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ قِیْلَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ فَقُلْتَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ اٰمِیْنَ فَقَالَ اِنَّ جِبْرِیْلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَتَانِیْ فَقَالَ مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ یَغْفِرُ لَهٗ فَدَخَلَ النَّارِ فَاَبْعَدَهُ اللّٰهُ قُلْ اٰمِیْنَ فَقُلْتُ اٰمِیْنَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত! একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে বললেন : আমীন, আমীন, আমীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি মিম্বরে আরোহন করলেন। তারপর বললেন– আমিন, আমিন, আমিন। আপনি এমন করলেন কেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন : (মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই) জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমযান মাস পেল অথচ তার জীবনের সমস্ত গুনাহের ক্ষমার ব্যবস্থা হলো না। (অতঃপর জিবরীল বললেন, বলুন, আমীন) আমি বললাম : আমীন-তাই হোক। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, আহমদ, তিরমিযী, হাকিম, ফাতহুর রব্বানী)

রমযান মাসের তারাবীহ্ সালাতের ফযিলত–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

২. রমযান মাসের ই'তিকাফ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ

وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔

"অর্থ : আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১২৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۔

"আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।" এগুলো আল্লাহর সীমারেখা তোমরা এগুলোর নিকটবর্তীও হয়ো না।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ আদায় করতেন।" (বুখারী-১৯২১, মুসলিম-১১৭১)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ পালন করতেন, অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরবর্তীতে ইতিকাফ করেছেন।" (বুখারী-১৯২২, মুসলিম-১১৭২)

৪টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. ইতিকাফ পূর্বের উম্মতের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

২. ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ইতিকাফ মহান ইবাদত, বান্দা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। নবী করীম ﷺ সর্বদা ইতিকাফ করেছেন।"

ইমাম যুহরি (র) বলেছেন : মুসলমানদেরকে দেখে আশ্চর্য লাগে, তারা ইতিকাফ পরিত্যাগ করেছে, অথচ নবী করীম ﷺ মদিনাতে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ইতিকাফ ত্যাগ করেননি।"

(শারহুল ইব্ন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৮১)

আতা আল-খুরাসানি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আগে বলা হতো : ইতিকাফকারীর উদাহরণ ঐ বান্দার মতো, যে নিজেকে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করে বলছে : হে আল্লাহ! যতক্ষণ না তুমি ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না, হে আমার রব! যতক্ষণ না তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না।"

(শারহুল ইবন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৮২)

৩. মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ। জুমার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না, যদিও জুমআর সালাতে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হোক না কেন।

৪. যার ওপর জামায়াতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়, সে এমন মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবে, যেখানে জামায়াত আদায় হয় না, যেমন পরিত্যক্ত মসজিদ, বাজারের মসজিদ ও কৃষি জমির মসজিদ ইত্যাদি।

(দেখুন: শারহুল মুফতি : (৬/৫০৯)

৫. নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, অনুরূপ তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা।

৬. ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমন বৈধ নয়, ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমনের ফলে ইতিকাফ নষ্ট হবে, তবে তার ওপর কাফফারা বা কাযা ওয়াজিব হবে না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "ইতিকাফকারী সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, পুনরায় সে ইতিকাফ আরম্ভ করবে।" (ইবনে আবি শায়বাহ-২/৩৩৮, আলবানি ঃ ইরওয়াউল গালিলে হাদীসটি সহীহ বলেছেন, তিনি বলেছেন : হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। ইরওয়াউল গালিল-৪/১৪৮)

৭. ইতিকাফকারী ভুলক্রমে সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না, যেমন ভঙ্গ হবে না তার সিয়াম।

৩. ইতিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত–

إِنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ .

"তিনি ঋতুস্রাবের সময় নবী করীম ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন, যখন তিনি মসজিদে ইতিকাফ করতেন, আর আয়েশা (রা) ঘর থেকে তাঁর মাথা গ্রহণ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় আছে–

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

"তিনি মানুষিক প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।"

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خِلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ইতিকাফ করতেন, তিনি হুজরার ফাঁক দিয়ে আমার কাছে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন, আমি তা ধৌত করে দিতাম।" অপর বর্ণনায় রয়েছে : "আমি ঋতুবর্তী অবস্থায় তাঁর মাথায় চিরুনি করতাম।" (দেখুন : মালেক-১/৬০, বুখারী-১৯৪১, মুসলিম-২৯৭, আবু দাউদ-২৬৬৯, সর্বশেষ বর্ণনা বুখারী-১৯২৪ ও মুসলিম-১/৩১ এর ভূমিকায় রয়েছে।)

আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا .

"যখন তিনি ইতিকাফ পালন করতেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত কখনো ঘরে প্রবেশ করতেন না।" (দেখুন : মূল হাদীস বুখারী-১৯৪১ ও মুসলিমে-২৯৭, তবে এ বর্ণনায় নাসায়ি ফিল কুবরা থেকে নেয়া-৩৩৬৯)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِنِّىْ كُنْتُ لَاَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا اَسْاَلُ عَنْهُ اِلَّا وَاَنَا مَارَّةٌ۔

"আমি প্রয়োজনবশত ঘরে প্রবেশ করতাম, সেখানে রোগী থাকত, কিন্তু চলন্ত অবস্থায় ব্যতীত তার সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করতাম না।" (মুসলিম-২৯৭)

আয়েশা (রা) বলেন : "ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে– রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযায় উপস্থিত না হওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ বা তার সাথে সহবাস না করা, খুব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বের না হওয়া, রোযা ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, অনুরূপ জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়।" (আবু দাউদ-২৪৭৩, দারা কুতনি-২/২০১, তিনি বলেছেন এখানে ইমাম জুহরি (র)-এর কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বায়হাকী ফিস সুনান-৪/৩২১, তিনি বলেছেন, সেটা উরওয়া (র)-এর বাণী। দেখুন; ফাতহুল বারি-৪/২৭৩, আত-তামহিদ-৮/৩২০)

১৬টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. ঋতুবর্তী নারী পাক, তার ঋতুর স্থান ব্যতীত। (আত-তামহিদ-৮/৩২৪, তিনি এ ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন-২২/১৩৭, অনুরূপ ইজমা নকল করেছেন ইমাম নববী শরহে মুসলিমে-১/১৩৪, আরো দেখুন: শারহু ইবনু বাত্তাল-৪/১৬৪) অনুরূপ যার ওপর গোসল ফরয সেও পবিত্র। (দেখুন : শাহরু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৭)

২. ইতিকাফকারীর শরীরের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের করলে বাহিরে গণ্য হবে না, ইতিকাফ নষ্ট হবে না, যেমন মসজিদের জানালা অথবা দরজা থেকে যদি কিছু গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করার ইচ্ছা করে, তাহলে এতে সমস্যা নেই। (শারহুল নববী-৩/২০৮, আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

৩. ইতিকাফকারীর মাথা ধৌত করা, চুল আঁচড়ানো, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা ন্যাড়া করা ও সৌন্দর্য গ্রহণ করা বৈধ। (আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

৪. নবী ﷺ-এর চুল খুব ঘন ছিল।

৫. যার চুল খুব ঘন, তার উচিত চুল পরিষ্কার রাখা, চিরুনি ব্যবহার করা ও চুলের যত্ন নেয়া। পোশাক-পরিচ্ছেদ ও শরীরের পবিত্রতা ত্যাগ করা সুন্নাত কিংবা শরিয়ত নয়। (আল-ইস্তেযকার-১/৩৩০, শারহু ইবনুল মুলাক্কিন-৫/৪৩৮)

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল চিরুনি করা থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্য, তেল ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ।
(শারহু ইবনু বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৫)

৭. ইতিকাফকারীর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং স্ত্রীর কাম স্পৃহা ব্যতীত স্বামীর শরীরের কিছু অংশ স্পর্শ করা বৈধ। (শারহুন নববী-১/১৩৪)

৮. স্ত্রীর জন্য স্বামীর সেবা করা বৈধ, যেমন তার মাথা ধৌত করা, চুল আঁচড়ে দেয়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি। (শারহুন নববী-৩/২০৮)

৯. মানুষিক প্রয়োজন ব্যতীত ইতিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়, যেমন পেশাব-পায়খানা, অথবা পানাহার, যদি তা মসজিদে পৌঁছে দেয়ার কেউ না থাকে, অনুরূপ প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু, যা মসজিদে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তার জন্য বের হলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না।"
(আত-তামহিদ-৮/৩২৭, তারহুত তাসরিব-৪/১৬৯, আল-ফুরু-৩/১৩৪, আল-মুগনি-৩/৬৮)

১০. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ না করার কসম করেছে, সে যদি ঘরে মাথা প্রবেশ করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (আবু দাউদের টীকায় মাআলেমুস সুনান-২/৮৩৪, শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৬৬, শারহু ইবনে মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৭, আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

১১. ইতিকাফকারী জরুরি প্রয়োজন বের হলে দ্রুত হাঁটা জরুরি নয়, বরং অভ্যাস অনুযায়ী হাঁটা, তবে প্রয়োজন শেষে দ্রুত ফিরে আসা ওয়াজিব।
(আল-মুগনি-৩/৬৯)

১২. ইতিকাফকারী রোগী দেখা কিংবা জানাযায় উপস্থিত হবে না, এটা জমহুর আলেমদের অভিমত। (শারহু ইবন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৬)
তবে সে চলন্ত অবস্থায় রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, কিন্তু থামবে না। (শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৯))

১৩. ইতিকাফকারী যদি জরুরি কাজে বের হয়, যেমন পিতার মৃত্যু অথবা সন্তানের মৃত্যু, তাহলে প্রয়োজন শেষে নতুন করে ইতিকাফ করবে, যদি সে বিনা শর্তে ইতিকাফ করে। (শারহু ইবনু বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৬)

১৪. হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, নারী তার স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করবে, স্বামীর বাড়িতে যদিও কোনো প্রয়োজন না থাকে, কিংবা কোনো শরয়ী কারণে সে বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে, যেমন সফর ও ইতিকাফ। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।
(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪০)

১৫. ইতিকাফকারী প্রয়োজন ব্যতীত ইতিকাফের স্থান থেকে বের হলে ইতিকাফ বিনষ্ট হয়ে যাবে। (আল-মুগনি-৩/৭০)

১৬. ইতিকাফের জন্য রোযা ও জামে মসজিদ শর্ত কি-না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়, কারণ নবী করীম ﷺ শাওয়ালে ইতিকাফ করেছেন। পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফ বৈধ, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামায়াত হয়, কিন্তু জুমা হয় না। ইতিকাফকারী জুমার সালাতের জন্য জামে মসজিদে যেতে পারবে, এ জন্য তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না, তবে উত্তম জামে মসজিদে ইতিকাফ করা। (ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা, ফাতাওয়া নং-৬৭১৮)

৪. ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত

সাফিয়া বিনতে হুইয়াই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফে ছিলেন, আমি রাতে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসি। আমি তাঁর সাথে কথা বলি, অতঃপর রওয়ানা দেই ও ঘুরে দাঁড়াই, তিনি আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঘর ছিল উসামা বিন যায়েদের বাড়িতে। এমন সময় দু'জন আনসার অতিক্রম করল, তারা নবী করীম ﷺ-কে দেখে দ্রুত চলল, নবী করীম ﷺ তাদের বললেন : থাম, এ হচ্ছে সাফিয়াহ বিনতে হুইয়াই। তারা আশ্চর্য হলো: সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় বিচরণ করে, আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।" (বুখারী-৩১০৭, মুসলিম-২১৭৫, দ্বিতীয় বর্ণনা বুখারী-২৯৩৪ ও মুসলিমের-২১৭৫)

হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন : নবী ﷺ মসজিদে ছিলেন, তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রীগণ উপবিষ্ট ছিল, অতঃপর তারা চলে গেল। তিনি সাফিয়াহ বিনতে হুইয়াইকে বললেন : দ্রুত কর না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের সাথে আছি। সাফিয়ার ঘর ছিল উসামার বাড়িতে। নবী ﷺ তার সাথে বের হলেন, তার সাথে দু'জন আনসারের সাক্ষাত ঘটল, তারা নবীকে দেখল, অতঃপর দ্রুত চলল। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন : এ হচ্ছে সাফিয়াহ বিনতে হুইয়াই। তারা বলল : সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় বিচরণ করে, আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের অন্তরে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। (বুখারী-২০৩৮, মুসলিম-২১৭৫)

১৫টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. এ হাদীসে উম্মতের ওপর নবী ﷺ এর দয়া, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা ও তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার প্রমাণ মিলে, যাতে রয়েছে তাদের আত্মা ও অন্তরের পরিশুদ্ধতা। কারণ নবী ﷺ আশঙ্কা করেছেন যে, শয়তান তাদের অন্তরে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, আর নবীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা কুফর, তাই তিনি তাদের সতর্ক করে দিলেন। (শারহুন নববী-১৪/৫৬)

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন : "তিনি তাদেরকে এ জন্য বলেছেন, কারণ তিনি তাদের ওপর কুফরির আশঙ্কা করেছেন, যদি তারা তাঁর সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করত, তাই তাদের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা সঞ্চার করার পূর্বে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল, তিনি দ্রুত জানিয়ে দিয়ে তাদের হিতকামনা করলেন।

২. ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত করা বৈধ, মসজিদে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সাক্ষাত করতে ও কথা বলতে পারবে এতে ইতিকাফের কোনরূপ ক্ষতি হবে না। তবে অতিরিক্ত গমনাগমন ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে, কখনো ইতিকাফ বিনষ্টকারী কর্মে লিপ্ত করে, তাই তা থেকে বিরত থাকা উত্তম।

৩. মুসলমানদের উচিত অপবাদ ও সন্দেহের স্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখা, যখন খারাপ ধারণার আশঙ্কা হয় স্পষ্ট করে দিবে যেন তা দূরীভূত হয়ে যায়। বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম ও নেককার লোকদের ব্যাপারে, তাদের এমন কাজ করা বৈধ নয় যা মানুষের অন্তরে সন্দেহের জন্ম দেয়। অনুরূপ বিচারকের বিচার ব্যাখ্যা করে দেয়া উচিত, যদি বিবাদীর নিকট তার কারণ অস্পষ্ট থাকে ও পক্ষপাত দুষ্টের ধারণা জন্মায়।

৪. শয়তান ও তার ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব, কারণ সে বনী আদমের রক্তের শিরায় বিচরণ করে।

৫. আশ্চর্য হয়ে সুবহানাল্লাহ বলা বৈধ। যেমন আয়েশা (রা)-এর ওপর অপবাদের ঘটনায় আছে :

سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

"তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ।"

(সূরা নূর : আয়াত-১৬)

৬. ইতিকাফকারীর বৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয। যেমন সাক্ষাতকারীকে উৎসাহ দেয়া, তার সাথে দাঁড়ানো ও তার সাথে কথা বলা, তবে অতিরিক্ত না করা।

৭. ইতিকাফকারীর পাঠ দান করা, শিক্ষণীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা ও দ্বীনি বিষয়ে লেখা বৈধ, তবে বেশি পরিমাণে নয়, কারণ ইতিকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া।

৮. ইতিকাফকারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারবে, যেমন খাবার ইত্যাদি।

৯. স্ত্রীর সাথে ইতিকাফকারী নির্জনে মিলিত হতে পারবে, তবে স্ত্রীগমন থেকে সতর্ক থাকবে।

১০. নিরাপত্তা থাকলে নারীদের রাতে বের হওয়া বৈধ।

১১. যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে, তাকে সালাম দেয়া বৈধ, কারণ কতক বর্ণনায় এসেছে তারা উভয়ে নবী ﷺ কে সালাম করেছিল, তিনি তাদের বিরত করেননি।

১২. যদি ব্যক্তির সাথে স্ত্রী বা মাহরাম থাকে, সে যে কাউকে সম্বোধন করতে পারবে, বিশেষ করে যদি তার প্রয়োজন হয়, কোনো হুকুম বর্ণনা করা অথবা কোনো অনিষ্ট দূর করা ইত্যাদি, এটা রুচি বিরোধী নয়।

১৩. কথা বা কোনো মাধ্যমে ইতিকাফকারী নিজের ওপর খারাপ ধারণা দূর করতে পারবে, অনুরূপ সে হাতের দ্বারা কষ্ট দূর করতে পারবে, যদি কেউ তার ওপর সীমালঙ্ঘন করতে চায়। ইতিকাফকারী মুসল্লির চেয়ে বেশি নয়, মুসল্লির জন্য বৈধ তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাঁধা দেয়া, অনুরূপ, ইতিকাফকারী সে ব্যক্তিকে বারণ করতে পারবে, যে তার ওপর সীমালঙ্ঘন করে, এ জন্য তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না।

১৪. একান্ত প্রয়োজন না হলে ধীরে কাজ করা ও দ্রুততা পরিহার করা, কারণ নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলেছেন : عَلَى رِسْلِكُمَا "তোমরা ধীরে পথ চল।"

১৫. নবী করীম ﷺ স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় বিচার করতেন। কেননা তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর ইতিকাফে তাকে দেখতে এসেছেন, যখন তারা যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তিনি সাফিয়াকে বললেন : ত্বাড়াহুড়ো করো না। সাফিয়াকে থাকার নির্দেশের কারণ সম্ভবত সে অন্যদের চেয়ে দেরীতে এসেছে, তাই তাকে দেরীতে যেতে বলেছেন, যেন তার নিকট অবস্থানের সময় সবার সমান হয়, অথবা তার বাড়ি অন্য স্ত্রীদের বাড়ি থেকে দূরে ছিল, তাই নবী ﷺ তার ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন। মুসলমানদের উচিত অনুরূপভাবে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ও তাদের প্রতি যত্নশীল থাকা।

৫. এ'তেকাফের মান্নতকারীর বিধান

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলি যুগে মানত করেছি, একরাত মসজিদে হারামে ইতিকাফ করব। নবী করীমﷺতাকে বললেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর, অতঃপর তিনি একরাত ইতিকাফ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, ওমর (রা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে "জিইরানা" নামক স্থানে, রাসূলুল্লাহﷺকে জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলি যুগে মানত করেছি মসজিদে হারামে একরাত ইতিকাফ করব, আপনার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বললেন : যাও, একদিন ইতিকাফ কর। (বুখারী-১৯৩৭, মুসলিম-১৬৫৬)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, "আমি যখন ইসলাম কবুল করেছি, রাসূলুল্লাহﷺকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।"

(বায্যার-১৪০, বায়হাকি-৯১০/৭৬৩)

৯টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. জাহেলি যুগে ইতিকাফ ও মানত প্রচলিত ছিল।

২. ইসলাম পূর্বের মানত ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্ণ করা বৈধ, কেউ তা পূর্ণ করা ওয়াজিব বলেছেন।

৩. ওমর (রা)-এর জাহেলি যুগের মানত থেকে দায় মুক্ত হওয়ার আগ্রহ, এটা তার তাকওয়া ও পরহেযগারি প্রমাণ করে।

৪. ওয়াদা পূর্ণ করার গুরুত্ব, কখনো তার খেলাফ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরকে তা পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান দিয়েছেন, অথচ তা জাহেলি যুগের প্রতিশ্রুতি ছিল। (শরহু ইবনে বাত্তাল-৪/১৬৮)

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একদিন অথবা একরাত ইতিকাফ করা বৈধ।

৬. এ হাদীস তাদের দলিল, যারা বলে রোযা ব্যতীত ইতিকাফ বৈধ, কারণ রাত সওমের স্থান নয়।

নোট : ইতিকাফে যারা রোযা শর্ত বলেন তাদের মধ্যে ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মালেক, শাবি, আওযায়ি, সাওরি, আহনাফ এবং এটা আহমদের এক ফতওয়া। ইমাম কুরতুবি ও ইবনুল কাইয়ুম এ অভিমতকে মজবুত করেছেন। আর যারা বলেছেন, ইতিকাফে সওমের শর্ত করা না হলে, সাওম জরুরি নয়, তাদের মধ্যে আলী, ইবনে মাসউদ, হাসান বসরি, আতা ইবনে আবি রাবাহ, ওমর ইবনে আব্দুল আযিয ও ইবনে

উসাইমিন রয়েছেন। লাজনায়ে দায়েমার ফতওয়া এর উপর। দেখুন : আল-ইস্তেযকার-৯১০-২৯১-২৯৩, তাহযিবুস সুনান-৭/১০৫-১০৯, শারহুন নববী-১১/১২৪-১২৬, আল-মুফহিম-৪/২৪১, শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪৬, তুহফাতুল আহওয়াযি-১৫/১১৯, আল-ইফহাম ফি শারহি বুলুগুল মারাম-১/৩৭২, শারহুল মুমতি-৬/৫০৬-৫০৭, ফতওয়া লাজনায়ে দায়েমা-৬৭১৮)

৭. যারা বলেছেন রোযা ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ, এ ব্যাপারে আলেমদের দু'ধরনের বক্তব্য থেকে তাদের কথা সঠিক। এ কারণে রোগী ইতিকাফ করতে পারবে, যে রোগের জন্য রোযা ভঙ্গ করেছে। (শারহুল মুমতি-৬/৫০৭)

৮. অজানা বিষয় আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা, যেমন ওমর (রা) আনহু তাঁর মানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছেন। অনুরূপ যাকে প্রশ্ন করা হয়, তার জন্য ওয়াজিব হলো বলা, গোপন না করা।
(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪৬)

৯. কেউ যদি তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইতিকাফের মানত করে, আর সেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ সফরের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে মানত পূর্ণকরা জায়েয নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন : "তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না। তবে সফরের প্রয়োজন না হলে জায়েয আছে।
(ফতওয়া সাদিয়া-২৩১-২৩২)

৬. নারীদের ইতিকাফ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার কথা বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর কাছে তার জন্য অনুমতি নেয়ার অনুরোধ করেন, তিনি তাই করেন। এ দেখে যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) তাঁবু তৈরির নির্দেশ প্রদান করেন, তার জন্য তাঁবু তৈরি করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তাঁর তাঁবুতে যান, তিনি সেখানে অনেক তাঁবু দেখতে পান। জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী? তারা বলল : আয়েশা (রা), হাফসা ও যয়নবের তাঁবু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : "এর দ্বারাই কি তোমরা নেকির আশা করেছ? আমি ইতিকাফই করব না।" তিনি ফিরে যান। অতঃপর রমযান শেষে শাওয়ালের দশ দিন ইতিকাফ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, ফজর সালাত আদায় করে ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একদা তিনি মসজিদে তার জন্য তাঁবু টানাতে নির্দেশ করলেন, তাঁবু টানানো হলো, তিনি

রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। যয়নব তাঁর জন্য তাঁবু টানাতে নির্দেশ করলেন, তাঁবু টানানো হলো, নবী ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁবু টানাতে নির্দেশ করলেন, তাদের জন্য তাঁবু টানানো হলো। তিনি যখন ফজর সালাত আদায় করলেন, দেখলেন অনেকগুলো তাঁবু। তিনি বললেন : তোমরা কি নেকির আশা করেছ? তিনি তার তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দেন ও রমযানের ইতিকাফ ত্যাগ করেন, অতঃপর শাওয়ালের প্রথম দশ দিনে ইতিকাফ করেন। (বুখারী-১৯৪০, মুসলিম-১১৭২)

১৭টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ করা জায়েয, যদি ফিতনার কোন আশঙ্কা না থাকে। (শারহুন নববী-৮/৭০, আল-মুফহিম-৩/২৪৮, শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ্-৫/৪২৯)

ইবনু আব্দিল বার আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি শুনেছি আহমদ ইবন হাম্বলকে ইতিকাফকারী নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, নারীরা ইতিকাফ করেছে।"

(আত-তামহিদ-১/১৯৫)

২. নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করবে না, এতে কারো কোনরূপ মতানৈক্য নেই।

(ইবনুল মুলাক্কিন শারহুল উমদাহ গ্রন্থে এ ইজমা নকল করেছেন-৫/৪২৯)

যদি সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করে, তাহলে স্বামীর অধিকার রয়েছে তার ইতিকাফ ভঙ্গ করানো। ইতিকাফের অনুমতি দেয়ার পর স্বামী যদি কোনো কারণে তার ইতিকাফ ভাঙ্গতে চায়, তাহলে তার অধিকার রয়েছে। (শারহুন নববী-৮/৭০, আল-মুফহিম-৩/২৪৫, ফাতহুল বারি-৪/২৭৭)

৩. ইতিকাফ আরম্ভ করে প্রয়োজন হলে তা ভঙ্গ করা বৈধ। ইবন বায (রহ.) বলেছেন : "বিশুদ্ধ মতে ইতিকাফ আরম্ভ করলে ওয়াজিব হয় না এবং জুমার কারণে তা ভঙ্গ হয় না।")

৪. মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ হবে না, যদি অন্য কোথাও ইতিকাফ বৈধ হতো, তাহলে নারীর জন্য বৈধ হতো তার সালাতের জায়গায় ইতিকাফ করা। (শারহুন নববী-৮/৬৮, ফাতহুল বারী-৪/২৭৭)

৫. স্বামীর জন্য নিজ স্ত্রী ও পরিবারকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া, তাদের সংশোধন করা জায়েয। যেমন নবী ﷺ স্ত্রীদের ইতিকাফের অনুমতি দেন,

অতঃপর তাদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঈর্ষার আশংকায় তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন। (শারহুন নববী-৮/৬৯, আল-মুফহিম-৩/২৪৫ মিনহাতুল বারী-৪/৪৬৪, হামিয়াতুস সিনদি আলান নাসায়ি-২/৪৫)

৬. নফল ছুটে গেলে তা কাযা করা বৈধ। (মিনহাতুল বারি-৪/২৭৭)

৭. অতিরিক্ত ঈর্ষা খারাপ, কারণ তা হিংসার ফল, যা নিন্দনীয়।

৮. ভালো কাজ পরিত্যাগ করা বৈধ, যদি তাতে কল্যাণ থাকে।
(শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৮২, ফাতহুল বারী-৪/২৭৭)

৯. শুধু নিয়তের কারণে ইতিকাফ ওয়াজিব হয় না।
(ইমাম নববী শারহে মুসলিমে এ ব্যাপারে ঐক্যমত নকল করেছেন-৮/৬৮)

১০. ইতিকাফকারী ইতিকাফের জন্য মসজিদের একটা অংশ নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে, যদি তাতে মুসল্লিদের কোন সমস্যা দেখা না হয়। জায়গাটি নির্ধারণ করা চাই মসজিদের খালি অংশে বা শেষ প্রান্তে, যেন অন্যদের কষ্ট না হয় এবং ইতিকাফকাররি নির্জনতা ও একাকীত্ব অর্জন হয়। (শারহুন নববী-৮/৬৯)

১০. স্ত্রীদের সাথে নবী ﷺ এর সুন্দর আখলাক ও তাদের সঙ্গে চমৎকার হৃদ্যতা। যেমন তাদেরকে তিনি ইতিকাফ থেকে নিষেধ করে নিজেও তা পরিত্যাগ করেন, অথচ তিনি নিজে ইতিকাফ করতে পারতেন, কিন্তু আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য তা করেন নি। এটা ইমাম কুরতুবি উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন : "অথবা তার ইতিকাফে বহাল থাকলে এ আশঙ্কার জন্ম হতো যে, ইতিকাফ শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট, নারীদের জন্য নয়"। আল-মুফহিম-৩/২৪৬, ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেছেন : "তিনি তাদের অন্তরকে খুশি করার জন্য ইতিকাফ পিছিয়ে দেন, যেন এমন না হয়, তিনি ইতিকাফ করবেন- আর তারা ইতিকাফ করবে না"। শারহুল বুখারী-৪/১৬৯, শায়খ যাকারিয়া আনসারি উল্লেখ করেছেন, অথবা মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যাবে আশঙ্কায়। দেখুন : মিনহাতুল বারী-৪/৪৪)

অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিমের উচিত স্ত্রীদের আদব শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা, যা প্রতিশোধ ও জেদ দমনের পর্যায় পড়ে।

১২. যদি ইতিকাফকারী নারীর ঋতুস্রাব হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ইতিকাফ ভেঙ্গে দিবে, সে মসজিদ ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্র হয়ে পূর্বের ইতিকাফ শুরু করবে। (এটা জমহুরের অভিমত, যেমন যুহরি, রাবিয়াহ, মালেক, আওযায়ি, আবু হানীফা ও শাফিঈ, ইবন বাত্তাল তাদের থেকে এ বাণী নকল করেছেন-৪/১৭৪, ইমাম আহমদ অনুরূপ বলেছেন-৪/৪৮৯)

১৩. যদি কেউ নফল ইবাদতের নিয়ত করে, কিন্তু এখনো তা শুরু করেনি, তাহলে সে তা একেবারে ত্যাগ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে আদায় করা বৈধ। (শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৮৩)

১৪. যার মধ্যে কোনো ইবাদতের রিয়া নিশ্চিত জানা যায়, তাকে সে ইবাদত থেকে নিষেধ করা বৈধ। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন : "তোমরা কি নেকির ইচ্ছা করেছ।" অর্থাৎ তোমরা নবী ﷺ-এর নৈকট্য ও তাঁকে পাওয়ার আশা করেছ। এ জন্য তাদের ইতিকাফ নিষেধ করেন ও নিজের ইতিকাফ পিছিয়ে দেন। (শারহু ইবন বাত্তাল : (৪/১৮৩)

১৫. ইতিকাফে স্ত্রী, লোকজন ও অন্যদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব, তবে যখন প্রয়োজন হয় তা ব্যতীত যেমন সালাত, খানা ইত্যাদি। (শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৫)

১৬. রমযানে ইতিকাফ করা সুন্নাত। এটা নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ, এ হাদীস থেকে জানা যায় রমযান মাস ব্যতিত অন্যান্য মাসে ইতিকাফ করা বৈধ, যেহেতু নবী ﷺ শাওয়ালে ইতিকাফ করেছেন। (দেখুন : ফিকহুল ইবাদাত লি ইবন উসাইমিন-২০৮)

১৭. মসজিদের ভেতরের কক্ষে ইতিকাফ করা বৈধ, যার দরজা মসজিদের দিকে খোলা, তার হুকুম মসজিদের হুকুম, আর যদি মসজিদের বাইরে হয়, তাহলে সেটা মসজিদের অংশ নয়, যদিও তার দরজা মসজিদের দিকে। (ফতওয়াল লাজনাহ-৬৭১৮)

লাইলাতুল কদর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাতে ইবাদত করবে তার জীবনের পূর্বের সকল গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেয়া হবে।

(সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

৭. একুশে রমযান লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা

আবু সালামা ইবনে রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমরা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করলাম, অতঃপর আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গমন করি, তিনি আমার একান্ত বন্ধু ছিলেন। আমি তাকে বললাম : চলুন না খেজুর বাগানে যাই? তিনি বের হলেন, গায়ে উলের কালো চাদর। আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযানের মধ্য দশক ইতিকাফ করলাম। তিনি একুশের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে খুতবা পেশ করলেন। তিনি বললেন :

إِنِّيْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّيْ نَسِيْتُهَا أَوْ أُنْسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ، وَإِنِّيْ أُرِيْتُ أَنِّيْ أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ.

"আমি লাইলাতুল কদর দেখেছি, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি কিংবা আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমরা তা শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাতে অনুসন্ধান কর। আমাকে দেখানো হয়েছে– আমি মাটি ও পানিতে সেজদা করছি, যে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করেছিল সে যেন ফিরে আসে।" তিনি বলেন : আমরা ফিরে গেলাম, কিন্তু আসমানে কোনো মেঘ দেখতে পাইনি। তিনি বলেন, আমাদের উপর মেঘ বর্ষিত হলো, মসজিদের ছাদ টপকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ল, যা ছিল খেজুর পাতার। সালাত পড়া হলো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি পানি ও মাটিতে সেজদা করছেন। তিনি বলেন, আমি তার কপাল পর্যন্ত মাটির দাগ দেখেছি।" (দেখুন : বুখারী-১৯১২, মুসলিম-১১৬৭)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মধ্যম দশক ইতিকাফ করেছি, যখন বিশ রমযানের সকাল হলো আমরা আমাদের বিছানা-পত্র স্থানান্তর করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তিনি বললেন, যে ইতিকাফ করছিল সে যেন তার ইতিকাফে ফিরে যায়, কারণ আমি আজ রাতে (লাইলাতুল কদর) দেখেছি, আমি দেখেছি আমি পানি ও মাটিতে সেজদা করছি। যখন তিনি তাঁর ইতিকাফে

ফিরে যান, তখন আসমান অশান্ত হলো, ফলে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। সে সত্তার কসম, যে তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যেদিন আসমান অশান্ত হয়েছিল, তখন মসজিদ ছিল চালাঘর ও মাচার তৈরি, আমি তাঁর নাক ও নাকের ডগায় পানি ও মাটির আলামত দেখেছি।"

(দেখুন : মুসলিম-১১৬৭ আরো দেখুন : বুখারী-১৯৩৫)

অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের মধ্যম দশক ইতিকাফ করতেন, যখন তিনি প্রস্থানরত বিশের রাতে সন্ধ্যা করে একুশের রাতে পদার্পণ করতেন, নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। যে তাঁর সাথে ইতিকাফ করত সেও ফিরে যেত। তিনি কোনো এক রমযান মাসে যে রাতে সাধারণত ইতিকাফ থেকে ফিরে যেতেন সে রাতে ফিরে না গিয়ে কিয়াম (অবস্থান) করলেন, অতঃপর খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাই তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন–

كُنْتُ أُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ أُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُتْ فِيْ مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، وَابْتَغُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ وَطِيْنٍ ـ

"আমি এ দশক ইতিকাফ করতাম, অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হলো যে, আমি ইতিকাফ করব এ শেষ দশক। সুতরাং যে আমার সাথে ইতিকাফ করেছে, সে যেন তার ইতিকাফে বহাল থাকে। আমাকে এ রাতে দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা তা তালাশ কর শেষ দশকে। আর তা তালাশ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি দেখেছি, আমি পানি ও মাটিতে সেজদা করছি।" সে রাতে আসমান গর্জন করে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। একুশের রাতে নবী ﷺ-এর সালাতের জায়গায় মসজিদে ফোটা ফোটা বৃষ্টির পানি ফেলল। আমার দু'চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে, আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, তিনি সকালের সালাত থেকে ফিরলেন, তখন তাঁর চেহারা মাটি ও পানি ভর্তি ছিল।" (বুখারী-১৯১৪)

১৪টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা এবং উপযুক্ত যথা স্থান ও সময়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করা।

২. শিক্ষকদের কর্তব্য ছাত্রদের সুযোগ দান করা, যেন তারা সুন্দরভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে।

৩. মুসল্লির চেহারায় সেজদার সময় যে ধুলা-মাটি লাগে তা দূর করা উচিত নয়, তবে তা যদি কষ্টের কারণ হয়, সালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে, তাহলে মুছতে সমস্যা নেই।

নোট : বুখারী হুমাইদি থেকে বর্ণনা করেন, মুসল্লির জন্য সুন্নাত হচ্ছে সালাতে চেহারা না মুছা। ইমাম নববী বলেছেন : আলেমগণ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন : সালাতে চেহারা না মোছা মুস্তাহাব। শারহু মুসলিম-৮/৬১, ইব্‌ন মুলাক্কিন বলেছেন : এ ব্যাপারে কারো কারো দ্বিমত নেই। শারহুল উমদাহ-৫/৪২৩, ইকমালুল মুয়াল্লিম-৪/১৪৮)

মাটিতে সেজদা দেয়া ও সালাত আদায় করা বৈধ।
(শারহু ইব্‌নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২৫)

৪. নবী করীম ﷺ একজন মানুষ, তিনি মানুষের ন্যায় ভুলে যান, তবে আল্লাহ তাঁকে যা পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা ব্যতীত, কারণ সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁকে ভুল থেকে হিফাজত করেন। নবীদের স্বপ্ন সর্বদা সত্য হয় থাকে, তাঁরা যেভাবে দেখেন সেভাবে তা ঘটে ও থাকে।

৫. নবী করীম ﷺ-এর লাইলাতুল কদর দেখার অর্থ তিনি তা জেনেছেন, অথবা তাঁর আলামত দেখেছেন। আবু সাঈদ (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন : জিবরাঈল তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে।
(বুখারী-৭৮০, মুনতাকা লিল বাজি-২/৮২)

৬. আলেম যদি কোনো বিষয় জানার পর তা ভুলে যায়, তাহলে সাথীদের বলে দেয়া ও তা স্বীকার করা। (শারহু ইব্‌নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২৪)

৭. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রমযানে ইতিকাফ করা মুস্তাহাব। তবে প্রথম দশক থেকে মধ্যম দশক উত্তম, আবার মধ্যম দশক থেকে শেষ দশক উত্তম। (শারহু ইব্‌নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২২)

৮. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ইমামের খুতবা দেয়া ও জরুরি বিষয় বর্ণনা করা বৈধ।

৯. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী করীম ﷺ উম্মতকে তাদের কল্যাণের বস্তু জানানোর জন্য উদগ্রীব ছিলেন। লাইলাতুল কদর তালাশে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ সচেষ্ট থাকতেন।

১০. রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ফযিলত বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যেহেতু নবী করীম ﷺ কখনো তা ত্যাগ করেননি।

১১. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে, অথবা বিশেষ করে একুশের রাতে।

১২. সেজদায় কপাল ও নাক স্থির রাখা ওয়াজিব, যেরূপ নবী ﷺ রেখেছেন।

১৩. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ-এর যুগে মুসলমানগণ দুনিয়ার সামান্য বস্তু ও সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাদের মসজিদ ছিল খেজুর পাতার, যখন বৃষ্টি হতো, সালাতে থাকাবস্থায় তাদের ওপর বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ত।

১৪. একুশে রমযানের ফযিলত, এটা সম্ভাব্য লাইলাতুল কদরের রাত, কাজেই এ রাতে অবহেলা করা মুসলিমদের উচিত নয়।

৮. রমযানের শেষ দশকে রাত্রি জাগরণ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (রমযানের) শেষ দশক এসে উপস্থিত হতো, নবী করীম ﷺ লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন ও পরিবারের সদস্যদের জাগিয়ে তুলতেন। (বুখারী-১৯২০, মুসলিম-১১৭৪)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশকে এমন মুজাহাদা করতেন, যা তিনি অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম-১১৭৫)

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশকে নিজ পরিবারকে জাগ্রত করতেন। (তিরমিযী-৭৯৫)

হাদীসটি ইমাম আহমদ (র) এভাবে বর্ণনা করেন : "রমযানের শেষ দশক শুরু হলে নবী ﷺ পরিবারের লোকদের জাগাতেন ও লুঙ্গি উঁচু করে নিতেন। আবু বকর (রা) বলেন : আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলো, লুঙ্গি উঁচু করে পরার অর্থ কী? তিনি বললেন : স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ। (আহমদ-১/১৩২)

৬টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. নবী করীম ﷺ ইবাদতের জন্য অধিক পরিশ্রম করতেন। অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তবে অন্যান্য রাতের তুলনায় রমযানের শেষ দশকের রাতসমূহে তাঁর পরিশ্রম ছিল অধিক।

২. রমযানের শেষ দশকে স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করে সালাত, যিকির প্রভৃতি ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে বিনিদ্র রাত কাটানো নবী ﷺ-এর অন্যতম আদর্শ ছিল।

৩. রমযানের শেষ দশকের রাতে পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে তোলা সুন্নাত। যদি রমযানে তাদের রাত জাগার অভ্যাস হয়, তাহলে যেন গল্প-গুজব ত্যাগ করে সালাত ও যিকির-আযকারে লিপ্ত থাকে।

৪. গৃহকর্তা স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নফল ইবাদত আবশ্যক ও তার চাপ প্রয়োগ করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য তাদের ওপর ওয়াজিব।
(শারহু ইব্‌ন বাত্তাল-৪/১৫৯, আল-মুফহিম-৩/২৪৯)

৫. রমযানের শেষ দশকের রাতে সালাত ও যিকিরে মগ্ন থাকা মুস্তাহাব। কারণ তা নবী করীম ﷺ-এর আমল, উপরের হাদীস তার প্রমাণ। আর সারারাত জাগ্রত থাকার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তার অর্থ সারা বছর রাত জাগ্রত থাকা, তবে যেসব রাতে বিশেষ ফযিলত রয়েছে যেমন শেষ দশকের রাত, তা ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম। (শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৭১, ফাতাওয়াল কুবরা লি ইব্‌ন তাইমিয়াহ-২/৪৯৮, দিবায-৩/২৬৪, আউনুল মাবুদ-৪/১৭৬, আদদুররিল মুদিয়াহ লিশ শাওকানি-১/২৩৪))

৬. শেষ দশকের রাতগুলো জাগার উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যদি সারা বছর তার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে তার অনুসন্ধানে অনেকের খুব কষ্ট হতো; বরং অধিকাংশ লোক তা থেকে বঞ্চিত থাকত। (শারহু ইব্‌ন বাত্তাল-৪/১৫৯)

৯. লায়লাতুল কদরের আলামত

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল) তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।"
(সূরা কদর : আয়াত-৪-৫)

যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি উবাই ইব্‌নে কাবকে বলতে শুনেছি, তাকে বলা হয়েছিল: আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) বলেন : যে ব্যক্তি সারাবছর রাত জাগ্রত থাকবে, সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে। উবাই বলেন : আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, নিঃসন্দেহে

লাইলাতুল কদর রমযান মাসে। তিনি নির্দিষ্টভাবে কসম করে বলেন : আল্লাহর শপথ আমি জানি তা কোন রাত, এটা সে রাত, যার কিয়ামের নির্দেশ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন, তা হচ্ছে সাতাশের সকালের রাত, তার আলামত হচ্ছে সেদিন সকালের সূর্য উদিত হবে সাদা, তার কোনো আলোক উজ্জ্বল থাকবে না"। (মুসলিম)

ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় রয়েছে: "তার আলামত হচ্ছে সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে সাদা, তার কোনো কিরণ থাকবে না, যেন তার আলো মুছে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম-৭৬২, ইবন হিব্বান-৩৬৯০)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى النِّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ غُدَاةً إِذْ صَافِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

"নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ সাতের মাঝখানে, সেদিন সকালে শুভ্রতা নিয়ে সূর্য উদিত হবে, তার মধ্যে কোনো কিরণ থাকবে না। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সেরূপ অবলোকন করেছি, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।" (আহমদ-১/৪০৬, ইবনে আবি শায়বাহ-২/২৫০)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِى الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَادِ الْحَصَى .

"এটা হচ্ছে সাতাশ অথবা উনত্রিশের রাত, সে রাতে কঙ্করের চেয়ে অধিক সংখ্যায় ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবতরণ করেন।"

(আহমদ-২/৫১৯, তায়ালিসি-২৫৪৫, সহীহ ইবন খুযাইমাহ-২১৯৪)

উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ - أَىْ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ كَانَ فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا، سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ. أَىْ فِيْهَا سُكُوْنٌ - لَا

بَرْدَ فِيْهَا وَلاَ حَرٌّ، وَلاَ يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ اَنْ يُرِىَ بِهِ فِيْهَا حَتّٰى يُصْبِحَ، وَاِنَّ اَمَارَتَهَا اَنَّ الشَّمْسَ صَبِيْحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ ـ

"নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদরের আলামত, তা হবে সাদা ও উজ্জ্বল, যেন তাতে আলোকিত চাঁদ রয়েছে, সে রাত হবে স্থির, তাতে ঠাণ্ডা বা গরম থাকবে না, তাতে সকাল পর্যন্ত কোনো তারকা দ্বারা ঢিল নিক্ষেপ করা হবে না। তার আরো আলামত, সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে সমানভাবে, চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মতো, তার কোনো কিরণ থাকবে না, সেদিন শয়তানের পক্ষে এর সাথে বের হওয়া সম্ভব নয়।" (আহমদ-৫/৩২৪, তাবরানি ফি মুসনাদিশ শামিয়্যিন-১১১৯)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

اِنِّىْ كُنْتُ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ نَسِيْتُهَا وَهِىَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، وَهِىَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ، كَاَنَّ فِيْهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا لاَ يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتّٰى يَخْرُجَ فَجْرُهَا ـ

"আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা আবার ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে শেষ দশকে। সে রাত হবে সাদা উজ্জ্বল, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, যেন আলোকিত চাঁদ নক্ষত্রগুলোকে আড়াল করে রয়েছে, ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে রাতের শয়তান বের হতে পারে না।"

(ইবনে খুযাইমাহ-২১৯০, ইবনে হিব্বান-৩৬৮৮, আলবানি অন্যান্য শাহেদের কারণে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন :

لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءُ ضَعِيْفَةً ـ

"লাইলাতুল কদর সাদা-উজ্জ্বল, না গরম না ঠাণ্ডা, সেদিন ভোরে সূর্য আত্মপ্রকাশ করবে দুর্বল রক্তিম আভা নিয়ে।" (ইবন খুযাইমাহ-২১৯২)

৮টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. আলেম যদি ভালো মনে করেন, তবে জানা ইলম গোপন করা বৈধ, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লাইলাতুল কদর গোপন করেছেন, যেন মানুষেরা অলসতা না করে এবং পুরো দশ রাতের কিয়াম থেকে বিরত না থাকে।

২. আলেমগণ মানুষের জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করবেন, যেমন উবাই ইবনে কাব লাইলাতুল কদর বর্ণনা করেছেন।

৩. মুসলিমদের স্বার্থ নিরূপণে আলেমদের ইজতিহাদ ও ইখতিলাফ জায়েয, এটা নিষিদ্ধ নয়, যদি সঠিক পদ্ধতি ও সত্য অন্বেষণের জন্য হয়।

৪. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, এতে অধিক সম্ভাব্য রাত হচ্ছে বেজোড় রাতগুলো, এতেও অধিক সম্ভাব্য রাত হচ্ছে সাতাশের রাত, যেমন উবাই ইবনে কা'ব কসম করে বলেছেন।

৫. লাইলাতুল কদরের অনেক আলামত বিদ্যমান রয়েছে;

ক. অধিক সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করবে। তাদের শুরুতে থাকেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, তারা মুসল্লিদের সাথে মসজিদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সংখ্যা কঙ্করকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়, তবে এ আলামত মানুষের নিকট প্রকাশ পায় না।

খ. সে রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণ কল্যাণ বর্ষিত হয়, যেহেতু বান্দাগণ তাতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে।

গ. সেদিন সকালে সাদা ও উজ্জ্বলতাসহ সূর্য উদিত হয়, তার কিরণ থাকে না। ওলামায়ে কেরাম এর কারণ সম্পর্কে বলেন : ফেরেশতাগণ আসমানে বিচরণ করতে থাকেন, ফলে তাদের নূর ও পাখা সূর্যের কিরণের আড়াল হয়। (দেখুন : ইকমালুল মুয়াল্লিম-৪/১৪৮, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৬৫, আল-মুফহিমক-২/৩৯১, দিবাজ-৩/২৫৯, ফায়যুল কাদির-৫/৩৯৬ কারণ সে রাতে অসংখ্য ফেরেশতা অবতরণ করেন।

ঘ. এ রাত সাদা-উজ্জ্বল ও স্থির, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, এটা তুলনামূলক বিষয়, বিভিন্ন দেশের ভিত্তিতে ঠাণ্ডা-গরম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর পূর্বাপর রাতের তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম হবে না।

ঙ. শয়তান লাইলাতুল কদরের ভোরে সূর্যের সাথে বের হতে পারে না, লাইলাতুল কদর ব্যতীত সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্য দিয়ে উদিত হয়।

৬. লাইলাতুল কদরের অধিকাংশ আলামত লাইলাতুল কদর শেষে জানা যায়। এর উপকারিতা হচ্ছে : যারা লাইলাতুল কদর পেয়েছে, তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর যারা পায়নি তারা অনুতপ্ত হবে ও আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিবে।

৭. এসব আলামত প্রত্যেক বছর লাইলাতুল কদরে প্রকাশ পায়, নবী করীম ﷺ-এর যুগের জন্য খাস নয়। (আল-মুফহিম-২/৩৯১)

৮. মুসলিমদের উচিত লাইলাতুল কদর তালাশ করা, যেহেতু তাতে অনেক কল্যাণ বিদ্যমান রয়েছে।

১০. তেইশে রমযান লাইলাতুল কদর তালাশ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস জুহানি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَاَرَانِىْ صُبْحَهَا اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ، قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ، فَصَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَاِنَّ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَاَنْفِهٖ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ يَقُوْلُ : ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ۔

আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা আবার ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি দেখেছি আমি সে রাতের সকালে পানি ও মাটিতে সেজদা করছি। তিনি বলেন : তেইশ তারিখের রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করে ঘুরে বসেন, তখন তার কপাল ও নাকের ওপর পানি ও মাটির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস বলতেন : সেটা ছিল রমযানের তেইশ তারিখ। (মুসলিম-১১৬৮, আহমদ-৩/৪৯৫, আবু দাউদ-১৩৭৯)

ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস নবী করীম ﷺ-কে বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমি বহু দূরের লোক, আমাকে একটি রাতের নির্দেশ দেন যেন আমি আসতে পারি। তিনি বললেন :

اَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ۔

"তুমি রমযানের তেইশের রাতে আস।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক-১/৩২০)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি রমযানে ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে নিয়ে আসা হলো, বলা হলো : আজ কদরের রাত। তিনি বলেন : আমি তন্দ্রাসহ দাঁড়িয়ে রাসূলের তাঁবুর রশি ধরে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম, সে রাত ছিল তেইশের রাত।" (আহমদ-১/২৫৫, ইবন আবি শায়বাহ-২/২৫০, তাবরানি ফিল কাবির-১১/২৯২, হাদিস নং-১১৭৭৭)

চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমি তা গামলার অর্ধেক টুকরার ন্যায় দেখলাম। আবু ইসহাক সাবিহি বলেন তেইশের রাতে চাঁদ অনুরূপ হয়।"

(আহমদ-৫/৩৬৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩৪১১, তার সনদ সহীহ। আহমদ এটা হুযায়ফা সূত্রে আলী থেকেও বর্ণনা করেছেন-১/১০১, আহমদ শাকের তা হাসান বলেছেন-৭৯৩)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ : اَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِيْنَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ .

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লাইলাতুল কদরের আলোচনা করলাম, তিনি বললেন : 'তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ করতে পারে সে সময়ের কথা– যখন চাঁদ উদিত হয় গামলার অর্ধেক টুকরার ন্যায়?" (মুসলিম-১১৭০)

৪টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. নবী করীম ﷺ-কে লাইলাতুল কদর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, এর হিকমত হয়তো : মানুষ যেন অলস না হয় ও অন্য রাতে ইবাদত ত্যাগ না করে।

২. সাহাবিগণ ইবাদত ও যিকির করার উদ্দেশ্যে ফযিলতপূর্ণ রাত অন্বেষণ করতেন ও সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

৩. তেইশের রাত ফযিলতপূর্ণ, এ রাত লাইলাতুল কদরের একটি সম্ভাব্যময় রাত, কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ রাতে জাগ্রত থাকা ও অধিক ইবাদত বন্দেগীর মাঝে অতিবাহিত করা।

৪. তেইশের রাতে চাঁদ বড় গামলার [অর্ধেকের] ন্যায় উদিত হয়, এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, উল্লেখিত রাত সে বছর লাইলাতুল কদর ছিল।

১১. লাইলাতুল কদরের ফযিলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।" (সূরা দুখান : ৩-৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ج مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ لا سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"নিশ্চয়ই আমি এটি অবতীর্ণ করেছি 'লাইলাতুল কদরে'। তুমি কি জান 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতীর্ণ হন। শান্তিময় সেই রাত, ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।"

(সূরা আল-কাদর : আয়াত-১-৫)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .

"লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী-৩৫, মুসলিম-৭৬০)

হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত আছে–

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .

উচ্চারণ : মান ক্বামা লাইলাতুল ক্বাদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন জানবিহি।

অর্থ : লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় অবস্থান করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী-১৮০২, মুসলিম-৭৬০)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেছেন :

"লাইলাতুল কদর সাতাশ অথবা উনত্রিশের রাত, সে রাতে পৃথিবীতে ফেরেশতাদের সংখ্যা কঙ্করের চেয়ে অধিক হয়।" (আহমদ-২/৫১৯, তায়ালিসি, তায়ালিসি-২৫৪৫, ইব্‌ন খুযাইমাহ হাদীসটি সহীহ বলেছেন-২১৯৪)

৮টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. লাইলাতুল কদরের ফযিলতের কয়েকটি দিক–
   ক. এ রাত আল্লাহর নিকট খুব মর্যাদাপূর্ণ একটি রাত।
   খ. এ রাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যেখানে লাইলাতুল কদর নেই; যা প্রায় তিরাশি বছর চার মাসের সমপরিমাণ।
   গ. এ রাতে অগণিত ফেরেশতাদের অবতরণ হয়, যাদের সংখ্যা কঙ্করের চেয়ে ও অধিক।
   ঘ. এ রাতে মহা গ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।
   ঙ. এ রাতে অধিক পরিমাণ আযাব থেকে নিরাপত্তা নাযিল হয়, কারণ এতে বান্দাগণ অধিক পরিমাণ ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।
   চ. এ রাত বরকতময়, কারণ এ রাতের ফযিলত অনেক।
   ছ. এ রাতে যে বিশ্বাস, আল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।
   জ. এ রাতে পূর্ণ বছরের তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়।
   ঝ. এ রাতে যে কিয়াম করল ও জাগ্রত থাকল, সে অবশ্যই আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হলো।

২. মুসলিমদের উচিত লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা। এ জন্য শেষ দশকে কিয়াম, সালাত, দো'আ ও যিকরে অধিক মগ্ন থাকা অপরিহার্য। মাহরুম বা বঞ্চিত ব্যতীত কেউ ফযিলতপূর্ণ এ রাতে উদাসীন থাকে না। আল্লাহর নিকট দো'আ করছি, তিনি আমাদেরকে এ ফযিলত অর্জনের তাওফিক দান করুন।

৩. লাইলাতুল কদরের বরকতের অর্থ তাতে সম্পাদিত আমলের বরকত, কারণ এ রাতে যে যত্নসহ আমল করবে, তার আমল হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম। এটা মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ।

৪. এ উম্মতের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে প্রতি বছর এ বরকতময় রাত দান করেন।

৫. লাইলাতুল কদর অন্য সকল রাত থেকে শ্রেষ্ঠ, জুমার রাত লাইলাতুল কদর থেকে উত্তম এ কথা সঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি জুমার রাতে লাইলাতুল কদর হয়, তাহলে তার ফযিলত বৃদ্ধি হয় তাতে সন্দেহ নেই।

৬. নবী ﷺ-এর ক্ষেত্রে ইসরা ও মেরাজের রাত লাইলাতুল কদর থেকে উত্তম। কারণ এ রাতে তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ রাতে তাঁর সাথে তাঁর প্রতিপালক কথা বলেছেন। এটা তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান ও মহান মর্যাদা। তবে অন্যান্য আলেমদের মতে ইসরা ও মেরাজের রাতের তুলনায় লাইলাতুল কদর মহান ও অধিক মর্যাদাশীল।
(মাজমু ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়াহ-২৫/২৮৬)

৭. কতিপয় আলেম উল্লেখ করেছেন লাইলাতুল কদর এ উম্মতের জন্য বৈশিষ্ট্য, কতক দুর্বল হাদীসে এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এর বিপরীত কতক হাদীসে এসেছে আমাদের পূর্বের উম্মত বা তাদের নবীদের মধ্যেও লাইলাতুল কদর ছিল, তবে এসব হাদীস দুর্বল। (আমাদের পূর্বে লাইলাতুল কদর ছিল যেসব হাদীসে এসেছে, তার মধ্যে আবু যর (রা)-এর হাদীস অন্যতম, তাতে এসেছে :

"আমি বললাম : লাইলাতুল কদর কি নবীদের যুগ পর্যন্ত থাকে, অতঃপর তা উঠিয়ে নেয়া হয়, না কিয়ামত পর্যন্ত থাকে? তিনি বললেন : বরং কিয়ামত পর্যন্ত থাকে।" (আহমদ : ৫/১৭, নাসায়ি ফিল কুবরা : ৩৪২৭)

৮. মুসলিমের বর্ণনা এসেছে–

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ.

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর জেনে ঈমান ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে, তার পাপ মোচন করা হবে।" এ হাদীস তাদের দলিল, যারা বলে : লাইলাতুল কদর তার জন্যই হবে, যে জানে যে আজ লাইলাতুল কদর। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক শব্দ তা প্রমাণ করে না; বরং হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে লাইলাতুল কদরে কিয়াম করে লাইলাতুল কদরে কিয়াম করার নিয়তে, আর বাস্তবিক তা লাইলাতুল কদর হয় কিন্তু সে তা নিশ্চিত জানে না সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে।"

১২. শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর একদল সাহাবিকে শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّاهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.

"আমি দেখছি তোমাদের সবার স্বপ্ন শেষ সাতের ব্যাপারে অভিন্ন, কাজেই যে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে চায়, সে যেন তা শেষ সাতে তালাশ করে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে–

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.

"তোমরা শেষ দশে লাইলাতুল কদর তালাশ কর, যদি তোমাদের কেউ দুর্বল হয়, অথবা অপারগ হয়, তবে শেষ সাতে যেন তা অন্বেষণ করা ত্যাগ না করে।"
অপর বর্ণনায় আছে–

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.

"তোমরা লাইলাতুল কদর শেষ সাতে তালাশ কর।"
(বুখারী-১৯১১, মুসলিম-১১৬৫, শেষের দুটি বর্ণনা মুসলিমের)

৭টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. এ উম্মতের সম্মিলিত বর্ণনা, সিদ্ধান্ত ও স্বপ্ন নির্ভুল। কারণ নবী করীম ﷺ এখানে তাদের অভিন্ন স্বপ্নকে গ্রহণ করেছেন।
(ইলামুল মুয়াক্কিয়িন-১/৮৪, আর-রূহ-১৩৬, ফাতহুল কাদির-১২/৩৮০)

২. লাইলাতুল কদর তালাশ করা ও তাতে রাত জাগা জরুরি, কারণ তাতে রয়েছে ফযিলত, বরকত ও কল্যাণ। তবে এটা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত।
(আল-ইস্তেযকার-৩/৪১৬)

৩. এ হাদীস স্বপ্নের গুরুত্ব প্রমাণ করে, সম্ভাব্য ঘটমান বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করা বৈধ, যদি শরীয়তের নির্দেশের বিপরীত না হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী-৪/২৫৭, শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪১১) তবে স্বপ্নের ওপর অধিক নির্ভর করা ঠিক নয়, যা মূল উদ্দেশ্য বিচ্যুত ঘটার কারণ হয়।

৪. স্বপ্ন কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, কখনো হয় মনের ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত, আবার কখনো হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কোনো বিষয়ে যদি মু'মিনদের স্বপ্ন অভিন্ন হয়, তাহলে সেটা সত্য স্বপ্ন, যেমন তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও বর্ণনা সত্য। কারণ একজনের বর্ণনা অথবা সিদ্ধান্তে অসৎ উদ্দেশ্য গোপন থাকতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে সকল মুসলিমগণ ঐক্যমত হতে পারে না। (মিনহাজুস সুন্নাহ নববীয়াহ-৩/৫০০, মাদারেজুস সালেকিন-১/৫১)

৫. এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশের কথার ওপর আমল করা যায়, যদি কুরআন-হাদীস, ইজমা ও স্পষ্ট কিয়াসের বিরোধী না হয়।

(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪১৪)

৬. সাহাবিদের স্বপ্ন এ ক্ষেত্রে অভিন্ন যে, রমযানের শেষ সাতে লাইলাতুল কদর বিদ্যমান রয়েছে, নবী করীম ﷺ সে বছর তাদেরকে শেষ সাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এ রাতগুলো অধিক সম্ভাবনাময়।

নোট : ইবনে বাত্তাল (র) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইবন ওমরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : "লাইলাতুল কদর শেষ সাতে তালাশ কর। এর অর্থ : এটা সে বছরের ঘটনা, যে বছর তাদের স্বপ্ন পরস্পর অভিন্ন ছিল, অর্থাৎ তেইশের রাত। কারণ তিনি আবু সাঈদের হাদীসে বলেছেন : তোমরা লাইলাতুল কদর শেষ দশের বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর, আমি দেখেছি আমি মাটি ও পানিতে সেজদা করছি। (আবু সাঈদ বলেন) আমাদের ওপর একুশের রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। এ হিসেবে দেখা যায়, আবু সাঈদের হাদীসে লাইলাতুল কদর শেষ সাতে ছিল না। ইমাম তাহাভী বলেন : এ ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব থাকে না।

৭. লাইলাতুল কদর কতককে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় দেখানো হয়, সে তার আলামত দেখতে পায়, অথবা স্বপ্নে কাউকে দেখে, যে তাকে বলে : এটা লাইলাতুল কদর। কখনো আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে এমন নিদর্শন প্রকাশ করেন, যার দ্বারা সে লাইলাতুল কদর স্পষ্ট বুঝতে সক্ষম হয়।

(মুজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৮৬)

১৩. বিজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল কদর তালাশ করা

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ

"নবী করীম ﷺ আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সুসংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছেন, অতঃপর দু'জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তিনি বলেন : আমি, তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছি, কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করল, ফলে তা উঠিয়ে নেয়া হয়। খুবসম্ভব এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অন্বেষণ কর।"
(বুখারী-১৯১৯, নাসায়ী ফিল কুবরা-৩৩৯৪, আহমদ-৫/৩১৩)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ اَنْ تُبَانَ لَهٗ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ اُبِيْنَتْ لَهٗ اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، فَاَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَاُعِيْدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ : اِنَّهَا كَانَتْ اُبِيْنَتْ لِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَاِنِّىْ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ - اَىْ يَخْتَصِمَانِ - مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ والسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমযানের মধ্যম দশক ইতিকাফ করেন, যখন তা প্রকাশ করা হয়নি। যখন ইতিকাফ শেষ হয়, তিনি তাঁবু

গুটানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয় নিশ্চয় তা শেষ দশকের, ফলে পুনরায় তিনি তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন। পুনরায় তাঁবু টানানো হয়। অতঃপর তিনি মানুষের নিকট এসে বলেন : হে লোক সকল! আমাকে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছিল, আমি তোমাদেরকে তার সংবাদ দিতে বের হয়েছি, ইত্যবসরে দু'জন ব্যক্তি ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের সাথে ছিল শয়তান, ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা তা রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অন্বেষণ কর। (বুখারী, হাদীস-১৯১২)

৮টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. বিভেদ ও ইখতিলাফ নিষেধ। দু'জন মুসলিমের অন্যায় ঝগড়া কখনো তাদের ও অন্যদের ওপর অনিষ্ট ডেকে আনে। কল্যাণ কেড়ে নেয়া হয়, যেমন এখানে লাইলাতুল কদর একরাত থেকে অপর রাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (ইকমালুল মুয়াল্লিম : ৪/১৪৮) ঝগড়ার কারণে তাদের মাগফেরাত মওকুফ করা হয় এবং তাদের আমল বিবেচনাধীন অবস্থায় রাখা হয়, যতক্ষণ না তারা আপোষ করে। (আল-ইস্তেযকার : ৩/৪১২)

২. এ হাদীস প্রমাণ করে, বিশেষ ব্যক্তিদের অপরাধের কারণে কখনো সাধারণ লোক তার খেসারত দেয়। (ইকমালুল মুয়াল্লিম : ৪/১৪৬)

৩. লাইলাতুল কদর বিদ্যমান, এতে কারো দ্বিমত নেই, তবে তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ-কে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৫৭, ইবন মুলাক্কিন ফি শারহিল উমদাতে বলেন : "নির্ভরযোগ্য সকল আলেম একমত যে, লাইলাতুল কদর সর্বদা বিদ্যমান আছে এবং পৃথিবীর শেষ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। আত-তামহিদ-২/২০০)

৪. লাইলাতুল কদর অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে একটি কল্যাণ হচ্ছে শেষ দশকের ইবাদত। (মিনহাতুল বারি-৪/৪৫৫, শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৫৮)

৫. লাইলাতুল কদরের সম্ভাব্য তারিখ শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো।

৬. লাইলাতুল কদর নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রথমে গোপন ছিল, অতঃপর তাকে জানানো হয়, অতঃপর তা আবার ভুলিয়ে দেয়া হয়।

৭. লাইলাতুল কদর অন্বেষণে নবী করীম ﷺ-এর আগ্রহ, শেষ দশকে জানার পূর্বে তিনি মধ্যম দশকে তা তালাশ করেছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৮. লাইলাতুল কদরের প্রতি গভীর আগ্রহ ও তা অন্বেষণ করা নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ, যা শেষ দশক জাগ্রত থাকা ব্যতীত অর্জিত হয় না, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলো।

১৪. লাইলাতুল কদরের দোয়া

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বলেছি : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমি যদি লাইলাতুল কদর জানতে পারি, আমি তাতে কি বলব? তিনি বললেন : তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন কারীমুন, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্না।

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, মহানদাতা-সম্মানিত, ক্ষমা করা ভালোবাস, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– এ হাদীস হাসান, সহীহ। (তিরমিযী-২৫১৩, ইবনে মাজাহ-৩৮৫০)

ইবনে মাজার শব্দ হচ্ছে : আয়েশা (রা) বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেখেছেন, আমি লাইলাতুল কদর পেলে কি দো'আ করব? তিনি বললেন : তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ

৮টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. লাইলাতুল কদরের ফযিলত এবং উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা)-এর তা অন্বেষণ করা, তাতে কিয়াম ও দো'আ করার অধিক আগ্রহ প্রমাণিত হয়।

২. কল্যাণকর বস্তু জানার জন্য সাহাবিদের প্রশ্ন করার আগ্রহ।

৩. লাইলাতুল কদরের দো'আ ফযিলতপূর্ণ এবং তা কবুলের সম্ভাবনা রাখে।

৪. ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে দো'আ করা মুস্তাহাব। দো'আয় লৌকিকতা ও এমন শব্দ পরিহার করা, যার অর্থ অস্পষ্ট।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনাকৃত এ দো'আ ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও সবচেয়ে উপকারী। এ দো'আতে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, কারণ আল্লাহ যখন দুনিয়াতে কোনো বান্দাকে ক্ষমা করবেন, তিনি তার থেকে শাস্তি দূরীভূত করবেন, তার ওপর নিয়ামতরাজি বর্ষণ করবেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে পরকালে ক্ষমা করবেন, তিনি তাকে আগুন থেকে মুক্তি দেবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৬. এ হাদীসে আল্লাহর 'ভালোবাসা' গুণটি প্রমাণিত হয়, যেভাবে তার জন্য ভালোবাসা গুণটি উপযোগী। আর তিনি ক্ষমা করা ভালোবাসেন।

৭. মানুষদের ক্ষমা করার ফযিলত, কারণ আল্লাহ্ ক্ষমা করা পছন্দ করেন, অনুরূপ যারা মানুষদের ক্ষমা করে তাদের তিনি অধিক পছন্দ করেন।

৮. নবী করীম ﷺ নিজ উম্মতের কল্যাণ কামনা করেন ও তাদেরকে উপকারী বিষয় শিক্ষা দান করেন।

১৫. সাতাশে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা

যির ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন : ""আমি উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাসা করে বলি : তোমার ভাই ইবনে মাসউদ বলেন : যে ব্যক্তি সারা বছর রাতে কিয়াম করবে সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তার ওপর রহম করুন, তার উদ্দেশ্য মানুষ যেন অলস না হয়, অন্যথায় তিনি ভালো করে জানেন যে, লাইলাতুল কদর রমযানে, বিশেষ করে শেষ দশকে, বরং সাতাশে। অতঃপর তিনি শপথ করে বলেন, এতে সন্দেহ নেই লাইলাতুল কদর সাতাশে। আমি বললাম : আপনি তা কিভাবে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! তিনি বললেন : নিদর্শন দেখে অথবা রাসূলের বর্ণনাকৃত আলামত দেখে :

أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا .

"সেদিন সূর্য উদিত হবে যে, তার কিরণ থাকবে না।"

(মুসলিম-৭৬২, আবু দাউদ-১৩৭৮, তিরমিযী-৩৩৫১, আহমদ-৫৪/১৩০)

ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় আছে :

أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ غَدَاةً إِذْ كَأَنَّهَا طَسْتٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ .

"সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে, যেন তা গামলা, যার কোনো আলো নেই।"

(আহমদ-৫/১৩০, ইবন হিব্বান এ হাদীস সহীহ বলেছেন, হাদীস নং-৩৬৯০)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন : "আল্লাহর শপথ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিশ্চিত জানে যে, লাইলাতুল কদর রমযানে এবং তা সাতাশে, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে চাননি, যেন তোমরা অলস বসে না থাক।" (তিরমিযী-৭৯৩, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন।)

মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ .

"লাইলাতুল কদর হচ্ছে সাতাশের রাত।"

(আবু দাউদ-১৩৮৬, ইবন হিব্বান-৩৬৮০, আলবানি তা সহীহ বলেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে : হে আল্লাহর নবী! আমি অতি বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোক, আমার দ্বারা দাঁড়িয়ে থাকা খুব কঠিন, কাজেই আমাকে এমন এক রাতের কথা বলুন, যেন সে রাতে আল্লাহ আমাকে লাইলাতুল কদর দান করেন, তিনি বললেন : তোমার উচিত সাতাশ আঁকড়ে ধরা।" (আহমদ-১/২৪০, বায়হাকী-৪/৩১২, তাবরানি ফিল কাবির-১১/৩১১, হাদীস নং-১১৮৩৬, হায়সামি ফি মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-৩/১৭৬)

৭টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. আমাদের পূর্বসূরিগণ কল্যাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তারা ইবাদতে নিমগ্ন থাকার জন্য ফযিলতপূর্ণ সময় অনুসন্ধান করতেন।

২. কারণবশত কোনো বিষয় না বলা আলেমের জন্য বৈধ, যেমন মানুষের অলসতা ও নেক আমলে ত্রুটির সম্ভাবনা ইত্যাদি।

৩. নিশ্চিত জ্ঞান বা প্রবল ধারণার ওপর কসম করা বৈধ।

৪. কিরণহীন সাদা-উজ্জ্বলতা নিয়ে সকালে সূর্যের উদয় হওয়া, লাইলাতুল কদরের আলামত।

৫. মুসলিমদের উচিত ফযিলতপূর্ণ মৌসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, যেমন লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমযানের শেষ দশক, যেন অল্প আমলে তার অধিক কল্যাণ লাভ হয়।

৬. আলেমদের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে; লাইলাতুল কদর পরিবর্তনশীল, তবে সাতাশের রাত অধিক সম্ভাবনাময়, যেমন উবাই ইবনে কা'ব শপথ করে বলেছেন।

৭. নবী করীম ﷺ বৃদ্ধ লোককে লাইলাতুল কদর সাতাশে বলা অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী নয়, যেখানে অন্য রাতে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে, কারণ নবী ﷺ তাকে সে বছরের কথা বলেছেন, যে বছর সে জিজ্ঞাসা করেছে। লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সব হাদীসের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য এ ব্যাখ্যার বিকল্প ব্যাখ্যা নেই।

১৬. সর্বশেষ রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা

উতাইবাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতা আব্দুর রহমান আমাকে বলেছেন : "আবু বকরের নিকট লাইলাতুল কদর উল্লেখ করা হলো, তিনি বললেন: আমি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছি, তা কখনো আমি শেষ দশদিন ব্যতীত অন্বেষণ করি না। আমি তাকে বলতে শুনেছি: লাইলাতুল কদর তোমরা রমযানের অবশিষ্ট নয় দিনে অন্বেষণ কর, অথবা সর্বশেষ রাতে অন্বেষণ কর।" তিনি বলেন : আবু বাকরাহ রমযানের বিশ দিন সারা বছরের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে সালাত আদায় করতেন, যখন শেষ দশক পদার্পণ করত, যখন তিনি অধিক পরিমাণ ইবাদত করতেন।" (তিরমিযী, হাদীস-৭৯৪)

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা লাইলাতুল কদর সর্বশেষ রাতে অন্বেষণ কর।" ইবনে খুজাইমাহ এ সম্পর্কে একটি অধ্যায় রচনা করেন : "রমযানের শেষ রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার নির্দেশ প্রসঙ্গে অধ্যায়, যদিও বছরের যে কোনো সময় সে রাত হতে পারে।" (আলবানির সহীহ হাদীস সংকলন-১৪৭১)

৪টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, এর মধ্যে অধিক সম্ভাব্য হচ্ছে বেজোড় রাত, তবে অবশিষ্ট রাতের বিবেচনায় জোড় রাতে হতে পারে– যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়। এ জন্য মুসলমানদের উচিত শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা।

২. সাহাবিদের লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা ও তাতে রাত জাগার আগ্রহ।

৩. কখনো রমযানের সর্বশেষ রাতে লাইলাতুল কদর হতে পারে, যেমন বিভিন্ন হাদীস তার স্থানান্তর হওয়া প্রমাণ করে।

৪. উনত্রিশে রমযান অথবা ইমামের কুরআন খতমের পর সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও রাত জাগরণে অলসতা না করা, কারণ মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর, যা সর্বশেষ রাতে হতে পারে।

১৭. যাকাতুল ফিতর

রমযান মাসে ফিতরাহ

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ ـ

"গোলাম-স্বাধীন, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকল মুসলমানের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক 'সা' তামার (খেজুর), অথবা এক 'সা' গম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন এবং সালাতের পূর্বে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"

(বুখারী-১৪৩২, মুসলিম-৯৮৪)

বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাফে (রা) বলেছেন : "ইবনে ওমর ছোট-বড় সবার পক্ষ থেকে তা আদায় করতেন, তিনি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও আদায় করতেন। যারা তা গ্রহণ করত, ইবনে ওমর তাদেরকে তা প্রদান করতেন, তিনি ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা দু'দিন পূর্বে তা আদায় করতেন।"

(বুখারী-১৪৪০)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমরা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক 'সা' খানা, অথবা এক 'সা' গম, অথবা এক 'সা' খেজুর, অথবা এক 'সা' পনির, অথবা এক 'সা' কিশমিশ দ্বারা।" (বুখারী, হাদীস-১৪৩৫)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "রোযাদারকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। সালাতের পূর্বে যে আদায় করল, তা গ্রহণযোগ্য যাকাত, যে তা সালাতের পর আদায় করল, তা সাধারণ সদকা।"

(আবু দাউদ-১৬০৯, ইবনে মাজাহ-১৮২৭)

কায়েস ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।, যখন যাকাত ফরয হলো, তিনি আমাদের নির্দেশ দেননি, নিষেধও করেননি, তবে আমরা তা আদায় করতাম।" (নাসায়ী-৫/৪৯, ইবনে মাজাহ-১৮২৮, আহমদ-৬/৬)

১৩টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. যাকাতুল ফিতর সকল মুসলমানের ওপর ফরয, যা ফরয হয়েছে যাকাতের পূর্বে। যাকাত ফরযের পর পূর্বের নির্দেশের কারণে তা এখনো ফরয।

২. প্রত্যেক মুসলমানের নিজ ও নিজের অধীনস্থদের পক্ষ থেকে, যেমন স্ত্রী-সন্তান ও যাদের ভরণ-পোষণ তার ওপর ন্যস্ত, যাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

৩. স্ত্রী-সন্তান যদি কর্মজীবী অথবা সম্পদশালী হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের নিজের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম, কারণ তারা প্রত্যেকে যাকাতুল ফিতর প্রদানে আদিষ্ট। হ্যাঁ, যদি তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে, তাহলে জায়েয, যদিও তারা সম্পদশালী।

৪. যাকাতুল ফিতরের মূল্য দেয়া যথেষ্ট নয়, এটা জমহুর আলেমের অভিমত। কারণ নবী করীম ﷺ এরূপ নির্দেশ দেননি, তিনি এরূপ করেননি, তাঁর কোনো সাহাবি এরূপ করেনি, অথচ প্রতিবছর যাকাতুল ফিতর আসত। অধিকন্তু ফকিরকে খাদ্য দিলে সে নিজে ও তার পরিবার তার দ্বারা উপকৃত হয়, অর্থ প্রদানের বিপরীত, কারণ সে অর্থ জমা করে পরিবারকে বঞ্চিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত মূল্য আদায়ের ফলে শরিয়তের এ বিধান তেমন আড়ম্বরতা পায় না।

৫. যাকাতুল ফিতর আদায়ের প্রথম সময় আটাশে রমযান, সাহাবায়ে কেরাম ঈদের একদিন কিংবা দু'দিন পূর্বে তা আদায় করতেন; সর্বশেষ সময় ঈদের সালাত, যেমন হাদীসে এসেছে।

৬. হকদার ফকির-মিসকিনদের এ যাকাত দিতে হবে, কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন : "মিসকিনদের খাদ্যস্বরূপ।" প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের দেয়া ভুল যদি তারা অভাবী না হয়, যেমন কতক লোক কুরবানী ও আকিকার গোশতের ন্যায় যাকাতুল ফিতর পরস্পর আদান-প্রদান করে, এটা সুন্নাতের বিপরীত। কারণ এটা যাকাত, হকদারকে দেয়া ওয়াজিব, কুরবানী ও আকিকার গোশতের অনুরূপ নয়, যা হাদীয়া হিসেবে দেয়া বৈধ। আরেকটি ভুল যে, কতিপয় মুসলিম প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিবারকে যাকাতুল ফিতর আদায় করে, অথচ বর্তমান সে সচ্ছল হতে পারে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় যাকাত দিতে থাকে, এটা ঠিক নয়।

৭. নিজ দেশের অভাবীদের যাকাতুল ফিতর দেয়া উত্তম, তবে অন্য দেশে দেয়া জায়েয, বিশেষ করে যদি সেখানে অভাবের সংখ্যা বেশি থাকে, তাদের চেয়ে বেশি অভাবী নিজ দেশের কারো সম্পর্কে জানা না থাকে, অথবা তার দেশের অভাবীদের দেয়ার অন্য লোক থাকে।

৮. **যাকাতুল ফিতরের কতক বিধান ও উপকারিতা**

ক. বান্দার ওপর আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা হয়, যেমন তিনি পূর্ণ মাস সিয়ামের তওফিক ও রমযান শেষে পানাহারের অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

"আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৫)

খ. এটা শরীরের যাকাত, যা আল্লাহ্ তায়ালা পূর্ণ বছর সুস্থ রেখেছেন।

গ. যাকাতুল ফিতর বান্দার রোযাকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে, যেমন হাদীসে এসেছে, যাকাতুল ফিতর রোযাদারকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে।

ঘ. যাকাতুল ফিতর দ্বারা ফকির-মিসকিনদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদেরকে ভিক্ষা থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যেন ঈদের দিন তারাও অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় আনন্দ ও বিনোদন করতে পারে।

ঙ. যাকাতুল ফিতর দ্বারা রোযাদারকে অনুগ্রহ ও অনুদানের প্রতি উৎসাহী প্রদান করা হয় এবং তাকে লোভ ও কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়।

৯. এক মিসকিনকে এক পরিবার বা একাধিক ব্যক্তির সদকাতুল ফিতর দেয়া বৈধ, যেমন বৈধ একজনের সদকাতুল ফিতর কয়েকজনকে ভাগ করে দেয়া।

১০. শেষ রমযানের সূর্যাস্তের ফলে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না, কারণ সে ওয়াজিব হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করেছে। অনুরূপ কেউ যদি সূর্যাস্তের পর জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব।

১১. কর্মচারী ও ভাড়াটে মজুরদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে চুক্তির মধ্যে তাদের সাথে অনুরূপ শর্ত থাকলে আদায় করতে হবে। হ্যাঁ, অনুগ্রহ ও দয়া হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে মালিকের আদায় করা বৈধ।

১২. যদি সদকাতুল ফিতর আদায় করতে ভুলে যায়, ঈদের পর ছাড়া স্মরণ না হয়, তাহলে সে যখন সদকা আদায় করবে, এতে সমস্যা নেই, কারণ ভুলের জন্য সে অপারগ।

১৩. যদি কাউকে সদকাতুল ফিতর ফকিরের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে ঈদের আগে তার নিকট তা পৌছে দেয়া জরুরি। তবে যদি কোনো ফকির কাউকে সদকাতুল ফিতর তার জন্য সংরক্ষণ করে রাখার দায়িত্ব দেয়, তাহলে ঈদের পর পর্যন্ত তার নিকট তা সংরক্ষণ করা বৈধ।

১০. শাওয়াল

শাওয়ালের প্রথম তারিখ হলো পবিত্র ঈদের দিন। ঈদের দিন হচ্ছে পুরস্কার প্রদানের অন্যতম দিন। তবে ঈদের রাতটি ফযিলতপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল। এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস আছে বলে জানা নেই।

১. শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযিলত

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ۔

উচ্চারণ : মান স্বামা রমাদান ছুম্মা আতবামাহু সিত্তান মিন শাও ওয়ালিন কানা কা সিয়ামিদ দাহরি।

"যে রমযানের রোযা পালন করল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো, তা সম্পূর্ণ বছর রোযার ন্যায়।" (মুসলিম-১১৬৪)

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذٰلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ۔

"রমযানের রোযা দশ মাসের সমতুল্য, ছয়দিনের সিয়াম দুই মাসের সমতুল্য, এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।" অপর এক বর্ণনায় রয়েছে –

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔

"যে ঈদুল ফিতরের পর ছয়দিন রোযা পালন করবে, তা পূর্ণ বছরে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুণ।" (সূরা আন-আম-১৬০, আহমদ-৫/২৮০, ইবনে মাজাহ-১৭১৫)

১১টি শিক্ষা ও মাসায়েল

১. শাওয়ালের ছয় রোযার ফযিলত প্রমাণিত হয়। প্রতি বছর রমযানের রোযার সাথে যে শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করল, সে সারা বছর রোযা রাখল।

২. বান্দার ওপর আল্লাহর অশেষ রহমত, তিনি বান্দার অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক সাওয়াব ও বিরাট প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

৩. ঈদের পর দ্রুত শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করা, যেন এ রোযা ছুটে না যায়, অথবা কোনো ব্যস্ততা এসে না পড়ে।

৪. শাওয়ালের শুরু, শেষ বা মাঝে, এক সঙ্গে বা পৃথকভাবে এ রোযা রাখা– বৈধ। বান্দা যেভাবে তা সম্পাদন করুক, সে আল্লাহর নিকট এর পূর্ণ সাওয়াব অর্জন করবে, যদি আল্লাহ্ তা কবুল করেন।
(ইবন কুদামার মুগনি-৪/৪৪০, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৫৬)

৫. যে ব্যক্তির ওপর রমযানের কাযা রয়েছে, সে প্রথমে কাযা আদায় করে নিবে, অতঃপর শাওয়ালের ছয় রোযা আদায় করবে। হাদীসের বাণী থেকে এমনটিই প্রমাণিত হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে রমযানের রোযা রাখল" অর্থাৎ পূর্ণ রমযান। যার ওপর কাযা রয়েছে, সে পূর্ণ রমযান রোযা রাখেনি। তার ওপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা হয় না, যতক্ষণ না সে কাযা করে। (শারহুল মুমতি-৬/৪৬৬) দ্বিতীয়ত নফল ইবাদতের চেয়ে ওয়াজিব কাযা আদায় করা উত্তম।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা ফরযের আগে নফলের বিধান রেখেছেন, যেমন নফলের বিধান রেখেছেন ফরযের পর। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বাপর সুন্নাত রয়েছে, অনুরূপ রমযানের সিয়ামের পূর্বাপর রোযা রয়েছে। অর্থাৎ শাবান ও শাওয়ালের রোযা।

৭. এসব নফল ইবাদত ফরযের মধ্যে ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ দূর করে। কারণ এমন রোযাদার নেই যে অযথা বাক্যালাপ, কুদৃষ্টি ও হারাম খাবার ইত্যাদি দ্বারা তার রোযার সমাপ্তি করেনি।

২. শাওয়াল সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের ১ তারিখের রাতে অথবা ঈদের সালাতের পর নাকি ৪ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি জান্নাতের ৮টি দরজা খোলা এবং জাহান্নামের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে নিজের স্থান দেখা যায়।

এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত সালাতের কথা বলা হয়। যার দলীল কুরআন হাদীসের কোথাও নেই।

এ মাসের মৃত্যুবরণ করলে শহীদের দরজা লাভ হয়, তার আমল-সালাত সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর নফল রোযাসমূহের সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয় এবং সে ব্যক্তি প্রথম খলিফা আবু বকরের সাথে জান্নাতে এক সাথে অবস্থান করবে- ইত্যাদি কথা কোন হাদীসে আছে এবং তার মান কি? এ সব বিশ্বাস করার আগে অবশ্যই তার বিশুদ্ধতা যাচাই করতে হবে।

১১. যুল'কা'দ

এটি হিজরী সনের একাদশ মাস। এ মাসের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ কোনো ইবাদাতের কথা হাদীস পাওয়া যায় না। তবে যারা হজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন তারা এ মাসে হজের জন্য প্রস্তুত গ্রহণ করবেন।

১. যুল-ক্বা'দ সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এ মাসের ১ তারিখের রাতে নাকি ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি জান্নাতের ৪,০০০ লাল ইয়াকুতের ঘর তৈরি হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে!! প্রত্যেক সিংহাসনে হুর বসা থাকবে; তাদের কপাল সূর্যের অধিক উজ্জ্বল হবে!!!

এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত সালাত পড়লে নাকি ১ জন শহীদ ও ১ হজের সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকআত সালাত পড়লে ১টি হজ ও ১টি উমরার সাওয়াব পাওয়া যাবে!!

এ মাসের প্রথম সোমবার রোযা রাখলে আমলনামায় নাকি এক হাজার বছরের অধিক নফল রোযা রাখলে সে দিনটির প্রতিটি ঘণ্টার পরিবর্তে এক একটি কবুল হজের সাওয়াব আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়!

এগুলো মনগড়া যার ভিত্তি কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই।

১২. যুলহজ্জ

আরবি দিনপঞ্জির হিসেব মতে যুলহজ্জ মাস হলো সর্বশেষ মাস।

১. যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনের ফযিলত

মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ রয়েছে, তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য প্রতি বছর বিশেষ ইবাদতের একটি মৌসুম নির্ধারণ করেছেন। যে মৌসুমে বান্দারা অধিক পরিমাণে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করার পথ খুঁজে পায়, তাঁর নৈকট্য দানকারী কর্মে আপোসে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং তাঁর বিশাল পরিমাণ সাওয়াব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

তাঁর অনেক অনুগ্রহের মধ্যে এটিও একটি মহা অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণের আয়ু দিয়ে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখেন; যাতে আমরা পরকালের চিরসুখ লাভের জন্য অধিক পরিমাণে নেক আমল করতে সক্ষম হই।

যদিও উম্মতে মুহাম্মদীর আয়ুষ্কাল পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অনেক কম। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছর।"

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১০৭৩)

তবুও মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এ উম্মতকে এমন আমল ও মৌসুম দান করেছেন যার ফলে তাদের বয়স বৃদ্ধি ও বরকত লাভ করে। অল্প সময়ে সে আমল করলে এত সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, যা বহু বছর ধরে করলে তা লাভ করা সম্ভব হতো।

এ ধরনের একটি ফযিলতপূর্ণ মৌসুম হলো যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশটি দিন। যে দিনগুলো হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। মহানবী ﷺ বলেন, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট দিন হলো (যিলহজ্ব) দশ দিন। (বাযযার, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ১১৪৪ নং)

বলা বাহুল্য যে, ব্যাপকার্থে উক্ত দিনগুলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন; এগুলোর প্রতিটি মিনিট, ঘণ্টা, রাত ও দিন আল্লাহর নিকট বছরের অন্যান্য সমস্ত দিনের চাইতে অধিক প্রিয়।

আল্লাহ তায়ালা এ দিনগুলো শপথ করেছেন। আর কোনো জিনিসের নামে শপথ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ -

অর্থাৎ, শপথ ঊষার, শপথ দশ রজনীর ......। (সূরা ফাজর : আয়াত-১-২)

এই দিনগুলোর মধ্যে রয়েছে আরাফার দিন। যেদিন সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফার দিন ব্যতীত এমন কোন দিন নেই, যাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে অধিক হারে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি (ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশতাগণের নিকট গর্ব করেন। বলেন, কি চায় ওরা? (মুসলিম ১৩৪৮ নং)

এ দিনগুলোর শেষে রয়েছে কুরবানীর দিন এবং তার পরে মিনায় অবস্থান করার দিন। যে দুটি দিন সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) দিন হলো কুরবানীর দিন। অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন (যিলহজের ১১ তারিখ)। (আবু দাউদ, মিশকাত ২/৮১০)

এ দিনগুলোতে কৃত নেক আমলের মাহাত্ম রয়েছে অনেক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : "এ দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোনো আমল নেই। আল্লাহর পথে জিহাদেও নয়। তবে এমন কোনো ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মালসহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।"
(বুখারী, আবু দাউদ)

অথচ এ কথা সার্জন বিদিত যে, আল্লাহর পথে জিহাদ হলো ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ।" সে বলল, 'তারপর কি?' তিনি বললেন, "গৃহীত হজ্জ।" (বুখারী ১৬ নং)

তবুও উপযুক্ত হাদীসসমূহে এ কথাই প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল বছরের অন্যান্য দিনের আমলের পেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক প্রিয়।

অতএব কি বিশাল এ মাহাত্ম! কি সুন্দর এ নেকীর মৌসুম! কি সুবর্ণা এ সাওয়াব অর্জনের সুযোগ!!

অন্যান্য দিনের জিহাদও উক্ত দিনগুলোর কোনো আমলের চেয়ে উত্তম নয়; অথচ জিহাদ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও যথাসময়ে সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল!

প্রতিযোগী ইবাদতকারীর জন্য কি সুন্দরই না এই মহান মৌসুম! আর অবহেলাকারী উদাসীনের জন্য প্রবঞ্চনা বৈ আর কি?

অতএব মন থেকে আলস্য অবজ্ঞা দূর করুন এবং আখেরাতের কাজে মনোযোগ দান করুন। মহানবী ﷺ বলেন, 'আখেরাতের কাজ ব্যতীত প্রত্যেক কাজে ধীরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।" (আবু দাউদ ৪৮১০, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০০৯)

আখেরাতের কাজে প্রতিযোতিা করতে উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ـ

অর্থাৎ আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগিরা প্রতিযোগিতা করুক।

(সূরা মুত্বাফফিফীন : আয়াত-২৬)

তিনি আরো বলেন–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ, তোমরা কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতা কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৪৮)

এ জন্যেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে জুবাইর যিলহজের প্রথম দশক উপস্থিত হলেই (ইবাদতে) এমন পরিশ্রম করতেন যে, তিনি অক্ষম হয়ে পড়তেন। (দারেমী) তাঁর নিকট থেকে এ কথাও বর্ণনা করা হয় যে, এ দশকের রাতে তোমরা তোমাদের বাতি নিভিয়ে দিও না।'

২. যুলহজ্জের প্রথম দশ দিন সর্বশ্রেষ্ঠ কেন?

হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন, এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যিলহজের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলোতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন, সালাত রোযা, সদ্কাহ এবং হজ। যা অন্যান্য দিনগুলোতে এভাবে একত্রিত হয় না।" (ফতহুল বারী ২/৪৬০)

ইবনে কুদামাহ (র) বলেন, যিলহজের প্রথম দশ দিনের সবটাই মাহাত্ম্য ও মর্যাদাপূর্ণ। এ দিনগুলোতে আমলের বহুগুণ সওয়াব পাওয়া যায় এবং তাতে ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালানো মুস্তাহাব। (মুগনী ৪/৪৪৩)

পরিশেষে জেনে রাখুন যে, এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক আমলের প্রতি আগ্রহী হওয়া প্রকৃতপক্ষে কল্যাণের প্রতি ধাবমান ও প্রতিযোগিতা এবং হৃদয়ের 'তাক্বওয়া, পরহেযগারী ও সংযমশীলতার দলীলই বটে। মহান আল্লাহ বলেন–

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) নিদর্শনাবলীদের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই এক বহিঃপ্রকাশ।

(সূরা হজ্জ : আয়াত-৩২)

তিনি আরো বলেন–

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট কুরবানীর পশুর গোশত এবং রক্ত পৌঁছে না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৩৭)

বলা বাহুল্য, মুবারকবাদ তার জন্য, যে নেক আমল ও কল্যাণময় বর্ষ দ্বারা এই দশ দিনের সদ্ব্যবহার করে।

অতএব আমাদের উচিত, এই দিনগুলোতে নেক আমল ও উত্তম কথা দ্বারা আবাদ করতে, আমরা যেন সর্বত্তোমভাবে সচেষ্ট হই। আর যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করে, আল্লাহ তাকে সে কাজে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন এবং তার জন্য সে সকল উপায়-উপকরণ সহজ করে দেন যার ফলে সে তার কাজ উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়, আল্লাহ তার জন্য নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। আল্লাহর পথে সাধনা করলে তিনি তাঁর পথ সহজ করে দেন।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْنَ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

অর্থাৎ, যারা আমার (আল্লাহর) রাস্তায় জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। (সূরা আনকাবূত : আয়াত-৬৯)

শ্রেষ্ঠ কোনটি : যুলহজ্জের প্রথম দশক, নাকি রমযানের শেষ দশক?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) বলেন, 'যিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলো রমযানের শেষ দশকের দিনগুলো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর রমযানের শেষ দশকের রাতগুলো যিলহজ্জের প্রথম দশকের রাতগুলো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

(মাজমূউ ফাতাওয়া ২৫/২৮৭)

ইবনুল কাইয়্যুম (র) এই উক্তির টীকায় বলেন, এ উত্তর নিয়ে যদি কোন যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে তা সন্তোষজনক ও যথেষ্টরূপে পাবে। যেহেতু এই দশ দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিন নেই যার মধ্যে কৃত নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে আরাফার দিন, কুরবানী ও তালবিয়া (৮ই যিলহজ্জের) দিন। পক্ষান্তরে রমযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলো হলো জাগরণের রাত্রি; যে রাত্রিগুলোতে রাসূল ﷺ জাগরণ

করে ইবাদত করতেন। আর তাতে রয়েছে এমন একটি রাত্রি, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত বিশদ বিবরণ ছাড়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে, সে সঠিক দলীল উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না।" (যাদুল মাআদ ১/৫৭)

অবশ্যই একটি কথা এখানে জানা একান্ত জরুরি যে, একটি ভালো জিনিসকে অন্য একটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার মানে এই নয় যে, দ্বিতীয়টির গুরুত্ব কম। বরং এই শ্রেষ্ঠত্বের মানে হলো, চেষ্টা ও সামর্থ্য অনুসারে উক্ত ভালো কাজে বেশি বেশি উদ্বুদ্ধ করা।

৩. এই দশ দিনের কর্তব্য

১. রোযা

রোযা সমষ্টিগতভাবে এক প্রকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল। বলা বাহুল্য এ মাসের প্রথম নয় দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। কেননা মহানবী ﷺ এ দিনগুলোতে নেক আমল করতে উৎসাহিত করেছেন। আর রোযা হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। তাছাড়া মহানবী ﷺ এ দিনগুলোতে রোযা রাখতেন। তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যিলহজ্বের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন; মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।"
(সহীহ আবু দাউদ ২১২৯ নং, নাসাঈ)

অবশ্য যদি কেউ পূর্ণ নয় দিন রোযা রাখতে অপারগ হয়, তাহলে সে একদিন ছেড়ে পরদিন রোযা রাখতে পারে অথবা এর মধ্যে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে পারে।

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ দিনগুলোতে রোযা রাখতেন। রোযা রাখতেন মুজাহিদ প্রমুখ উলামাগণ। আর অধিকাংশ উলামাগণের মতে এ রোযা শরীয়তসম্মত। (ইবনে আবী শাইবাহ ৯২২ নং, লাত্বাইফুল মাআরিফ ৪৬১পৃ:)

মোটকথা, এ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা মুস্তাহাব। ইমাম নববী (রহ) বলেন, ঐ দিনগুলোতে রোযা রাখা মুস্তাহাব। (শারহুন নাওয়াবী ৮/৩২০)

২. যিকির

এই দিনগুলোতে যিকির করা অন্যান্য দিনের তুলনায় উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন-

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ

অর্থাৎ, যাতে ওরা নির্দিষ্ট জানা দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে...।
(সূরা হজ : আয়াত-২৮)

অধিকাংশ উলামার মতে উক্ত আয়াতে নির্দিষ্ট জানা দিনগুলো বলতে উদ্দেশ্য হলো যিলহজের প্রথম দশ দিন। বলা বাহুল্য, এ দশ দিনে আল্লাহর দ্বীনের একটি প্রতীক হলো অধিক পরিমাণে তাঁর যিকির-আযকার করা; 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও 'সুবহানাল্লাহ' পড়া এবং অত্যান্ত আবেগসহকারে 'আল্লাহু আকবার' পড়া।

সুতরাং এই মহান দিনগুলোতে বেশি বেশি করে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা উচিত। পাঠ করা উচিত বরকতময় দিনগুলোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ে, সকালে-বিকালে, রাত্রে-ভোরে, মসজিদে-বাড়িতে, পথে-গাড়িতে, কর্মস্থলে এবং আল্লাহর যিকির বৈধ এমন সকল জায়গাতে।

পক্ষান্তরে এই দিনগুলোতে তাকবীর পাঠ হবে দুই ধরনের–

১. সময়-সীমাহীন অনির্দিষ্টভাবে তাকবীর পাঠ। যা এ দশকের প্রথম দিনের মাগরিব থেকে তাশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ তারিখের) শেষ দিনের মাগরিব পর্যন্ত হাজী এবং অন্যান্য সকলের জন্য যে কোন সময়ে সর্বদা পাঠ করা বিধেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা) এই দশ দিন বাজারে বের হতেন এবং (উচ্চস্বরে) তাকবীর পড়তেন। আর লোকেরাও তাঁদের তাকবীরের সাথে তাকবীর পাঠ করত। (বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৫৩১)

২. সময়-সীমাবদ্ধ তাকবীর। আর তা হলো প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীর পাঠ করা। এ তাকবীর আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত পাঠ করা বিধেয়। এ তাকবীরের এত গুরুত্ব রয়েছে যে, কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলেছেন, তা পড়তে ভুলে গেলে কাযা করতে হবে। অর্থাৎ সালাতের পর তা বলতে ভুলে গেলে মনে পড়া মাত্র তা পড়ে নিতে হবে; যদিও তার ওযু নষ্ট হয়ে যায় কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। অবশ্য সময় লম্বা হয়ে গেলে সে কথা ভিন্ন।

ইমাম ইবনে বায (র) বলেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, সময়-সীমাহীন তাকবীর ও সময়-সীমাবদ্ধ তাকবীর উভয়ই একত্রে সমবেত হয় আরাফা, কুরবানী ও তাশরীকের তিন দিনে। পক্ষান্তরে ৮ তারিখ ও তার পূর্বেই ১ তারিখ পর্যন্ত সকল দিনগুলোতে কেবল সময়-সীমাহীন অনির্দিষ্ট তাকবীরই বিধিবদ্ধ।

(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১৩/১৮)

তাকবীরের ধরন : শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) বলেন, অধিকাংশ সাহাবা কর্তৃক যা উদ্বৃত এবং যা নবী করীম ﷺ থেকেও বর্ণিত করা হয় তার ধরন নিম্নরূপ –

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, আল্লাহ আকবার, অলিল্লাহিল হাম্‌দ।' 'আল্লাহু আকবার' ৩বার বলাও বৈধ।

কিন্তু অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় হলো, তাকবীর এ যুগে প্রত্যাখ্যাত সুন্নাতের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দশ দিনে তো অল্প কিছু মানুষ ব্যতীত আর কারো নিকট হতে তাকবীর শুনাই যায় না। তাই উচ্চস্বরে তাকবীর পড়া উচিত; যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং উদাসীনদের মনে সতর্কতা ফিরে আসে।

৩. হজ্জ ও উমরাহ্ পালন

এ দশকের সবচেয়ে বড় নেক আমল হলো হজ ও উমরা পালন করা। যে এখনো হজ করেননি, তার জন্য কা'বাগৃহের হজ ফরয। এমন ব্যক্তির জন্য হজ পালনে তাড়াতাড়ি করা উচিত এবং বিনা ওযরে দেরী করলে সে গোনাহগারে পরিণত হবে।

মহানবী ﷺ বলেন : "তোমরা হজ পালনে তাড়াতাড়ি কর। যেহেতু তোমাদের কেউ জানে না যে, তার সম্মুখে কোন অসুবিধা এসে হাজির হবে।

(আহমদ ১/৩১৪, উরওয়া ৪/১৬৮)

পক্ষান্তরে যে তার ফরয হজ আদায় করে নিয়েছে এবং এখন সে নফল স্বরূপ তা করতে চায়, তাহলে তা হলো এমন এক উত্তম আমল, যা আল্লাহ নৈকট্য দান করেন।

হজ ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম। মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর; এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রোযা পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ পালন করা।" (বুখারী ৮, মুসলিম ১৬ নং)

এ রুকন সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার মাত্র হজ্জ ফরয হয়।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৯৭)

কোনো মুসলিমের ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না; যতক্ষণ না সে উক্ত পাঁচটি রুকন পালন করেছে। সঠিক মতে, হজ্জ হিজরী সনের নবম সালে ফরয হয়। আর মহানবী ﷺ দশম বছরে বিদায়ী হজ্জ পালন করেন। যেহেতু এরপরই মহান আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং হিজরী সনের ১১তম বছরে তিনি সুমহান বন্ধুর সাথে মিলিত হয়েছেন।

হজ্জের ফযিলত যে সকল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে ইবনে উমরের হাদীস অন্যতম। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে, তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি করে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি করে পাপ মার্জনা করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশতাগণের নিকট গর্ব করেন। বলেন, আমার ঐ বান্দাগণ এলোমেলো কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে আমার দরবারে হাজির হয়ে আমার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কি করত? অতএব তোমার যদি বলির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত করে দিবেন।

পাথর মারার সাওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে। মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি করে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তাওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সে দিনের মতো বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।

(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০)

উক্ত হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসে রয়েছে তাড়াতাড়ি হজ্জ পালন করার প্রতি আহ্বান। এতে রয়েছে পাপ থেকে হৃদয়ের পবিত্রতা। বান্দা জানে না যে, এ পৃথিবী ছেড়ে তার বিদায়ের পালা কবে? আর হজ্জ হলো হাতে গোনা কয়েকটি দিন। যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিল না সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "এবং গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচরণ করে না, সে ব্যক্তি সে দিনকার মতো নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।

(বুখারী ১৫২১ নং, মুসলিম ১৩৫০ নং)

নফল হজ করতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। জাবের ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি সমস্ত নেক আমল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম যে, সালাত দেহ ক্ষয় করে; মাল ক্ষয় করে না। রোযাও অনুরূপ। আর হজ দেহ ও মাল উভয় ক্ষয় করে। সুতরাং হজই হলো এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

(হিল্য়্যাহ ৩/৮৭)

৪. সালাতের প্রতি যত্ন

এটিও একটি সুবৃহৎ ইবাদত। সবচেয়ে বড় ও বেশি ফযিলতপূর্ণ আমল। সর্বদা এই ইবাদতের প্রতি যত্নবান থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। কিন্তু বিশেষ করে এই দিনগুলোতে অধিক যত্নবান হতে নিম্নের নির্দেশমালা গ্রহণ করুন।

ক. যথাসময়ে পরিপূর্ণরূপে তার রুকূ ও সিজদা, সুন্নাত ও ওয়াজিব আদায় করুন।

খ. জামাআতের প্রথম কাতারের জায়গা অধিকার করার জন্য আযান শোনামাত্র মসজিদে উপস্থিত হন।

গ. ফরযের আগে-পরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যথানিয়মে আদায় করুন। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকআত (সুন্নাত) সালাত পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে।

(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৩৬২ নং)

অনুরূপভাবে আসরের আগে ৪ এবং মাগরিবের আগে ২ রাকআত পড়তেও আগ্রহী হন।

ঘ. নফল সালাত বেশি বেশি আদায় করুন। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তুমি আমার জন্য অধিক পরিমাণ সিজদা করাকে অভ্যাস পরিণত কর; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুণ একটি গুনাহ মোচন করবেন।

(মুসলিম ৪৮৮ নং তিরমিযী, নাসাঈ)

ঙ. ফরয সালাত পড়ার পর তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হবেন না; বরং বসে তেলাওয়াত ও যিকর করতে থাকুন।

চ. তাহাজ্জুদের সালাত পরিপূর্ণরূপে যথানিয়মে আদায় করুন। আর উত্তম হলো মহানবী ﷺ-এর অনুকরণ করে ১১ রাকআত আদায় করা। তিনি এ সালাত নিয়মিত পড়তেন এবং কোনো রাতে তা ছুটে গেলে দিনে চাশতের সময় কাযা করে নিতেন।

ছ. ফজরের সালাতের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে যিকির করুন। অতঃপর দুই রাকআত সালাত আদায় করুন। এতে আপনি পরিপূর্ণ একটি হজ্জ ও উমরার সাওয়াব লাভ করবেন। (সহীহ তিরমিযী ৪৬১)

জ. চাশতের সালাত কমপক্ষে ২ রাকআত পড়ুন।

ঝ. ফরয সালাতের পর পঠনীয় সব রকমের যিকির পাঠ করুন।

ঞ. এক সালাতের পর আগামী সালাতের অপেক্ষা করুন।

৫. কুরআন তেলাওয়াত

আল্লাহর নৈকট্যদাতা বহু আমলের একটি আমল হলো কুরআন তেলাওয়াত। কতই না উত্তম হয়, যদি আপনি এই দশ দিনের ভিতরে মসজিদে ও ঘরে বসে একবার কুরআন খতম করতে পারেন এবং কিছু হিফয করতে পারেন।

৬. আল্লাহর রাস্তায় দান করা

নেকীর দরজাসমূহের মধ্যে দান-সদকা করা একটি বড় পূণ্যের কাজ। মহান আল্লাহ দানশীলদেরকে বৃহৎ প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ـ

অর্থাৎ কে সে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করবে? আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৪)

আর মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ; যদিও এক টুকরো খেজুর দান করার বিনিময়ে হোক।" (বুখারী ১৪৭, মুসলিম ১০১৬)

এই দশ দিনে অনেক লোকেই টাকা-পয়সার মুখাপেক্ষী থাকে; কারো হজের জন্য প্রস্তুতি নিতে, কারো কুরবানী ও ঈদের বাজার ইত্যাদি করতে টাকার দরকার হয়ে থাকে। আর দান-খয়রাতের ফলে মানুষের কল্যাণ অর্জিত হয়, সাওয়াব পায় দ্বিগুণ-বহুগুণ, গুপ্তভাবে দানকারীকে মহান আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন কোন ছায়া থাকবে না। দানকারীর জন্য মঙ্গলের দরজা খুলে যায়, বন্ধ হয়ে যায় অমঙ্গলের সকল দরজা। তার জন্য জন্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মানুষও তাকে ভালোবাসে। দানশীল দয়াবান মহানুভব হৃদয়ের অধিকারী হয়। তার আত্মা ও মাল পবিত্র হয়। অর্থের দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায়। আল্লাহ তাকে তার জান-মাল, পরিবার-সন্তানের ব্যাপারে ইহ-পরকালে নিরাপত্তা দান করেন।

ফর্মা-০৮; ইসলামী দিবস

আমাদের প্রত্যেকেই এ দিনগুলোতে কিছু না কিছু সদকা করতেই পারে। অংশগ্রহণ করতে পারে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মে। আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত, যাতে এই মঙ্গলময় দিনসমূহ কোনো মঙ্গল হাতছাড়া না হয়।

উপরোক্ত নেক আমল ব্যতীতও উল্লেখযোগ্য আরো অনেক আমল রয়েছে যা এই দিনগুলোতে বিশেষ করে পালন করা কর্তব্য। যেমন, পিতামাতার সেবা করা, আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, সালাম প্রচার করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা, অসুস্থ রোগীকে দেখা করে সান্ত্বনা দান করা, মহানবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা, ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে ঈদের সালাত পড়া ইত্যাদি।

পরিশেষে বলি যে, নেক আমলের কোনো সীমাবদ্ধ সংখ্যা নেই। সুতরাং এই বরকতময় দিনগুলোতে যথাসাধ্য ও সুবিধামত বেশি বেশি নানা ধরনের নেক আমল করুন। এরপর এই দিনগুলোর সাথে পরবর্তী দিনগুলোকে সংযুক্ত করুন। যেহেতু মুসলিমের সারা জীবনটাই নেক আমলের বিশাল প্লাটফ্রম। তবুও কিছু দিনকে বিশেষ ও বেশি মর্যাদা দিয়ে বিশিষ্ট করে তোলা হয়েছে, যাতে সে বেশী বেশি আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কাজেই কোমর বেঁধে নেক আমল করে আল্লাহকে দেখান। আল্লাহ আপনাকে নিরাশ করবেন না।

৪. পবিত্র আরাফার দিন

আরাফার দিন হলো একটি মহান দিন। এই দিনটি মুসলমানদের গর্বের ধন। যেহেতু এদিনকার ও এখানকার মতো অন্য কোনো দিনে ও স্থানে এত বিশাল সংখ্য মুসলিমরা একত্রিত হয় না। এ হলো মুসলমানদের বিশালতম বিশ্ব-সম্মেলন। সারা বিশ্বের ধনী মুসলিমরা এ দিনে এখানে একত্রিত হয়। একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে পরিচিতি লাভ করে।

আরাফার দিন মহান প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয় ও কান্না করার দিন; বিশ্ব-জাহানের অধিপতির ভয়ে ভীত হওয়ার দিন। এ দিনে দুআ কবুল হয়ে থাকে। বান্দার গুনাহ-খাতা মাফ করা হয়। এই ময়দানের উপস্থিত হাজীদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাবগণের নিকট গর্ব করে থাকেন।

এ হলো সেই দিন; যে দিনকে আল্লাহ মর্যাদায় মণ্ডিত করেছেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছেন। এ দিনে তিনি নিজের মনোনীত দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ও অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করেছেন। এ দিন ক্ষমার দিন। এ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন।

কত মহান সে দিন! তার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যেমন আমাদের জানা উচিত যে, আমরা এ দিন দ্বারা কিভাবে উপকৃত হতে পারব।

১. আরাফার দিনের ফযিলত

ক. আরাফার দিন আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ হওয়ার দিন : উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনাদের কিতাবের এক আয়াত যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, ঐ আয়াত যদি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হতো, তাহলে (যে দিনে অবতীর্ণ হয়েছে) ঐ দিনটাকে আমরা ঈদ বলে গণ্য করতাম।' তিনি বললেন, কোন আয়াত? বলল, "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।" উমর (রা) বললেন, ঐ দিনটিকে আমরা জেনেছি এবং সেই স্থানটিকেও চিনেছি; যে স্থানে ঐ আয়াত নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি জুমার দিন আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান ছিলেন। (বুখারী ৪৫, মুসলিম ৩০১)

প্রশ্নকারী ছিল কা'ব আল-আহবার। যেমন তাফসীরে ত্বাবারী (৯/৫২৬)-তে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াত জুমআর দিন এবং আরাফার দিন নাযিল হয়েছে এবং ঐ দুটি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ।

খ. আরাফার দিন হলো মুসলিমদের (হাজী) ঈদ : মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফাহ, কুরবানী ও তাশরীকের দিনসমূহ আহলে ইসলাম, আমাদের ঈদ। আর তা হলো পানাহার-ভোজনের দিন।

(আবু দাউদ ২৪১৯, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪)

আর উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি উক্ত জবাবে বলেছিলেন, ঐ আয়াত জুমআন দিন এবং আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ দুটি দিনই আমাদের জন্য ঈদ, আলহামদু লিল্লাহ।

গ. আল্লাহ এ দিনে কসম খেয়েছেন : মহান সত্তা মহা কিছুরই কসম খান। 'মাশহূদ' সেই দিনকে বলা হয়, যেদিন লোকেরা (কোনো এক স্থানে) উপস্থিত ও জমায়েত হয়। অনেক তাফসীরকারদের মতে তা হলো আরাফার দিন। এই দিনের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ কুরআনে (সূরা বুরূজের ৩নং আয়াতে) তার কসম খেয়েছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (সূরা বুরূজে উল্লেখিত) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ হলো কিয়ামতের দিন, 'অল-ইয়াওমিল মাশহূদ' হলো আরাফার দিন এবং আশ্-শাহিদ' হলো জুমআন দিন।" (তিরমিযী-৩৩৩৯)

এই দিনকে বিজোড় দিন বলে উল্লেখ করে তার কসম খেয়েছেন (সূরা ফাজরের ৩ নং আয়াতে) ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, وَالشَّفْعِ হলো কুরবানীর দিন এবং وَالْوِتْرِ হলো আরাফার দিন। আর এই মত ইকরামা ও যাহ্হাকেরও।

ঘ. **এ হলো সে দিন, যে দিনে মহান স্রষ্টা আদম-সন্তানের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন :** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আরাফায় আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন; তিনি আদমের পৃষ্ঠ থেকে প্রত্যেক সৃষ্ট বংশধরকে বের করে তাঁর সামনে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে দিলেন।
অতঃপর তিনি তাদের সাথে সামনা-সামনি কথা বললেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِيْنَ، اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের প্রভু নই, তারা বলল অবশ্যই, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ স্বীকৃতি গ্রহণ) এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না। অথবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে অংশীদারস্থাপন করেছে আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?
(সূরা আরাফ : ১৭২-১৭৩ আয়াত, আহমদ ১/২৭২, হাকেম ২/৫৯৩, মিশকাত ১২১ নং)

সুতরাং কি মহান এই দিন! আর কি মহান সেই অঙ্গীকার!

ঙ. এই দিন হলো পাপরাশি মাফ হওয়ার দিন। দোযখ থেকে মুক্তি লাভের দিন।

চ. এ দিনে মহান প্রতিপালক আরাফায় অবস্থানরত হাজীদেরকে নিয়ে ফিরেশতাদের নিকট গর্ব করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "আরাফার দিন ব্যতীত এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে অধিক অধিক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে থাকেন। তিনি

(ঐ দিনে) নিকটবর্তী হন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশতাগণের নিকট গর্ব করেন। বলেন, কি চায় ওরা? (মুসলিম ১৩৪৮)

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আরাফার দিন বিকালে আরাফাবাসীদের নিয়ে আসমানবাসী ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করেন। তিনি তাদেরকে বলেন, আমার বান্দাদেরকে দেখ, আমার দরবারে ধূলিমলিন এলোমেলো রুক্ষ কেশে হাজির হয়েছে। (মুসনাদ আহমদ ২/৩০৫, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা ৪/২৬৩)

মুনাবী (র) বলেন, এই গর্ব এই কথার দাবি করে যে, ব্যাপকভাবে আরাফাবাসীর সকল প্রকার পাপ ক্ষমা করা হয়। যেহেতু আল্লাহ্ সেই হাজীকে নিয়েই গর্ব করেন, যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে পবিত্র হতে পেরেছে। পূত-পবিত্র ফিরিশতাদের কাছে পাপহীন পবিত্র মানুষ ব্যতীত কোন পাপীকে নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারেন না। (ফাইযুল ক্বাদীর ২/৩৫৪)

২. আরাফার দিনে কিছু কিছু সলফে সালেহীনদের অবস্থা

কোনো কোনো সলফের হৃদয় এ দিন ভয় ও লজ্জা ছেয়ে থাকত। তাদের একজন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কারণে, আরাফাবাসীদেরকে (তোমার ক্ষমা থেকে) বঞ্চিত করো না।'

আর দ্বিতীয়জন বললেন, কি মাহাত্ম্যপূর্ণ অবস্থানক্ষেত্রে এবং কত বড় আশার পাত্র সেই মা'বুদ; যদি আমি তাদের মধ্যে না থাকতাম।' পক্ষান্তরে তাঁদের কারো কারো মন আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আশায় আশান্বিত হয়ে থাকত।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (র) বলেন, আরাফার বিকালে আমি সুফিয়ান সাওরীর নিকট আসলাম। তখন তিনি হাঁটুর উপর ভয় করে বসা ছিলেন এবং তাঁর চোখ দুটি থেকে পানি ঝরছিল। তিনি আমার দিকে তাকালে আমি তাঁকে বললাম, এই সমবেত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কার? উত্তরে তিনি বললেন, যে ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না।

৩. আমরা এ দিন দ্বারা কিভাবে উপকৃত হব?

প্রথমঃ এই দিনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। যেহেতু কোন জিনিসের কদর না জানলে আমরা তার যথার্থ সম্মান করতে পারব না। একজনের প্রকৃত মান জানার পরই তাকে আমরা যথার্থ সম্মান প্রদান করে। তেমনি আরাফার দিনও। আর এ দিন সম্বন্ধে যে ফযিলত, মাহাত্ম্য ও সলফদের অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

এ দিন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য নিম্নের নির্দেশমালার অনুসরণ করুন।

৪. আরাফায় অবস্থানের জন্য করণীয়

ক. এই দিনকে কাজে লাগাবার জন্য পূর্ণরূপে মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি নিন। এই দিনের ফযিলত ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হোন।

খ. এই মহান দিনে আপনি বেশি বেশি তাসবীহ, তাহলীল ও ইস্তিগফার করুন। ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা আরাফার সকালে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। আমাদের কেউ তাকবীর পড়ছিল এবং কেউ তাহলীল পড়ছিল.....। (মুসলিম ১২৮৪)

গ. তাকবীর পাঠ করুন। এই দিনের ফজরের সালাতের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত তাকবীর পড়া কর্তব্য।

গৃহবাসী হলে অথবা হজ করতে না এলে–

ক. এই দিনটির সকল সময়ে ইবাদতে মগ্ন থাকুন। অন্যান্য রাতের মতো এ রাতে সালাত আদায় করুন এবং দিনে নানা প্রকার ইবাদতে লিপ্ত থাকুন। সাংসারিক কর্ম-ব্যস্ততা অন্য দিনের জন্য পিছিয়ে দিন।

খ. এ দিনে রোযা রাখুন। যেহেতু মহানবী ﷺ এ দিনের প্রতি অধিক যত্নবান হতে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি এ দিনে রোযা রাখার বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ দিনের রোযা গত ও আগামী বছরের গুনাহ মার্জনা করে দেয়। (মুসলিম-১১৬)

অবশ্য এ রোযা হাজীদের জন্য সুন্নাত। কোন হজ পালনরত হাজীর জন্য এ রোযা সুন্নাত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর দিনে হজ করা অবস্থায় রোযা রাখেননি এবং আরাফায় থেকে আরাফার রোযা রাখতে তিনি নিষেধও করেছেন।

কাজেই হজ করতে না গেলে আরাফায় রোযা রাখার ব্যাপারে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করবেন না। যেহেতু এ রোযা হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার পূর্বের-পরের দু বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং আপনার মর্যাদা উন্নীত করবেন।

গ. এই দিনে বেশি বেশি দুআ করুন। এই দিনের শ্রেষ্ঠ দুআ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। (তিরমিযী ২৫৮৫)

ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন, উক্ত হাদীস হতে এ কথা বুঝা যায় যে, আরাফার দিনের এই দুআ অন্যান্য দুআ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যেমন আরাফার দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। আর এতে এ কথার দলীল বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো কোনো দিন অপর অন্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। তবে এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা শরীয়তের বিবরণ দানের উপর নির্ভরশীল। আমরা সহীহ্ সূত্রে যে সকল দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য জানতে পেরেছি তা হলো, জুমআর দিন, আশুরার দিন ও আরাফার দিন। অনুরূপভাবে সোম ও বৃহস্পতিবার সম্বন্ধেও বিবরণ এসেছে। বলা বাহুল্য, এ কথা কিয়াস (অনুমিতি) দ্বারা জানার কোনো উপায় নেই এবং এতে চিন্তা-গবেষণারও কোনো হাত নেই।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরাফার দিনের দুআ কবুল হয়ে থাকে। আর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ যিকির হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ....।

আরাফার দিনের দুআর বিশেষ আদব এই যে, হাজীগণ কেবলা মুখি হয়ে দুই হাত তুলে কাকুতি-মিনতি সহকারে, নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে এবং সত্য তওবার সাথে দুআ করবে।

পক্ষান্তরে হাজীগণ অন্যান্য মুসলিম জাতিও এ মহান দিনে দুআ করতে যত্নবান হবে। মনের ভিতরে এ দিনের গুরুত্বের কথা জাগরিত রেখে, দুআ কবুল হবে এই দৃঢ় আশা রেখে নিজের জন্য নিজের পিতা-মাতা ও পরিবার-সন্তানের জন্য এবং ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দুআ করবে। আর এ দিন রোযা অবস্থায় দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা তো আরো বেশি। কারণ রোযাদারের রোযা বিফল হয় না।

হ্যাঁ, আপনার দুআতে যেন সেই মুজাহিদদেরকে ভুলে যাবেন না, যাঁরা জিহাদের ময়দানের শত্রুদের মুকাবিলা করছে এবং যাঁরা দুশমনের নির্যাতনে নির্যাতিত।

দুআ করুন; তবে দুআতে সীমালংঘন করবেন না। দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। দুআ করুন নাছোড় বান্দা হয়ে। সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ; যে দুআর দিনে দুআ করতে তওফীক লাভ করে।

১. কুরবানী শব্দের ব্যাখ্যা

'কুরবানী' শব্দটি আরবি কুরবান শব্দ্ থেকে গঠিত। আর কুরবান শব্দটি কুরবাতুন শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবি কুরবাতুন এবং কুরবান উভয় শব্দের শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কারো নিকট্য অর্জন করা প্রভৃতি। ইসলামী পরিভাষায় কুরবান ঐ বস্তুর নাম যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। (মুফরাদাতে ইমাম রাগিব ৩য় খণ্ড, ২৮৭, তাফসীরে কাশশাফ ১ম খণ্ড, ৩৩৩) বর্তমানে আমাদের নিকটে কুরবানীর জানোয়ারকেই বিশেষভাবে কুরবান বলা হয়। (তাফসীরে আলমানার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

পরিশেষে ঐ যবেহকৃত জন্তুকেই কুরবান বলা হয়, যা লোকেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উপস্থাপন করতে থাকে। (তাফসীরে মাযহারী ২য় খণ্ড, ১৮৮)

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ উপমহাদেশে কুরবানী বলতে বোঝায় যিলহজ্ব মাসের ১০ম থেকে ১২ বা ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উট, গরু, বকরী ও ভেড়া প্রভৃতির মধ্য হতে কোন এক জন্তুকে নহর বা যবেহ করা।

আমার জানা মতে আরবিতে কুরবানী শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তাই কুরআনে কুরবানীর বদলে 'কুরবান' শব্দটি মোট তিন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : ১. সূরা : আলে ইমরান, আয়াত ৩. ১৮৩; ২. সূরা : আল-মায়িদাহ, আয়াত ৫. ২৭ এবং ৩ সূরা : আল-আহকাফ, আয়াত ৪৬ : ২৮।

হাদীসটি 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে তার পরিবর্তে উদহিয়্যাহ এবং যাহিয়্যাহ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য কুরবানীর ঈদকে ঈদুল আযহা বলা হয়। ফারসি, হিন্দি ও উর্দূতে আরবি কুরবান শব্দটি কুরবানী অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলার মুসলিমগণও কুরবানী শব্দটির সাথে খুবই পরিচিত। তাই আমি এ বইয়ে কুরবানী শব্দটি ব্যবহার করেছি যাতে পাঠকগণ সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে।

২. ঈদের তাৎপর্য ও করণীয়

ঈদের সংজ্ঞা

'ঈদ' আরবি শব্দ। এমন দিনকে ঈদ বলা হয় যে, দিনটি বার বার ফিরে আসে। এটা আরবি শব্দ عَادَ يَعُوْدُ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অনেকে বলেন, এটা আরবি শব্দ اَلْعَادَةُ 'আদত' বা অভ্যাস থেকে উৎপন্ন, কেননা মানুষ ঈদ উদযাপনে অভ্যস্ত। সে যাহোক, যেহেতু এ দিনটি বার বার ফিরে আসে তাই এর নাম 'ঈদ'।

এ শব্দ দ্বারা এ দিবসের নাম রাখার তাৎপর্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দিবসে তার বান্দাদেরকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা বার বার ধন্য করেন ও তাঁর ইহসানের দৃষ্টি বার বার দান করেন। যেমন– রমযানে পানাহার নিষিদ্ধ করার পর আবার পানাহারের আদেশ প্রদান করেন। সদকায়ে ফিতর, হজ্জ-জিয়ারত, কুরবানীর গোশত ইত্যাদি নিয়ামত তিনি বার বার ফিরিয়ে দেন। আর এ সকল নিয়ামত ফিরে পেয়ে ভোগ করার জন্য অভ্যাসগতভাবেই মানুষ আনন্দ-ফূর্তি করে থাকে।

৩. ইসলামে ঈদের প্রচলন

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন' মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত হিসেবে ঈদ দান করেছেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، قَالَ : مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনাবাসীদের দু'টি দিবস ছিল– যে দিবসে তারা খেলাখুলা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন এ দু'দিনের কি তাৎপর্য রয়েছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা মূর্খতার যুগে এ দু'দিনে খেলাধূলা করতাম। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দু'দিনের পরিবর্তে

তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দিয়েছেন তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (আবু দাউদ, হাদীস-১১৩৪, হাদীসটি সহীহ)

শুধু খেলা-ধুলা, আমোদ-ফূর্তির জন্য যে দুটি দিন ছিল আল্লাহ্ তায়ালা তা পরিবর্তন করে এমন দুটি দিন দান করলেন যে দিনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া, যিকির, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে শালীন আমোদ-ফূর্তি, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া করা হবে।

৪. ঈদের তাৎপর্য

ইতোপূর্বে আলোচিত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে ঈদের ফযিলত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে। তা হলো আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন উম্মতে মোহাম্মদীয়কে সম্মানিত করে তাদের এ দুটি ঈদ দান করেছেন। আর এ দুটি দিন বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইসলামের এ দুটি উৎসবের দিন শুধু আনন্দ-ফূর্তির দিন নয়; বরং এ দিন দুটিকে আনন্দ-উৎসব'-এর সাথে সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা রঙিন করা হবে। যিনি জীবন দান করেছেন, সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন দান করেছেন। যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে থাকা হবে আর সব কিছু সঠিক মতো চলবে এটা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটাকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিনের ইবাদত-বন্দেগি, তাঁর প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা সু-সজ্জিত করেছে।

৫. ঈদুযযুহা নয়; বরং ঈদুল আয্‌হা

এ উপমহাদেশে কুরবানীর ঈদকে সচরাচর 'ঈদুযযুহা' বলা হয় এবং বই ও পত্রিকা প্রভৃতিতে তাই লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঈদুযযুহা কথাটা অত্যাধিক ভুল। কারণ, আরবি 'যুহা' ضُحًى শব্দের অর্থ প্রথম প্রহর। কাজেই ঈদুয যুহার অর্থ হয় প্রথম প্রহরের ঈদ। কিন্তু হাদীস অনুযায়ী কুরবানীর ঈদ প্রথম প্রহরে নয়, বরং তার চেয়েও এক-দেড় ঘণ্টা আগে পড়া সুন্নাত। অতএব ঈদুল ফিতরকে যদি ঈদুযযুহা বলা হতো তাহলে কোনোরূপে তা বলা চলত। কিন্তু কুরবানীর ঈদকে কোনোমতেই ঈদুযযুহা বলা যায় না। আরবি আদহা-তুন শব্দের বহুবচন আদহা। যার বাংলা অর্থ কুরবানী। এ ঈদে গরু, উট, বকরী, ভেড়া প্রভৃতি জানোয়ার কুরবানী করা হয়। আমাদের দেশে কুরবানীতে বেশির ভাগ গরু কুরবানী করা হয়। সেজন্য অনেকে এ ঈদকে বকরা ঈদ বা গরুর ঈদ বলে অভিহিত করে।

দোহা এবং আদহা সম্বন্ধে যাদের মোটেই জ্ঞান নেই অথবা থাকলেও প্রকৃত জ্ঞানের ব্যাপারে যারা উদাসীন কেবল তারাই কুরবানীর ঈদকে ঈদুজ্জোহা বলে গতানুগতিক গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে ভুল উচ্চারণ করে থাকে। শুধু তাই নয়; বরং এ ভুলটা তাদের অস্থিমজ্জায় এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, ঐ ভুলটাকেই তারা সঠিক বলে মনে করে। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন প্রকৃত জ্ঞানহীনদের প্রকৃত বিষয় জানার এবং ভুল বিষয় ত্যাগ করার সুমতি দিন- আমীন!

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর বিধান

পৃথিবীর ইতিহাসে কুরবানী কবে থেকে চালু হয়েছে তা জানতে গেলে মহাগ্রন্থ কুরআন ঘোষণা করে-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ـ

"আর আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তোমাদের প্রভু এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সু-খবর দাও ঐসব বিনীতদেরকে।"

(সূরা আল-হজ্জ : আয়াত-৩৪)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেন, [আদম (আ) থেকে মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পর্যন্ত] প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।

(তাফসীরে নাসাফী ৩য় খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) ও কাশশাফ ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

৭. পৃথিবীর সর্বপ্রথম কুরবানী

পবিত্র কুরআনের ৬ষ্ঠ পারায় সূরা : আল-মায়িদাহ-এর ৮ম রুকুতে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ)-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর বর্ণনা রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম কুরবানী। তাফসীরের বর্ণনায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো। মুফাসসিরে কুরআন ইবনে আব্বাস বলেন, হাওয়া (আ)-এর গর্ভে জোড়া জোড়া সন্তান জন্ম হতো। কেবল শীস (আ) ব্যতীত। কারণ তিনি একা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সে সময় আদম (আ) একটি জোড়ার

মেয়ের সাথে অন্য জোড়ার ছেলের বিয়ে দিতেন। কারণ তখন যে জোড়ার সাথে যে মেয়ে জন্মাতো সে জোড়ার ছেলের সাথে ঐ জোড়ার মেয়ের বিয়ে হালাল ছিল না।

অতঃপর হাওয়া (আ) কাবীলের সাথে একটি সুন্দরী মেয়েকে জন্ম দেন যার নাম ইকলীমা এবং হাবীলের সাথে এমন একটি মেয়ে জন্ম দেন যে ইকলামীর মতো ছিল না। ঐ মেয়েটির নাম লিয়ূয়া। অতঃপর আদম (আ) যখন উক্ত দুই জোড়ার বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন কাবীল বলে, আমি আমার জুড়ি বোনের হকদার বেশি। তথাপি আদম (আ) তাকে তাঁর নির্দেশ মানতে বললেন। কিন্তু সে মানলো না। এবার তিনি তাকে বকাঝকা করলেন। তবুও সে ঐ বকাঝকায় কর্ণপাত করল না। অতঃপর তাঁরা সবাই কুরবানী দেবার ব্যাপারে একমত হলেন।

তাঁদের কুরবানীর পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা আবূ আলী আল-ফারসী বলেন, কাবীল ছিলেন একজন চাষী। তাই তিনি গমের শীষ থেকে ভালো ভালো মালগুলো বের করে নিয়ে বাজে মালগুলোর একটি আঁটি কুরবানীর জন্য পেশ করেন। আর হাবীল ছিলেন পশু পালনকারী। তাই তিনি তাঁর জন্তুর মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা একটি দুম্বা কুরবানীর জন্য পেশ করেন। অতঃপর হাবীলের জন্তুটি আসমানে তুলে নেয়া হয়। যা সেখানে চরতে থাকে। পরিশেষে ঐ দুম্বাটি দিয়ে ইসমাঈল যবীহ (আ))-কে বাঁচিয়ে নেয়া হয়। পূর্ববর্তী আলিমদের একটি দল এ অভিমত পেশ করেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, আসমান থেকে আগুন অবতীর্ণ হয় এবং হাবীলের কুরবানীটি জ্বালিয়ে দেয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ফতহুল বায়ান ৩য় খণ্ড, ৪৫)

আদম (আ)-এর যুগে তাঁরই পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। সূরা আল-হজ্ব ৩৪ নং আয়াতের বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। তবে ঐসব কুরবানীর কোনো বর্ণনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাই ঐসব কুরবানীর বিবরণ এখানে আলোচনা করা গেল না। বর্তমানে আমাদের উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যে কুরবানী প্রথা চালু আছে তার সম্পর্ক ইবরাহীম (আ)-এর নিজপুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তার বর্ণনা নিম্নে বিবৃত হলো।

৮. বর্তমান কুরবানীর ইতিহাস

এখন অর্থাৎ– যিলহজ্ব ১৪০১ হিজরী থেকে ৫২৮১ বছর আগে (এ হিসাবটা ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের হিসাব অনুসারে লেখা হয়েছে। তাঁর ঈদায়ন পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠা দেখুন) কলকাতা থেকে পশ্চিমে আনুমানিক আড়াই হাজার মাইল দূরে জনবিরল মক্কা নগরীর এক নির্জন প্রান্তরে আল্লাহর দুই

আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) বলিদানের যে মহান আদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন সে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি নিয়ে প্রতি বছর আমাদের সামনে হাজির হয় ঈদুল আযহা বা পবিত্র কুরবানীর ঈদ।

এ কুরবানী সম্পর্কে একদা মহানবী ﷺ-কে তাঁর কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىُّ "ইয়া রাসূলুল্লাহ। মা-হা-যিহিল আদা-হী।" অর্থ : "হে আল্লাহর রাসূল! এ কুরবানী কি জিনিস?" তিনি বললেন : سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "সুন্নাতু আবীকুম ইবরাহীম (আ)।" অর্থ : "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ।"

এবার তাঁরা বললেন, এতে আমাদের উপকার কি? তিনি বললেন : কুরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে তোমরা একটি করে নেকী লাভ করবে।
(মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৮, বায়হাকী ৯ম খণ্ড, ২৬১, ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

বিশ্বনবীর উল্লেখিত হাদীসটিকে যারা বিশ্বাস করেন এবং যারা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা গবেষণা করেন, তাদের মাথায় একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে এমন কি গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল যার ফলে মহান আল্লাহ তাঁর এ আদর্শকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রাখলেন? উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ঐ আদর্শকে আনন্দ ও খুশির উৎসে পরিণত করলেন? কারণ, মানবতার ইতিহাসে মানুষকে সৎপথ দেখানোর জন্যে হাজার হাজার নবী আগমন করেছেন। কিন্তু কারো আদর্শই এ সম্মান ও মর্যাদা পায়নি।

দুনিয়ার বড় বড় রাজা মহারাজা, বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব, জলে ও স্থলে শাসন পরিচালনাকারী মহান জাতিসমূহকে আমরা প্রাচীন নিদর্শনসমূহের ভগ্নাবশেষে, পচাসড়া করবসমূহের মধ্যে, জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পুরাতন পাতাগুলোতে দেখতে পারি। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের সমস্ত জনসমাগমের মধ্যে এমন একটিও ব্যক্তিত্ব খুঁজেও পাওয়া যাবে না যার জীবনাদর্শ বইয়ের পাতায় ও মাটির স্তূপে নয়, বরং কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় ও তাদের বাস্তব কাজে স্বীয় প্রাণবন্ততার প্রমাণ দিতে পারে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য আপনি কল্পনার রকেটে চড়ে মক্কায় চলে যান দেখবেন লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শে আদর্শবান হবার জন্য বিশ্ববাসীকে বিপ্লব সৃষ্টিকারী আহ্বান জানাচ্ছে। তাই সবারই জানতে কৌতূহল হয় যে, ইবরাহীম কে এবং তাঁর আদর্শ কি? তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

পারস্য উপসাগর হতে আনুমানিক ১০০ মাইল দূরে বহু বিপ্লবের সাক্ষী দুটি ঐতিহাসিক নদী দজলা ও ফুরাত। এ দুই নদীর তীরবর্তী নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের একটি দেশ, যার প্রাক্তন নাম ব্যাবিলন এবং বর্তমান নাম ইরাক। ঐ ব্যাবিলনের একটি জনপদের নামা ছিল উর। সেখানে জন্মগ্রহণ করেন ইবরাহীম (আ)। যারা দুনিয়ার খবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পৃথিবীর প্রাক্তন সপ্তম আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে একটি আশ্চর্য বস্তু ছিল ব্যাবিলনের 'শূন্য উদ্যান'। এ শূন্য উদ্যানের যারা আবিষ্কারক তারা ছিলেন সে যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও শিক্ষিত জাতি কালদানি জাতি বা চ্যালডিস জাতি। ঐ জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হলেও তারা সবাই চাঁদ, সূর্য, তারকা ও প্রতিমার পূজারী মুশরিক ছিল। উক্ত মুশরিকদেরই এক পুরোহিত ছিলেন আযর। এ মুশরিক আযরের ঘরে জন্মেছিলেন একত্ববাদী ইবরাহীম (আ)।

বহুত্ববাদিতা ও নাস্তিকতার জঘন্য পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে যখন ইবরাহীমের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হলো তখন তিনি দেখতে পেলেন কোথাও সে যুগের সভ্যজাতি সূর্যকে দেবতা হিসেবে সেজদা করছে। কোথাও তারা চাঁদকে পূজা দিচ্ছে। কোথাও তারকাকে ইস্ট ও অনিষ্ট দেবতা মনে করছে। আবার কোথাও নিজহাতে গড়া প্রতিমার সামনে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ অসহায়ের মতো মাথা ঠুঁকছে। এ অভিনব দৃশ্যাবলী দেখে তিনি তাদেরকে নানারকম যুক্তি-তর্ক ও কলা--কৌশল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকেই আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলেন। মহান মহিমাময়ের কল্পনাতীত মহিমায় তিনি উদ্ধার পেলেন।

অতঃপর তিনি যখন উপলব্ধি করলেন যে, তার জন্মদাতা পিতা ও তার আত্মীয় স্বজনসহ সমস্ত দেশবাসী তার একত্ববাদের বাণী গ্রহণ করতে কোনোমতেই রাজী নয় তখন তিনি স্বীয় ঘর-বাড়ি, স্বীয় ধন-সম্পত্তি, স্বীয় মাতৃভূমি ও স্বজাতি এবং সবরকম সম্পর্ককে আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জন দিয়ে স্বীয় মতালম্বী সহধর্মিণী বিবি সারা ও তাঁর মতানুসারী ভাইপো লূত (আ)-কে সাথে নিয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন এবং দেশবাসীকে বললেন :

إِنِّىْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

"আর ইবরাহীম বললেন : আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনিই আমাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবেন।" (সূরা আস সাফফাত ৩৭ : ৯৯)

কেউ কেউ বলেন, এ হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর এবং পৃথিবীর ইতিহাসে ইবরাহীমই প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেন ও স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। (ফাতহুল বায়ান; ৭ম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! এখন একটু চিন্তা করেন যে, সারা পৃথিবী যখন শিরক ও কুফরের অন্ধকারে ঠিক সে সময় সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন আল্লাহর নাম গ্রহণকারী তিন ব্যক্তির এ কাফেলা কতই না বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। আজকের এ উন্নত যুগে তার কল্পনাও করা যায় না। পথিমধ্যে তাঁর জীবনসঙ্গিনী বিবি সারার উপর পাশবিক হামলার চেষ্টা হলো। কিন্তু করুণাময়ের অদৃশ্য লীলায় মুসীবতের সে কালো মেঘ কোনোরূপে কেটে গেল সেই সাথে ঐ মুসিবাতের প্রতিফলস্বরূপ তিনি একটি তুহ্‌ফা বিবি হাজেরাকে উপহার পেলেন। পরে যাকে তিনি স্বীয় অর্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। এভাবে বিপদের পর বিপদের মধ্যে তাঁর জীবনের আশিটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর একত্ববাদের মিশন ব্যর্থই রয়ে গেল।

মানুষের জীবনের এটাই সে সময় যখন সে বার্ধক্যের লাঠিস্বরূপ কোন এক আশ্রয়ের কথা বেশি করে চিন্তা করে। এতদিন পর্যন্ত ইবরাহীমের ঘরেও কোন সন্তান জন্ম হয়নি। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, তাইতো এ যুগের অভাগা বিশ্ব আমার একত্ববাদের মিশন স্বীকার করতে রাজী নয়। কাজেই এ সময় যদি আমার কোনো উত্তরাধিকারী থাকত তাহলে আমার পরে সে আমার মিশনকে অব্যাহত রাখত। এরূপ অনেক কথা চিন্তা ভাবনা করে তিনি স্বীয় প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং অনুনয় ও বিনয় সহকারে বললেন–

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন।"

(সূরা আস্ সাফ্‌ফাত : আয়াত-১০০)

কথায় বলে অন্তর থেকে যে কথা বের হয় তা দ্বারা কাজ নিশ্চয়ই সাধিত হয়। তাই ব্যথিতের ফরিয়াদ গ্রহণকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বললেন–

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ -

"অতঃপর আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম।"

(সূরা আস্ সাফফাত : আয়াত-১০১)

বিখ্যাত মুফাসসির মুকাতিল বলেন, যখন ইবরাহীম বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন তখন তিনি এ দু'আ করেন এবং মুফাসসিরে কুরআন ইবনে আব্বাস বলেন, যখন তিনি সিরিয়ায় হিজরত করেন তখন এ প্রার্থনা করেন।

(ফাতহুল বায়ান ৮ম খণ্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

অতঃপর ইবরাহীমের ঘরে একটি ছেলে জন্ম লাভ করল। ছেলেটির ব্যাপারে ইবরাহীম (আ) যখন স্বীয় প্রভুর নিকট দু'আ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর প্রভুকে বারবার বলেছিলেন : 'ইসমাঅ ইয়া-য়ীল, ইসমাঅ ইয়া-য়ীল'। অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার ফরিয়াদ শোন, হে আল্লাহ! আমার দু'আ কবুল কর।" তাই ছেলেটির নাম রাখা হলো ইসমাঈল। (ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

সে সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬। (ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

ছেলের মুখ দেখলে কে-না খুশী হয় এবং বুড়ো বয়সে লাঠির ছায়া কে-না চায়। তাই শেষ বয়সে লাঠি স্বরূপ পুত্র পেয়ে ইবরাহীমের মনে খুশীর বান ডেকে উঠলো।

অন্যদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আবার পরীক্ষার ধারা শুরু হলো। তাই ইবরাহীমকে হুকুম হলো, তুমি তোমার স্ত্রী হাজেরা এবং তোমার নয়নের তারা ইসমাঈলকে মক্কার ঘাস ও পানিহীন মরুভূমিতে রেখে এস। যে ইবরাহীম স্বীয় জানমাল এবং স্বীয় মাতৃভূমি ও স্বজাতিকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন তিনি এ হুকুম মানতে কি দ্বিধাবোধ করতে পারেন? তাই তিনি জনমানবহীন মক্কা শহরে হাজেরা ও ইসমাঈলকে রেখে চলে এলেন।

অতঃপর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

ছেলেটি যখন দৌড়-ঝাঁপ করতে শিখল। (সূরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭ : ১০২)

এবং মুফাসসিরে কুরআন ফাররার মতানুযায়ী ছেলেটি যখন ১৩ বছর বয়সে পা রাখল তখন ইবরাহীমকে স্বপ্নে হুকুম দেয়া হলো যে, তুমি তোমার কলিজার টুকরা ইসমাঈলকে আল্লাহর রাস্তায় উসর্গ কর। মুকাতিল বলেন, এ স্বপ্ন তিনি পরপর তিন রাতেই দেখলেন। (ফাতহুল বায়ান ৮ম খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

যিলহজ্ব মাসের রাতের তিনি সর্বপ্রথম স্বপ্ন দেখেন যে, একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে যবেহ্ করছেন। স্বপ্নটি দেখার পর ঐ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি এ চিন্তায় বিভোর থাকেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্বপ্ন, না দুঃস্বপ্ন। অতঃপর ৯ম রাতে তিনি আবার ঐ একই স্বপ্ন দেখেন। ফলে ঐ দিন তিনি

জানতে ও বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সত্যিকার স্বপ্ন। তারপর ১০ম রাতে তিনি আবার ঐ স্বপ্ন দেখেন। তাই ঐ দিনে তিনি কুরবানী করতে উদ্যত হন। পরপর তিনরাত স্বপ্ন দেখার পর তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত তিনটি দিন বিশেষ নামে বিশেষিত হয়েছে। যেমন- যিলহজ্ব ৮ম দিনের নাম 'ইয়াওমুত তারবিয়াহ' বা চিন্তাভাবনার দিন, ৯ম দিনের নাম 'ইয়াওমুল আরাফাহ' বা জানার দিন, ১০ম দিনের নাম 'ইয়াওমুন নাহর বা কুরবানীর দিন। (তাফসীরে কাবীর ৭ম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা, তাফসীরে বাগাভী ও খাযিন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, রুহুল মাআনী ২৩ নং খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা)

কুরবানীর ব্যাপারে ইবরাহীমের কাছে সরাসরি ওহি না এসে তাকে স্বপ্ন দেখান হলো কেন? এ সম্পর্কে কোন এক তত্ত্বদর্শী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন জিবরাঈলকে এ আদেশ দেন যে, ইবরাহীমকে তুমি এ বাণী পৌঁছে দাও যে, সে যেন তাঁর নয়নমনি ইসমাঈলকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে। তখন জিবরাঈল আমীন আল্লাহকে বলেন : হে পরওয়ারদিগার! ইবরাহীমকে আমি সব সময়ে খুশী ও মঙ্গলের সুসংবাদ দিয়ে এসেছি। সুতরাং বুড়ো বয়সে তার একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার কথা আমি কি করে তাকে বলি? ফলে আল্লাহ তা'আলা নাকি ঐ ওহীটিকে স্বপ্নে রূপান্তরিত করে দেন- (মাসিক হুদা, দিল্লী)। ইবনে আবী হাতিম বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঘুমন্ত অবস্থায় নবীদের স্বপ্ন ওহী স্বরূপ। (ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

এ স্বপ্ন দেখার পর ইবরাহীম (আ) পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং স্বীয় বিবি হাজেরাকে বললেন, ছেলেটাকে মুখ হাত ধৌত করে কাপড় পরিয়ে দাও। তাকে একটি কাজে নিয়ে যাব। মুসান্নাফে 'আবদুর রাযযাকে কা'ব আহবার থেকে একটি রেওয়াত রয়েছে যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে কুরবানীর স্বপ্ন দেখানো হয় তখন শয়তান মনে মনে বলে যে, এ সময় যদি আমি তাদেরকে ফিতনায় না ফেলতে পারি তাহলে আর কখনো পারব না।

অতঃপর দুই পিতা-পুত্র যখন ঘর থেকে বের হলেন, তখন শয়তান বিবি হাজেরার কাছে গিয়ে হাজির এবং তাঁকে বলল : তোমার পুত্রকে ইবরাহীম কোথায় নিয়ে গেলেন? তিনি বললেন : কোনো কাজে নিয়ে গেছেন। এবার শয়তান বলল : না, না। তিনি তাকে কোনো প্রয়োজনে নিয়ে যান নি; বরং তাকে যবেহ করতে নিয়ে গেছেন। হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন : তিনি তাকে যবেহ করবেন কেন? শয়তান বলল : ইবরাহীমের ধারণা যে, তাঁর প্রভু নাকি তাঁকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। একথা শুনে হাজেরা বললেন : তাহলে তো তিনি তাঁর

পরওয়ারদিগারের হুকুম পালন করে খুব ভালো কাজ করেছেন। এখানে শয়তান নিরাশ হয়ে তাদের দু'জনের পিছনে ছুটলো।

অতঃপর ছেলেটিকে গিয়ে বলল : তোমার বাপ তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ছেলেটি বলল : কোনো কাজে হবে। শয়তান বলল : না! কোন কাজে নয়; বরং তোমাকে যবেহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছেন। সে বলল : আমাকে তিনি যবেহ্ করবেন কেন? শয়তান বলল : তাঁর ধারণা যে, তাঁর প্রভু নাকি তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। ছেলেটি বলল : আল্লাহর শপথ! যদি তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চই এ কাজ করবেন। এখানেও শয়তান সুবিধা করতে পারল না। [এ রেওয়ায়াতটিতে বিবি সারাহ্ ও ইসহাকের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বিদ্বান ও মুসলমানদের সর্ববাদী সম্মত মতে 'যবীহ্' যেহেতু ইসমাঈল (আ) সেজন্য অনেকে এ বর্ণনাটিকে ইসমাঈল ও হাজেরার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আমিও তাই তাঁদের অনুকরণে এখানে হাজেরা ও ইসমাঈলের নাম উল্লেখ করেছি।]

তাই এবার সে ইবরাহীমের নিকট গিয়ে ভিড়ল এবং তাঁকে বলল : আপনার ছেলেকে সকালে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন : একটি প্রয়োজন। শয়তান বলল : আপনি তো তাকে কোনো প্রয়োজনে নিয়ে যাচ্ছেন না; বরং তাকে যবেহ্ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন : আমি তাকে যবেহ্ করব কেন? শয়তান বলল : আপনি মনে করেন যে, আপনার প্রতিপালক নাকি আপনাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ! যদি তিনি আমাকে এ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে আমি একাজ অবশ্যই অবশ্যই করব। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

কতিপয় ঐতিহাসিক ও তাফসীরী বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়ে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার ইবরাহীম (আ)-কে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি ৭টি করে কাঁকর মেরে শয়তানকে বিতারিত করেন। তাঁর ঐ কাঁকর মারার স্মৃতি আজও প্রতি বছর হজের সময় পালন করা হয়।
(তাফসীরে বাগাভী ও খাযিন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪) এবং তাফসীরে মাযহারী- (৮ম খণ্ড, ১৩১)

শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার পর ইবরাহীম তাঁর ছেলেকে বললেন-

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

“তারপর সে যখন তাঁর পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম (আ) বললেন : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি; এখন তুমি বল, তোমার অভিমত কি? সে বলল : হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা পূর্ণ করুন। ইনশা আল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।” (সূরা আস-সাফফাত : আয়াত-১০২)

এভাবে পিতা পুত্রের সাওয়াল-জাওয়াবের পর ছেলেটি যখন রাজী হয়ে গেল তখন দু'জনই মহান আল্লাহর নিকট নিজেদের সঁপে দিল। কাতাদাহ বলেন : ছেলেটি জীবনের মালিকের সামনে তার জীবনের তুহফা পেশ করল এবং তার পিতা নিজ কলিজার টুকরাকে ছিঁড়ে আল্লাহর সামনে রেখে দিল।
(তাফসীরে কাবীর ৭ম খণ্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা , ফাতহুল বায়ান ৮ম খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

ইবনুল মুনযির ও মুস্তাদরাকে হাকিমে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, তারপর ছেলেটি তার পিতাকে বলল : আপনি আমাকে চোখে দেখা অবস্থায় যবেহ করতে পারবেন না। কারণ, আপনার হয়তো ছেলের মায়া উথলে উঠতে পারে, ফলে আপনার ছুরি নাও চলতে পারে? অথবা আমি হয়তো অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে পারি এবং আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে দিতে পারি। সেজন্য আপনি আমার হাত থেকে ঘাড় পর্যন্ত শক্ত করে বেঁধে দিন। তারপর আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। (ফাতহুল বায়ান ৭৩ পৃষ্ঠা)

অন্য বর্ণনায় আছে, “ছেলেটি আবার বলল : পিতা! আপনি নিজের কাপড়টা জড়িয়ে নিন এবং আমাকে ভালো করে বেঁধে দিন। যাতে আমার রক্তের ছিটে আপনার গায়ে না লাগে এবং আমার নেকী কমে না যায়। আর যবেহের পর আপনি যখন আমার মায়ের কাছে যাবেন তখন তাঁকে আমার সালাম দেবেন। আর আপনি যদি আমার জামাটা মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিয়ে যাবেন। যাতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পান। কলিজার টুকরা একমাত্র কচি বাচ্চার মুখ দিয়ে এ রকম কথা শুনে ইবরাহীমের মনে কি প্রতিক্রিয়াই না হতে পারে! তবুও তিনি ধৈর্যের অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিচ্ছেন : বাবা! তুমি আল্লাহর হুকুম পালনার্থে আমার কি উত্তম সাহায্যকারী! কথাটি বলে তিনি পুত্রকে চুমু খেলেন এবং ছলছল চোখে তাকে বাঁধলেন।”
(তাফসীরে বাগাভী, খাযিন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, কাবীর ৭ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

অতঃপর কুরআনের ভাষায়–

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ .

(সূরা আস্-সাফফাত : আয়াত-১০৩)

ইবরাহীম তাকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। মুসনাদে আহমদে একটি হাদীস রয়েছে যে, তখন ইসমাঈলের গায়ে একটি সাদা জামা ছিল। তাই সে বলল : হে আব্বাজান! এটা ছাড়া আমার কাছে আর তো কোনো কাপড় নেই, যদ্বারা আপনি আমাকে কাফন দিতে পারেন। অতএব, আপনি এ জামাটি খুলে নিন যাতে আমার কাফনের কাজ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি জামাটা খুলে নিলেন।

(ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

এবার শুরু হলো আসল ইতিহাসের সূচনা। অর্থাৎ ছেলেটির গলায় ছুরি চালাবার পালা। আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ইবরাহীমের হাত যখন ছেলেটির ঘাড়ে ছুরি চালিয়ে দিল বিশ্বজাহান তখন কেঁপে উঠল। সে কি এক অভিনব দৃশ্য! পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা তাও কে বলতে পারে। একদিকে জনমানবহীন, পশু-পক্ষী ও প্রাণীহীন নীরব মক্কা নগরী। অন্যদিকে ধু ধু বালির মধ্যে খাঁ খাঁ করছে মিনার ঐতিহাসিক প্রান্তর। আর তারই মাঝে একটি ৯৯ বছরের বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁর ছুরির তলায় পড়ে রয়েছে ১৩ বছরের সুন্দর ফুটফুটে কুসুমতি এক তরুণ টগবগে যুবক। এ এক অকল্পনীয়, অচিন্তিনীয় প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে আকাশ যেন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে এবং আদমের জন্মের সময় প্রবল আপত্তিকারী ফেরেশতারাও যেন ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদছে। গাছপালা কেউ যেন আর নড়ছে না এবং পশু-পক্ষীরাও যেন চলাচল করতে পারছে না।

বাতাসের গতিও যেন থমকে গেল এবং পাহাড় ও পর্বতেও যেন একটা নিঝুমভাব ফুটে উঠল। সবাই যখন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে এ অভাবনীয় দৃশ্য অবলোকন করছে ইবরাহীমের হাত তখন ইসমাঈলের ঘাড়ে অনবরত চলছে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা বুঝা বড় ভার। তাই ইমাম সুদ্দী বলেন : এদিকে আল্লাহ ইবরাহীমকে হুকুম দিয়েছেন নিজ হাতে ছেলে যবেহ কর, আর ওদিকে তিনি ছুরিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি মোটেই কেটো না। ফলে ছুরি এবং তার ঘাড়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতে একটি পিতলের পাত আড় সৃষ্টি করে। সেজন্য ইবরাহীম বারবার ছুরি চালালেও কোন কাজ হচ্ছিল না।

(ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা ও ফাতহুল বায়ান ৮ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

এ অচিন্তনীয় পরিস্থিতিতে বিশ্বজগতের সবাই যখন হতভম্ব এবং হতবাক ও শ্বাসরুদ্ধ তখন মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তাঁর রহস্য ফাঁস করে দিয়ে জান্নাত

থেকে জিবরাঈলের মাধ্যমে একটি দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন এবং ইসমাঈলকে বাঁচিয়ে নিয়ে ইবরাহীমের অজান্তে সে দুম্বাটিকে তাঁর দ্বারা যবেহ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন–

وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَّاِبْرَهِيْمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ - وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ -

"তখন আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে প্রমাণ করে দেখালে। আমি এরূপেই খাঁটি বান্দাদেরকে পুরুস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান যবেহের বিনিময়ে।" (সূরা সাফফাত : আয়াত-১০৪-১০৭)

ওয়াহিদী বলেন : ইবনে আব্বাসসহ অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে, ইবরাহীমের কাছে সে দুম্বাটি পাঠানো হয়েছিল যেটাকে জান্নাতে চল্লিশ বছর ধরে লালন পালন করা হয়েছিল। (ফাতহুল বায়ান; ৭৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ইবনে আবী হাতিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটা সে দুম্বা যেটা আদম (আ)-এর ছেলে (হাবীল) আল্লাহর দরবারে কুরবানী করেছিল এবং সেটা কবূলও হয়েছিল। তখন থেকে ওটা জান্নাতে চলতে থাকে। পরিশেষে তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলকে বাঁচিয়ে নেন।

(ইবনে কাসীর ৪র্থ খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, কাবীর ৭ম খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)।

একটি বর্ণনায় আছে, ইবরাহীম (আ) যখন ইসমাঈলকে যবেহ করছিলেন তখন জিবরাঈল বলেছিলেন : আল্লাহু আকবার! আল্লা-হু আকবার। অতঃপর ইবরাহীম বলেন, আল্লাহু আকবার! ওয়ালিল্লা-হিল হামদ। তারপর থেকে এ তাকবীরটা চিরস্থায়ী সুন্নাতে পরিণত হয়। (তাফসীরে নাসাফী ৪র্থ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা, কাশশাফ ৩য় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, তাফসীরে আবূস সউদ ৭ম খণ্ড, ৫৪৮ পৃষ্ঠা, ফাতহুল বায়ান ৮ম খণ্ড, ৭৪)

জন্মদিন থেকে জীবনের ৯৯টি বছর ধরে একটার পর একটা পরীক্ষা করে যখন পরওয়ারদিগারে 'আলাম ইবরাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন তখন তাঁর এ চিত্তহারী, রোমাঞ্চকর ও বিপ্লব সৃষ্টিকারী কীর্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয়, অমর করে দিলেন এ বলে :

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ * سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ -

"আর আমি তার জন্য এ বিষয়টি ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম। 'সালাম' বর্ষিত হোক ইবরাহীমের ওপর।" (সূরা আস-সাফফাত : আয়াত-১০৮-১০৯)

অতঃপর আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক তখন থেকে চলে আসছে এ ইবরাহীমী আদর্শের বাস্তবায়ন। তাই আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহর হুকুমের প্রতিপালনের সাথে সাথে প্রতি বছর ইবরাহীমের স্মৃতি পালন করে পাপমোচন-সাগরে করছে অবগাহন। আল্লাহর বাণী প্রচারার্থে ৭৫ বছরের মায়ামমতা বিজড়িত মাতৃভূমি ত্যাগকারী, মানবজাতির ইতিহাসে পৃথিবীর সর্বপ্রথম হিজরতকারী ইবরাহীম (আ)-এর বাস্তুভিটা ত্যাগের আদর্শ, যুক্তি ও তর্ক সহকারে তাওহীদের (একত্ববাদের) উদাত্ত আহ্বান বলিষ্ঠকণ্ঠে ও নির্ভীকচিত্তে প্রচার করার তাগিদে শিরকের (বহুত্ববাদিতার) মূর্ত প্রতীক জন্মদাতা পিতার অপত্যস্নেহ ও স্বদেশবাসীর অকৃত্রিম ভালোবাসার মায়াজাল ছিন্নকারী, অসহায় ও দৃঢ়চিত্ত ইবরাহীমের প্রেরণাদায়ক আদর্শ, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে নিজের কামনা ও বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীয় কলিজার টুকরাকে নিজ হাতে কুরবানীর জন্য ছুরি চালানোর জন্য ইবরাহীমের অনুপম আদর্শাবলী অনাগত বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয়, বরণীয় ও চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য নয় কি? এগুলোই হল ইবরাহীমের সেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমের আদর্শকে কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী করে দিয়েছেন। সেজন্য ইবরাহীম (আ) পাঁচ হাজার বছর স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন কালজয়ী এবং বিশ্বের তাওহীদ বাদীদের হৃদয়বিজয়ী।

৯. ইবরাহীম (আ)-এর উট কুরবানী ঠিক, না কাল্পনিক?

ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে যখন কুরবানীর নির্দেশ পান তখন তাঁকে স্বপ্নে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? এ ব্যাপারে ওয়ায়িযীন ও বক্তাদের মুখে এবং কবি-লেখক ও জনগণের মধ্যে প্রচারিত আছে যে, ইবরাহীমকে নাকি বলা হয়েছিল যে, তুমি তোমার প্রিয়বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী কর। ফলে তিনি তিনদিনে তিনশো উট কুরবানী করেন। তারপরে তিনি আবার তাঁর প্রিয়বস্তু কুরবানী করার নির্দেশ পাওয়ায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রিয় বস্তু বলতে তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকেই কুরবানী করতে বলা হয়েছে। তাই তিনি সবশেষে স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে সচেষ্ট হন।

এ ব্যাপারে মজার কথা হলো যে, 'তুমি তোমার প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী কর'– এ কথাটি আমাদের সমাজে কোথা থেকে প্রচার হলো বোধগম্য নয়। কারণ কুরআনের কোথাও ঐ বাক্যটির সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না এবং কুরআনের নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরেও ঐ বাক্যটির উৎস নেই। তেমনি তিনশো উট কুরবানীর কথাও কোনো হাদীস ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরে খুঁজে পেলাম না। উক্ত দু'টি বিষয় অর্থাৎ 'প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করার নির্দেশ' এবং ঐ নির্দেশ পালনার্থে 'তিনশো উট কুরবানী'র কথা তাফসীরে ইবনে কাসীর,

তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে আবুস সউদ, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে নাসাফী, কাশশাফ, বায়যাভী, ফাতহুল বায়ান, রূহুল মা'আ-নী, বাগাভী ও তাফসীরে খাযিন প্রভৃতি তাফসীরগুলো তন্নতন্ন করে দেখলাম। কিন্তু কোথাও উক্ত দু'টি বিষয়ের সন্ধান পেলাম না।

অতঃপর উর্দূ তাফসীরগুলোর মধ্যে তাফসীরে হুসাইনী, হাক্কানী ও 'উসমান, মা'আ-রিফুল কুরআন ও বায়া-নুল কুরআন, মাজিদী ও মওদূদী, সানায়ী ও রিযায়ী প্রভৃতি তাফসীরসমূহ মন্থন করলাম। আমার সাধ্যমতো হাদীস ও শরহে হাদীসের বহু গ্রন্থও অধ্যয়ন করলাম। বহু আলিমকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কোথাও বিষয় দু'টির রেফারেন্স খুঁজে পেলাম না। যারা ঐ কথাগুলো বলে বেড়ান তারা কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে বলেন কি না জানি না। কুরআন স্পষ্ট বলছে যে, ইবরাহীম তাঁর প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করাকে এ স্বপ্ন দেখেননি, বরং তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, 'স্বীয় পুত্রকেই যবেহ করছেন'। আয়াতটির তাফসীরকার সমস্ত মুফাসসিরগণও তাই বলেছেন যে, তিনি পরপর তিনটি রাতেই স্বপ্ন দেখেন যে, স্বীয় পুত্রকে যবেহ করছেন। তাহলে প্রিয় বস্তু কুরবানীর কথা এল কোথা থেকে?

ক্বাসাসুল আম্বিয়ার উর্দূ অনুবাদ গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, ইবরাহীম (আ) পরপর তিনরাত স্বপ্ন দেখেন এবং প্রতিদিন দুইশত করে মোট ছয়শত উট কুরবানী করেন। তারপর ৪র্থ রাতে স্বপ্ন দেখেন ৪র্থ দিনে তিনি নিজ পুত্রকে কুরবানী দিতে উদ্যত হন।

উক্ত ক্বাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে বহু উদ্ভট ও গাঁজাখুরী কাল্পনিক বানোয়াট কথা লেখা রয়েছে যার প্রতিবাদ মাও: হিফযুর রহমান (রহ) কাসাসুল কুরআন নামক গ্রন্থে প্রায়ই করেছেন। সমস্ত তাফসীর ওয়ালারা বলছেন, ইবরাহীম (আ) স্বপ্ন দেখেন তিনরাত, কিন্তু কাসাসুল আম্বিয়া বলছে, চার রাত। বাজারে রটে আছে, তিনশত উট কুরবানীর কথা। কিন্তু কাসাসুল আম্বিয়া বলছে, ছয়শত উট। আমার মনে হয় যে, এগুলো ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বিকৃত বর্ণনার বহিপ্রকাশ।

তাই সত্যিকার আলিমদের কাছে জানতে চাইছি যে, 'প্রিয় বস্তু কুরবানী করার নির্দেশ' এবং ঐ নির্দেশ পালনার্থে ইবরাহীম (আ)-এর তিনশত বা ছয়শত উট কুরবানী'র কথা কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরে কিংবা সহীহ হাদীসে আছে কি; যদি থাকে তাহলে ঐ তাফসীর বা হাদীস গ্রন্থের খণ্ড ও পৃষ্ঠার বর্ণনাসহ বিষয়টি আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন। অন্যথায় ব্যাপারটি যদি ভিত্তিহীন হয় তাহলে প্রকৃত ব্যাপারটি জনগণকে জানিয়ে ভ্রান্তিমুক্ত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত বিষয় জানার এবং তা প্রচারের তাওফীক দিন– আমীন।

১০. কুরবানীর গুরত্ব

মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ নবী হবার পর মক্কায় তেরটি বছর অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করে চলে যান। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরবানী দেবার নির্দেশ পান। এ হুকুম পাবার পর তিনি দশ বছর বেঁচেছিলেন। তাই ঐ দশ বছরই তিনি কুরবানী করতে থাকেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ বছর মাদীনায় অবস্থান করেন এবং কুরবানীও করতে থাকেন।

(আত্-তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১২৯ পৃষ্ঠা)

হাফেয ইবনুল কাইয়্যুম বলেন, রাসূল ﷺ কখনো কুরবানী বিরতি দেননি।

(যা-দুল মা'আ-দ ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানী সুন্নাতে মুআক্কাদা। এটা ফরয ও ওয়াজিব নয়।

তবে কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বাহ্যত মনে হয় যে, কুরবানী ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় কাজ। যেমন– ইবনে মাজার একটি হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কুরবানীর সামর্থ্য রাখে অথচ কুরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে। (ইবনে মাজাহ ২৩২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ যায়লাঈ বলেন, এ হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, সুনানে দারাকুতনী ও মুস্তাদরাকে হাকিম প্রভৃতিতেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর কয়েকটি বর্ণনার সনদ রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত পৌছায় না; বরং তা সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা) পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। কাজেই হাদীসটি মারফূ নয়; বরং মাওকুফ।

(নাসবুর রায়াহ ৪র্থ খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম তাহাভীও বলেন, মওকূফ হওয়াটা সঠিক। তথ্যটি এ হাদীসে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ নেই। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা)

এ হাদীসটির একজন রাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশকে ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসায়ী যঈফ ও দুর্বল বলেছেন। (ইবনে মাজার উক্ত পৃষ্ঠায় বায়নাস সুতূর)

সুতরাং হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনে জাওযী 'তাহ্কীক' গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি ওয়াজিব প্রমাণ করে না। যেমন– ঐ হাদীস 'যে ব্যক্তি রসুন খায় সে যেন আমাদের সালাত পড়ার জায়গার নিকটেই না আসে' উক্ত হুকুমটিকে ওয়াজিব প্রমাণ করে না। (নাসবুর রায়াহ ৪র্থ খণ্ড, ২০৭)

সুনানে আরবা'আ ও মুসসনাদে আহমদের একটি হাদীসে রয়েছে– হে মানবমণ্ডলী! প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছরে একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ নিশ্চয়ই আছে। এ হাদীস সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, এ হাদীসটিতেও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার স্পষ্ট কোনো শব্দ নেই। তাছাড়া এ রেওয়ায়াতে কুরবানীর সাথে "আতীরা"রও উল্লেখ আছে, যা সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব তো নয়ই, বরং অন্য হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, ২য় পৃষ্ঠা)

কোনো সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব প্রমাণিত না হলেও রাসূলুল্লাহর সর্বদা 'আমাল দ্বারা কারো কারো মনে ওয়াজিব হওয়ার সন্দেহ হয়। তাই একজন লোক নবী করীম ﷺ সুন্নাতের আশেক 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমরকে জিজ্ঞেস করেন, কুরবানী কি ওয়াজিব? অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় কাজ কি? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী দিতেন এবং মুসলমানেরাও করতেন। এ উত্তরে প্রশ্নকারী দ্বিধামুক্ত না হওয়ায় তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এটা ওয়াজিব কি-না? উত্তরে তিনিও আবার বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না। আমি তো বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করতেন এবং তারপর সাধারণ মুসলমানেরাও কুরবানী দিত। তারপর থেকে এ সুন্নাত প্রচলিত।

(আত্-তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা ও ইবনে মাজাহ ২৩২ পৃষ্ঠা)

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আহলে 'ইলম বা কুরআন হাদীস জ্ঞানীদের 'আমাল এ ছিল যে, কুরবানী ওয়াজিব নয়; বরং নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাতের মধ্যে এটি একটি সুন্নাত। (আত্-তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

মুসনাদে আহমদ, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, দারাকুতনী ও হাকীম প্রভৃতিতে একটি যঈফ হাদীসে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উপর কুরবানী ফরয, কিন্তু তোমাদের উপর নয়। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, ৪র্থ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বলেন : কুরবানী আমার উপরে ফরয এবং তোমাদের উপরে সুন্নাত। (তাবারানী কানযুল উম্মা-ল ৫ম খণ্ড, ৪৩)

কুরবানী "সুন্নাত" হওয়া সম্পর্কে সহীহ ও য'ঈফ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো য'ঈফ হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে তা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়ার কারণে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, কুরবানী সুন্নাত না ওয়াজিব অর্থাৎ– শুধু করণীয় না অবশ্য পালনীয়? ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে প্রত্যেক স্বাধীন, ধনী ও ঘরে অবস্থানকারী মুসলমানের উপরে কুরবানী ওয়াজিব। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম শাফিঈ (রহ) বলেন : কুরবানী সুন্নাত। একে আমি পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না। (কিতাবুল উম্ম ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক (রহ) বলেন : কুরবানী সুন্নাত; ওয়াজিব নয় এবং কোনো ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি একে বর্জন করে আমি তা পছন্দ করি না।

(মুওয়াত্তা ইমাম মালিক; ১৮৯ পৃষ্ঠা)

তিনি ইমাম আবূ হানীফার মত, "ঘরে অবস্থানকারীর" শর্ত লাগাননি।

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা বর্জন করা আপত্তিকর। হানাফীদের ইমাম আবূ ইউসুফ, মালিকীদের ইমাম আসহাব এবং জমহুর ও অধিকাংশ আলিমের মতে তা সুন্নাতে মুআক্কাদা। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, ১মা)

ইমাম ইবনে হাযম (রহ) বলেন, কুরবানী সুন্নাত, ফরয নয়। কোনো সাহাবী থেকেও সহীহ সনদে প্রমাণিত নেই যে, কুরবানী ওয়াজিব।

(মুহাল্লা ৭ম খণ্ড, ৩৫৫-৩৫৮ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনার সারকথা হচ্ছে এই যে, কুরবানী বিশ্বনবী ﷺ-এর আজীবন সুন্নাত এবং তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে মুসলিম জাহানের সার্বজনীন 'আমল এবং ইসলামের এক মহান বৈশিষ্ট্য। তাই কোনো সামর্থবান মুসলমানের পক্ষে কুরবানী ত্যাগ করা মোটেই উচিত নয়। এমনকি ধার করেও যদি কুরবানী দেয়া সম্ভব হয় তাও দেয়া উচিত। যেমন 'আয়েশা (রা) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি দেনা করেও কুরবানী দেব কি? তিনি ﷺ বললেন, হ্যাঁ। কারণ এ দেনা শোধ হবেই। (দারাকুতনী ২য় খণ্ড, ৫৪৪ পৃষ্ঠা)

এ হাদীসটি য'ঈফ হলেও মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ফকীহদের কাছে আমলযোগ্য। কিন্তু কুরবানীদাতাদের একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ টাকা যেন সুদের টাকা না হয় এবং তাদের কুরবানী যেন লোক দেখানো অথবা দুনিয়ায় নাম পাওয়া অথবা আত্মঅহংকার প্রকাশ প্রভৃতির জন্য না হয়ে থাকে। কারণ কুরবানীর ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

"আর আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত এবং না এগুলোর রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথ দান করেছেন। আর সংবাদ দাও সৎকর্মশীল লোকদেরকে।" (সূরা আল-হজ্জ : আয়াত-৩৭)

হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর ব্যাপারেও আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

"তুমি তাদের সঠিকভাবে শুনাও আদমের দুই পুত্রের বিবরণ। যখন তারা কুরবানী করেছিল তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হয়েছিল এবং অপরজনের কুরবানী কবুল করা হয়নি। সে বলল : 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। অপরজন বলল : আল্লাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ ভীরুদের কুরবানী কবুল করেন।" (সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত-২৭)

১১. কুরবানীর মাহাত্ম্য

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : ইয়াওমুন নাহরে (অর্থাৎ বকরা ঈদের দিনে) আদম সন্তান যত কাজ করে তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ (কুরবানীর জানোয়ারের) রক্তপাত। ঐ জানোয়ার কিয়ামতের দিনে তার শিং ও পশম এবং খুরসহ নিশ্চয়ই হাযির হবে আর তার রক্ত যমীনে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে তা কবূলিয়াতের (গৃহীত হবার) দরবারে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা কুরবানী করে নিজেদের মনকে তৃপ্ত কর। (আত্-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ মিশকাত ১২৮)

একদা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, কুরবানী কি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত ও আদর্শ। তাঁরা আবার প্রশ্ন করলেন, এতে আমাদের উপকার কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক পশমের বদলে একটি করে নেকী রয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৯ পৃষ্ঠা)

একদা তিনি ফাতিমা (রা)-কে বলেন, ঐ জানোয়ারের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর বদলে তোমার একটি করে গুনাহ মাফ হবে এবং ঐ জানোয়ারটিকে তার খুন ও গোশতসহ তোমার দাঁড়িপাল্লাতে সত্তর গুণ ভারী করে দেয়া হবে।

(আবুল কাসিম ইসবাহানী, মির'আত ২য় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা)

কথাটি শুনে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঐ নেকী মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশের জন্য নির্দিষ্ট না সর্বসাধারণের জন্যও? তিনি বললেন, এটা মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশ এবং সর্বসাধারণ সবারই জন্যই নির্দিষ্ট।

('বাইহাকী, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, ১১৯ ও ৫১, মুস্তাদাকে হাকীম ৪র্থ খণ্ড, ২২২ ও নাসবুর রায়াহ ৪র্থ খণ্ড, ২১৯)

আল্লামা আবূ বকর ইবনুল আরাবী তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আ-রিয়াতুল আহ্‌ওয়াযীতে বলেন, কুরবানীর ফযিলত ও মাহাত্ম সংক্রান্ত একটি হাদীসও সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়। (তালখীসুল হাবীর ২য় খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে হাযমও তাই বলেন। (আল-মুহাল্লা ৭ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লামা 'উবাইদুল্লাহ্ রাহমানী বলেন, ঐ সমস্ত হাদীসগুলোর সনদ আপত্তিমুক্ত না হলেও তারা একে অপরকে সমর্থন করার ফলে সবাই সমষ্টিগতভাবে য'ঈফ থেকে হাসানের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'আমলের ফযিলত ও মাহাত্ম্য সংক্রান্ত ব্যাপারে য'ঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

(মির'আত ২য় খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

দারিদ্র্যের কারণে যার উপরে কুরবানী নেই তার কুরবানীদাতার সাথে সাদৃশ্য পেশ করার জন্য কুরবানীর দিনে মুরগি ও মোরগ কুরবানী দেয়া আপত্তিকর। কারণ এটা অগ্নিপূজকদের প্রথা। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা)

১২. ঈদে যা করণীয়

১. কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কাজ বা আচরণ করা থেকে বিরত থাকা।
২. পুরুষ কর্তৃক মহিলার বেশ-ধারণ ও মহিলা কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা।
৩. ঈদের দিনে কবর জিয়ারত করা।
৪. বেগানা নারী-পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করা।
৫. মহিলাদের খোলা-মেলা অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে পথে-প্রান্তরে বের হওয়া।
৬. বেগানা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না করা।
৭. গান-বাদ্য থেকে বিরত থাকা।

১৩. মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর বিধান

আ'মাশ বলেন, আমি আলী (রা)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ব্যাপার? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে কুরবানী করার ওসিয়ত করে গেছেন। তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে এ কুরবানী আদায় করছি। (আবু দাউদ, মিশকাত ১২৮. বাইহাকী ৯ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

মুস্তাদরাকে হাকীমেও একটি সহীহ রেওয়ায়াত আছে যে, তিনি দু'টি দুম্বা নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে। উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া জায়েয। (মিরকাত ২য় খণ্ড, ২৬৫)

এ ব্যাপারে আত্-তিরমিযী হাদীস গ্রন্থের ভাষ্যকার আল্লামা মুবারাকপুরী বলেন : কেবল মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে আমি একটি সহীহ্ মারফু হাদীস রাসূল ﷺ থেকে পাইনি। থাকলে সেটা আলী বর্ণিত (রা) হাদীস, আর তা য'ইফ।

তাই কোনো ব্যক্তি যদি একটি কুরবানী কেবল মৃত লোকদের পক্ষ থেকে করে এবং তাতে জীবিত লোককে শরীক না করে তাহলে সাবধানতা অবলম্বনমূলক হিসেবে গোটা কুরবানীটাই সদকাহ্ করা উচিত। যেমন– আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক 'গুন্য়্যাতুল আলমায়ী' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি একটি কুরবানী নিজের এবং কিছু মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া কিংবা নিজের এবং স্বীয় পরিবার ও কিছু মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয় তাহলে তার গোশত নিজে খেতে এবং পরিবারবর্গকে খাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। আর এ কুরবানী গোটাই তাকে খায়রাত করতে হবে না। এ ব্যাপারে হানাফী ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন বলেন, যদি কেউ মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে এ কুরবানী গোশ্ত খাওয়া ও সদকার ব্যাপারে ঐরূপ করবে যেমন সে নিজের কুরবানীর ব্যাপারে করে। আর ওর নেকীটা মৃতব্যক্তি পাবে।

(তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৩৫৪, আওনুল মাবুদ ৩য় খণ্ড, বদ্দুল মুহতার ৫ম খণ্ড, ২৮৫)

১৪. যখন কুরবানী শুরু হবে

ঈদের সালাতের আগে কুরবানী দেয়া যাবে না। যেমন–

রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের আগে যবেহ্ করে সে নিজেরই জন্য তা যবেহ্ করে এবং যে ব্যক্তি সালাতের পরে যবেহ্ করে সে তার কুরবানী পূর্ণ করে এবং মুসলমানদের রীতিনীতি সঠিকভাবে পালন করে।

(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১২৬ ও ১২৮ পৃ.)

বারা ইবনে 'আযিব (রা) বলেন, একদা কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে খুৎবাহ দিয়ে বললেন– لَا يُضَحِّيَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সালাত না পড়া পর্যন্ত কখনই যেন সে কুরবানী না করে।

(মুসলিম ২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃ.)

আত্-তিরমিযীর বর্ণনায় আছে– অর্থাৎ, সালাত না পড়া পর্যন্ত তোমাদের কেউই যেন কখনো যবেহ না করে। (আত্-তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৮২ পৃ.)

১৫. কুরবানী মোট কতদিন

কুরবানী মোট কতদিন হতে পারে– এ ব্যাপারে বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম ও ইমামদের পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন– ইমাম ইবনে হাযম ও আল্লামা 'উবাইদুল্লাহ রাহমানী সাহেব বলেন–

১. ইবনে আবী শায়বা ও মুওয়াত্তা ইমাম মালিককে 'উমর, 'আলী, ইবনে 'উমর, ইবনে 'আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরবানী ইয়াওমুন নাহর ও তার পর দু'দিন। অর্থাৎ, ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্ব মোট তিন দিন। এটা হল হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের অভিমত। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে হায্ম বলেন, আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটির সনদ ছাড়া বাকি সূত্রগুলো বিশুদ্ধ নয়। প্রত্যেকটির সনদে কোনো না কোনো রাবী দোষযুক্ত আছেন। এগুলো সম্পর্কে আল্লামা রাহমানী বলেন, এসব হাদীগুলো মওকূফ। অর্থাৎ সবগুলোই উক্ত সাহাবীদেরই উক্তি। রাসূলুল্লাহর উক্তি নয়। কোনো বিষয়ে সাহাবীদের মোকাবেলায় যদি রাসুলুল্লাহর মারফূ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে সেটাই নীতিবিদ মুহাদ্দিসদের মতে অগ্রাধিকার যোগ্য।

২. ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, দারাকুতনী, বায্যার, ইবনে 'আদী, মুসনাদে আহমদ ও ইবনে আবি শায়বা প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করীম ﷺ বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলো যবেহের দিন। অর্থাৎ কুরবানী হবে ১০, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহিজ্জ পর্যন্ত। মোট ৪ দিন। ইমাম শাফি'ঈর ও অনুরূপ মতো।'

১৬. কুরবানীর উত্তম দিন ১০ই যুলহজ্জ

চন্দ্র বছরের শেষ মাসের নাম যিলহজ্ব। এ মাসের ১০ম তারিখকে আরবিতে ইয়াওমুন নাহর বলে। আর নাহর শব্দের অর্থ সীনা বা বুক। উটের সীনায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় খঞ্জরের খোঁচা মেরে রক্তপাত করে উট বধ করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'নাহর' বলে। ব্যাপক অর্থে নাহর শব্দের অর্থে যবেহও বোঝায়। যেমন– মুয়াত্তা ইমাম মালিক-এর ১৮৮ পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে উট ও গরু উভয়কে বধ করার ব্যাপারে 'নাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও গরুকে যবেহ করা হয়। নাহর করা হয় না। এ ইয়াওমুন নাহরের ফযিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইয়াওমুন নাহরে আদম সন্তান যত কাজ সম্পদের করে থাকে তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ (কুরবানীর জানোয়ারের) রক্তপাত। ঐ জানোয়ার তার শিং, পশম ও খুরসহ কিয়ামতের দিনে নিশ্চয়ই হাযির হবে। আর ঐ খুন যমীনে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে তা মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। কাজেই তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজের মনকে তৃপ্ত কর। (আত্ তিরমিযী, ইবনে, মাজাহ, মিশকাত ১২৮)

১৭. কুরবানীর জানোয়ার কি কি

মোট ৮ প্রকার জন্তু দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয যা সূরা আনআমের ১৪৩ ও ১৪৪দ্বারা প্রমাণিত।

১. ভেড়া- পুরুষ ও স্ত্রী, ২. বকরী – পুরুষ ও স্ত্রী

৩. উট – পুরুষ ও স্ত্রী, ৪. গরু বা মহিষ পুরুষ ও স্ত্রী

১৮. কুরবানীর পশু গাভিন হলে কুরবানী দেয়া যাবে কি?

ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত আছে, গাভিন জন্তুর কুরবানী চলে না। কিন্তু এ রটনার প্রমাণে কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো দলীল পাওয়া যায় না; বরং হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, গাভিন জন্তু এবং সদ্য বাচ্চা হওয়া জন্তু কুরবানী করতে কোনো আপত্তি নেই। যেমন- আবু সা'ইদ খুদরী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা নহর করি এবং গরু ও বকরী যবেহ করি। অতঃপর তাদের পেট থেকে বাচ্চা পাই এটা আমরা ফেলে দেব, না খাব? তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও তাহলে খাও। কারণ তার যবেহ তার মায়ের যবেহের মতো।

(আবু দাউদ ২য়, ৩৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৩৫৭ পৃ.)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, গাভিন গরু যবেহ করতে নিষেধ নেই এবং কারো রুচিতে না বাধলে যে যবেহ করা গাভিন জন্তুর বাচ্চা খেতে পারে।

১৯. যুলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন চুল ও নখ কাটা নিষিদ্ধ

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে এবং কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন কুরবানী করা পর্যন্ত তার নখ ও চুল মোটেই না কাটে। অন্য বর্ণনায় আছে, যিলহজ্জ ১০ দিন যখন এসে পড়ে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে সে যেন তার নখ ও চুলে স্পর্শ না করে- (মুসলিম, মিশকাত ১২৭ পৃষ্ঠা, আত্-তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, মুস্তাদরাকে হাকীম, কানযুল-উম্মাল ৫ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)। আবু দাউদ, মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনায় আছে; যার কাছে কুরবানী জানোয়ার রয়েছে, অতঃপর সে যখন যিলহজ্জ চাঁদ দেখে তখন কুরবানী না করা পর্যন্ত সে যেন তার নখ ও চুল না কাটে। (নায়লুল আওতার ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

২০. কুরবানী যবেহের নিয়মাবলি

আনাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে শিংওলা দু'টি ক্রুটিমুক্ত দুম্বা কুরবানী করেন। আমি দেখলাম যে, তিনিও তাদের ঘাড়ে পা দিয়ে বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলে যবেহ করলেন। 'আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁকে বললেন, একটি ছুরি আনো এবং ওটাকে পাথরে ঘষে শান দাও। আমি তাই করলাম। তারপর তিনি ছুরিটা ধরলেন এবং দুম্বাটা ধরে শুইয়ে ফেললেন। অতঃপর যবেহ করলেন। তারপর বললেন, বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়ালী-মুহাম্মাদিঁও ওয়ামিন উম্মাতি মুহাম্মাদ।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৭ পৃ.)

২১. নিজ হাতে কুরবানী করা উচিত

উপরোক্ত আনাস (রা) বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসসহ অগণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে কুরবানী করতেন এবং সাধ্যমতো অন্য কাউকে দিয়ে কুরবানী করাতেন না। সুতরাং তাঁর উম্মতের উচিত তাঁর আদর্শ যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করা এবং নিজহাতে কুরবানী করা। আল্লামা মাযহার বলেন, প্রত্যেকেরই নিজহাতে কুরবানী করা সুন্নাত। কারণ যবেহ করাটা একটি ইবাদত। আর নিজের ইবাদত নিজে করাই অতি উত্তম। যদিও এ ইবাদাত অন্যকেও দিয়ে করানো বৈধ। (মিরকাত ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃ.)

অভিজ্ঞার আলোকে দেখা গেছে যে, নিজ হাতে কুরবানী করার ফলে এবং কুরবানী করার সময় কুরবানীগাহে হাযির থাকার ফলে অনেক কাপুরুষ ও ভীরু ব্যক্তির কাপুরুষতা ও ভীরুতা কেটে গিয়ে তাদের মনে সাহসের সঞ্চার হয়েছে।

২২. কুরবানীর পশুর মাথা বিচ্ছিন্ন হলে এবং ঘাড় মটকালে তার বিধান

মোরগ, মুরগি ও হাঁস প্রভৃতি যবেহের সময় কখনো কখনো দেখা যায় যে, কল্লাটা ঘাড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। এ বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে হানাফী ফিক্হ বলে, মাথা কেটে ফেললে কাজটা আপত্তিকর হবে, কিন্তু যবেহকৃত জন্তুটি খাওয়া যাবে। ঐ আপত্তির কারণ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থে একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী হানাফী এবং হাফিয ইবনে হাজার আস্কালানী (রহ.) বলেন, ঐ হাদীসটি দুনিয়ার কোনো কিতাবে আমরা খুঁজে পাইনি। (হিদায়া ৪র্থ খণ্ড, ৪৩৮ পৃ. ঐ-৪৩৯ পৃ. টীকায় আদদিরায়াহ এবং নাসবুর রায়াহ ৪র্থ খণ্ড, ৮৮)

২৩. কুরবানীর পশুর কসাইয়ের পারিশ্রমিকের বিধান

আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কুরবানীর কোন কিছু থেকেই যেন আমি কসাইকে মজুরি হিসেবে না দেই।। তিনি আরো বলেন, তাই আমরা নিজেদের কাছ থেকে তা দিতাম। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৩২ পৃ: ও বুলূগুল মারাম ১০২ পৃ:) অর্থাৎ কুরবানীর গোশ্ত চামড়া বা অন্য কিছুর দ্বারা কসাইয়ের মজুরি না দিয়ে আলাদাভাবে তার দাম দিতে হবে। কিন্তু হ্যাঁ, তাকে যদি তুহ্ফা হিসেবে কিছু গোশত্ খেতে দেয়া হয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

২৪. একই জন্তুর ভাগাভাগির কুরবানী ও আকীকা চলে কি?

পৃথিবীর কোনো সহীহ বা য'ইফ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম অথবা তাবিয়ীনে ইমাম প্রমুখদের কেউই একটি গরু বা উটের সাতভাগের কয়েকভাগ কুরবানী এবং কয়েকভাগ বা একভাগ বা দুভাগ আকিকা দিয়েছেন। একটি উট বা গরু ৭ জনের পক্ষ থেকে আকীকাহ দেরা যাবে কি-না –এ সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কাইয়্যুম লিখেছেন, একটি মাথা কেবলমাত্র একটি মাথারই পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

ইমাম খাল্লান তদীয় জামীআ গ্রন্থে বলেন, আমাকে আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল হামীদ সংবাদ দিয়েছেন যে, একদা তিনি আবু আব্দুল্লাহকে (ইমাম আহমদকে) জিজ্ঞেস করেন, উট দিয়ে আকিকাহ হবে কী? তিনি বলেন, রাইস উট দিয়ে আকিকাহ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট আকীকাহ হবে কি? তিনি বললেন, আমি ঐ ব্যাপারে কিছু শুনিনি। অর্থাৎ, কোনো হাদীস পাইনি। অতঃপর হাফিয ইবনুল কাইয়্যুম মন্তব্য করেছেন যে, কুরবানী এবং হাদিতে ভাগাভাগি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। কিন্তু আকীকাহর ব্যাপারে তিনি ﷺ ছেলের পক্ষ থেকে দুটি স্বতন্ত্র খুনের বিধান দিয়েছেন। যার বিকল্প একটি উট কিংবা গরু হতে পারে না। আকীকাতে একটি প্রাণের মুক্তিপণে একটি পূর্ণাঙ্গ খুনই শরিয়তের বিধান। অতএব এখানে যদি ভাগাভাগি সঠিক হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহের উদ্দেশ্যে নষ্ট হয়ে যায়। তাই একই জন্তুর ভাগাভাগিতে কুরবানী এবং আকীকাহ দুটি একসাথে জায়েয নয়। (তুহ্ফাতুল মওদূদ বিআহ্কামিল মওলূদ ৪৭ পৃ:)

ইমাম আহমাদের পুত্র 'আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি আমার পিতাকে ঈদুল আযহার দিনে আকীকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, ঐ দিনে একই সাথে

কুরবানী এবং আকীকা করা যাবে কি–না? তিনি বললেন, হয়তো তা কুরবানী, কিংবা আকীকা। অর্থাৎ– একটিই হবে। (ঐ–৫০ পৃ.)

ইমাম ইবনে হাযম বলেন, বকরী ও দুম্বা ব্যতীত উট ও গরু দ্বারা আকীকা শুদ্ধ নয়। (আল-মুহাল্লা ৭ম খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা)

তাই তাঁর মতেও একই জন্তুতে ভাগাভাগি করে কুরবানী ও আকীকা দুই হবে না। এজন্য হাম্বলী এবং আহলে হাদীসদের মতে একই জন্তুতে কুরবানী ও আকীকাহ বৈধ নয়।

কিন্তু হানাফী ফিক্‌হ 'নাওয়াদিরুয যাহায়া'-তে ইমাম মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ কুরবানীর জন্তুতে আকীকার ভাগ দেয় তা জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহ) রকমারী ভাগাভাগিকে মাকরূহ মনে করেন এবং তিনি বলেন যে, ঐ ভাগাভাগি যদি একই রকমের হয় তাহলে আমার কাছে তা অধিকতর পছন্দনীয়। (ফাতাওয়া আলমগীর ৪র্থ, ৮৪ পৃ:)

মাও: আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, কুরবানীর গরুতে ছেলের আকীকার জন্য দু'ভাগ এবং মেয়ের জন্য একভাগ নিয়ে নেবে। (বেহেশতী যেওর ৩য় খণ্ড, ৪২)

হানাফী ফকীহদের উক্ত ফতওয়া কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়; বরং তা হলো তাদের ব্যক্তিগত বিবেক প্রসূত। তাই আহলে হাদীসেরা এই ফতওয়া গ্রহণ করে না।

২৫. যিলহজ্জ সম্পর্কে মনগড়া ফযিলত

এই মাসের ১ তারিখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআত সূরা ইখলাস ২৫ বার। এতে অগণিত সাওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের সালাতের পর ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা কাওসার ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে মাকামে ইল্লীন' (?) লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দীনার সদকা করার সাওয়াব লাভ করা যায়!

তবে এগুলো কেবল মনগড়া বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের আল কুরআন হাদীসের কোথায় উল্লেখ আছে এবং তার মান কি? যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন–

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা না জান, তাহলে বিজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করে নাও দলীল-প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। (সূরা নাহল : আয়াত-৪৩-৪৪)

তাই এ ধরনের আমলের বিশুদ্ধতা যাচাই করা উচিৎ।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রচলিত দিবস যা ইসলাম স্বীকৃত নয়

রাসূল ﷺ যা করেননি আমরা তা করি

১. মুখে ভাত

অন্নপ্রাশনের অনুকরণে বহু নামধারী মুসলিম পরিবারও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুখে প্রথম ভাত দেয়ার জন্য জাঁকজমক অনুষ্ঠান করে থাকে। আয়োজন থাকে নানা ধরনের খাবারের। নির্দিষ্ট আচার পালন করে উপস্থিত সকলে একে একে শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয় এবং সে সাথে সমালোচনা করা হয়।

এই অবসরে অনেকে প্রচলিত মীলাদও পড়িয়ে থাকে। সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এটি বিজাতির অনুকরণে একটি জঘন্য বিদআত।

২. জন্মদিন

শিশুর জন্মদিন (হ্যাপি বার্থ ডে) পালন করা এবং সেদিনে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব মিলিত হয়ে কোনো উৎসব উদযাপন করা, সেদিনে শিশু (বা বুড়ো) কে বিশেষ দুআ, সালাম বা উপহার পেশ করা, বয়স অনুসারে বছর গুনতি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ফুঁ দিয়ে নিভানো। অতঃপর কেক কেটে খাওয়া প্রভৃতি বিধর্মীয় প্রথা, মুসলমানদের জন্য তা বৈধ নয়। বৈধ নয় এ উপলক্ষ্যে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করাও। বৈধ নয় সে উপলক্ষ্যে এ শিশুকে দুআ, মুবারকবাদ ও উপহার দেয়া।

(ফাতাহওয়া ইসলমিয়্যাহ ১/৮৭, ১১৫, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০২)

নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্নাত; ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সুন্নাত। ইসলাম ও নবীর সুন্নাত বর্জন করে বিজাতির সুন্নাত অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য বড়ই ধিক্কার ও ন্যাক্কারজনক।

প্রিয় নবী সত্যই বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নাত অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনটি তারা যদি গো-সাপের (সাণ্ডা) গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইহুদী ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" (বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুরূপ অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" (আহমদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)

তিনি আরো বলেন, "সে ব্যক্তি আমরা দলভুক্ত নয়, যে আমাদেরকে ত্যাগ করে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রীস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"

(তিরমিযী ২৬৯৫ নংম, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪ নং)

এছাড়া জন্মদিনের খুশী ও উৎসব করা অত্যান্ত বোকামী। জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা উচিত, খুশী নয়।

লৌকিকতার সাথে উপহার-সামগ্রীর প্রত্যাশা। আশা ভঙ্গ হলে নানা আলোচনা সমালোচনা।

তদানুরূপ বৈধ নয় বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী অথবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা। প্রথমতঃ আমাদের শরীয়তে তা পালন করার কোনো বিধান নেই। ইসলামে কত লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ীন, আয়িম্মা, মুহাদ্দেসীন, মুফাসসেরীন, আউলিয়া, শায়খুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস, রাজা-বাদশা ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তাঁদের কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস পালন করা হয়নি পূর্ববর্তীদের যুগে।

আর দ্বিতীয়তঃ তা পালন করতে হলে প্রায় প্রত্যহ কারো না কারো জন্মদিন পালন করে আনন্দ ও শোক এবং হাসি ও কান্না উভয়ই প্রকাশ করতে হবে। আর সেই সাথে বছরের প্রায় সকল দিনগুলোতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে কাজ বন্ধ করে সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

অতএব মহান ব্যক্তিবর্গের মহান চরিত্র ও কার্যবলী নিয়ে আমরা তাঁদেরকে স্মরণ করব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের মহান স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত রাখব আমাদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমেই। আর তাঁদের স্মৃতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে রাখব না। এই সংকল্পই হওয়া উচিত প্রত্যেকটি কর্মপ্রিয় খাঁটি মুসলিমের।

৩. মৃত ব্যক্তির বাড়ির ভোজ

মরা-বাড়ির পক্ষ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনকে (অলীমার মতো) দাওয়াত দেয়া এবং আত্মীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। বরং তা বড় বিদআত। ১৫৩ (মু'জামুল বিদা ১৬৩ পৃঃ) বিধেয় হলো কোনো আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মরা-বাড়ির লোকেদের জন্যই পেট ভরার মতো খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর বলেন, জা'ফর (রা) শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে খবর পৌঁছল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "জা'ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খাদ্য প্রস্তুত কর। কারণ, তাদের নিকট এমন সংবাদ পৌঁছেছে; যা তাদেরকে বিভোর করে রাখবে।" (আবূ দাউদ ৩১৩২, তিরমিযী ৯৯৮, ইবনে মাজাহ ১৬১০)

সাহাবী জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, 'দাফনের পর মরা বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের একত্রিত আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসেবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।)

(আহমদ ৬৯০৫, ইবনে মাজাহ ১৬১২, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮)

কিন্তু যে সমাজে সে সহানুভূতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াতি কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দূরবর্তী মেহমানদের (যাদের সেদিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের) জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ, গোশতের ভোজবাজিতে আত্মীয় স্বজন, জানাযার কর্মী মাদ্রাসার স্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়া-প্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তা পরমানন্দে খাঁওয়ানোও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কম হলে দুর্নাম করতেও কসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলি যুগ থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

মুসনাদে আহমদের (৫/২৯৩) এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একদা মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ এক জানাযার কাজ সেরে ফিরে এলে কুরাইশের এক মহিলা তাঁদেরকে একটি ছাগল যবাই করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার সাথে মরা বাড়িতে ভোজ করার বা খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যেহেতু সে মহিলা ঐ মৃতব্যক্তির কেউ ছিল না; বরং ঐ সময় দাওয়াত হয়েছিল বলে হাদীসে তার উল্লেখ এসেছে। অতএব উক্ত হাদীস থেকে পেটপূজারীদের দলীল গ্রহণ করা বা একপাত খাওয়ার জন্য ঐ হাদীসকে দলীল স্বরূপ পেশ করা সত্যিই হাস্যকর।

৪. মৃত্যু-বার্ষিকী

কেউ মারা গেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক, তার স্মরণে প্রত্যেক বছর তার মৃত্যু-তারিখে কোনো স্মরণ-সভা, শোক-দিবস, দুআ-মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ঈসালে-সাওয়াব, উরস-উৎসব, মৃত্যু-বার্ষিকী, ভোজ-আয়োজন ইত্যাদি বিদআত। ঈসালে সাওয়াব করতে হলে শরীয়তসম্মত পন্থাতেই করতে হবে। নচেৎ সাওয়াব ঈসাল হবে না।

কারো স্মরণ তাজা করতে হলে তাতে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখতে হবে এবং শরীয়তের অনুমোদন থাকতে হবে। নচেৎ হিতেবিপরীত হলে ফল কি?

মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা বৈধ হলে আল্লাহর রাসূল (রা)-এর মৃত্যু তারিখে তা পালন করা বিধেয় হতো এবং তিনি খোদ সাহাবা (রা)-কে এ বিষয়ে কোনো না কোনো নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়ে যেতেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি বুযুর্গদের জন্ম ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করি, তাহলে বছরের প্রায় প্রত্যেকটি দিন এক একটি পর্বে পরিণত হয়ে যাবে। আর বর্তমান প্রথায় তা পালন করতে করতে প্রায় প্রত্যেক দিনই হালুয়া-রুটি, মীলাদ- মাহফিল, শোক অথবা আনন্দ, ছুটি ও বন্ধ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। তাহলে তা কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে?

আমাদেরকে স্মরণীয় বিষয় স্মরণ করতে হবে। বরণীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় সম্পর্কে সচেষ্ট হলে তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব। নচেৎ তাঁদের নামে সিন্নী-মিঠাই বিতরণ করে, ধূপ-মোমবাতি জ্বেলে, ফুল চড়িয়ে মীলাদ-মাহফিল বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান পালন করে আমাদের লোকসান ব্যতীত কোনো লাভ হবে না।

৪. চাহারাম

মৃত ব্যক্তির যে স্থানে দম যায় সেই স্থানে কয়েকদিন ধরে রূহ ঘুরাফিরা বা যাতায়াত করে এমন ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিদআত ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই অলীক ধারণা মতে সে স্থানে কয়েকদিন যাবৎ মাটি লেপা, বাতি জ্বালানো, ধূপধুনো দেয়া এবং মৃত্যুর চতুর্থ দিনে অথবা আগেপিছে কোনো দিন নির্দিষ্ট করে হুজুর ডেকে মীলাদ পড়ে গোশত-ভাত বা মিষ্টি-মিঠাই বিতরণ করে রূহ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় অনেক বাড়িতে। এই আচার ও অনুষ্ঠান 'চাহারাম' নামে পরিচিত। বিদআতের সংজ্ঞার্থ যারা জানেন, তাঁরা জানেন যে, এ অনুষ্ঠানটিও বিদআত। যেহেতু এটি অমূলক ধারণাবশতঃ কৃত এমন একটি আচার, যার কোনো প্রকার সমর্থন শরীয়তে পাওয়া যায় না।

৫. চালশে (চেহলাম)

কোনো আত্মীয়ের মৃত্যুর চল্লিশতম দিনে তার নামে ভোজ-অনুষ্ঠান, মীলাদ-পাঠ বা দুআ-মজলিস করা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদন নেই। তাই ইসলামের নামে এ সব করা সম্পূর্ণ বিদআত। আসলে এ প্রথাও কিন্তু বিজাতীয় প্রথা। (আমেরিকার) ইহুদী ও খ্রিস্টানরা অনুরূপ প্রথা ঐ দিনেই পালন করে থাকে। যেমন পুরনো যুগে মিসরীয় কাফেররা উক্ত প্রথা যথাযথ পালন করত।

বলা বাহুল্য যে, মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য তার মৃত্যুর দিন কিংবা এক সপ্তাহ পর অথবা ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ দিন অথবা বছর পার হলে কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা বিদআত।(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২০-১২১)

বলা বাহুল্য যে, আনুষ্ঠানিকভাবে দুআ করে অথবা বিরাট ভোজ-অনুষ্ঠান করে কোনো ফায়েদা নেই। তাতে যদি সমাজের কাছে নাম নেয়ার কিংবা বদনাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে তো মৃত ব্যক্তির কোনো কল্যাণই সাধিত হবে না। হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার পরলোকগত বাপ, মা বা অন্য কোনো আত্মীয়ের সত্যই কল্যাণ কামনা করেন, তাহলে আপনি তাই করুন, যাতে সত্যই কল্যাণ আছে। আর যাতে কল্যাণ লাভ হবে তা জানতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে।

আপনি আপনার আত্মীয়র জন্য দুআ করুন। বিশেষ করে ফরয সালাতের পশ্চাতে সালাম ফিরার আগে ও তাহাজ্জুদে তার জন্য দুআ করতে ভুল করবেন না। আপনার মা-বাপের জন্য আপনি নিজে দুআ করুন। আপনার মা বাপের জন্য আপনার মতো দরদ কি অন্যকারো হতে পারে? আপনার মতো আর কারো দুআতে কি সে আন্তরিকতার ভরসা করতে পারেন? আর জেনে রাখুন যে, দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে দুআ তার উপকারে আসবে। কুরআন মাজীদে মৃত্যে ব্যক্তির জন্য দুআ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(সূরা হাশর : আয়াত-১০)

প্রিয় নবী ﷺ ও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানাযার সালাত ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ। যার প্রায় সবটাই মাইয়্যেতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরন্তু মহানবী ﷺ এ কথাও বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির কোনো ভাইয়ের জন্য তার অদৃশ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। যখনই দুআকারী তার (অদৃশ্য বা অনুপস্থিত) ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফেরেশতা বলেন, 'আমীন। আর তোমরা জন্যও অনুরূপ।" (মুসলিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪ নং প্রমুখ)

আপনার আত্মীয়ের আপনিই অভিভাবক বা ওয়ারেস হলে এবং সে নযর-মানা রোযা রেখে মারা গেলে আপনি তার পক্ষ থেকে কাযা রেখে দেন, তার সাওয়াব তার উপকারে আসবে।

প্রিয় রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।"

(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭ নং, প্রমুখ)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা তাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকি থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। কাজেই তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা কাযা করে দাও।"

(আবু দাউদ ৩৩০৮ নং, আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)

রমযানের রোযা কাযা রেখে মারা গেলে তার বিনিময়ে আপনি ফিদিয়া (প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি মিসকীনকে একদিনের খাদ্য অথবা ১ কিলো ২৫০ গ্রাম করে চাল) দিন। তার সাওয়াবও মাইয়্যেতের জন্য উপকারী।

জনৈক সাহাবীর মা রমযানের রোযা বাকি রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে কাযা করে দেবে কি?" আয়েশা (রা) বললেন, 'না'। বরং তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১ কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকা করে দাও।' (ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার পক্ষ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকি রেখে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক (ওয়ায়েস) রোযা রাখবে।' (আবু দাউদ ২৪০১ নং প্রমুখ)

আপনার আত্মীয় হজ করার নযর মেনে মারা গেলে, অথবা হজ ফরয হওয়ার পর কোনো ওযরে না করে মারা গেলে আপনি (নিজের ফরয হজ আগে পালন করে থাকলে) তার পক্ষ থেকে তা পালন করে দিন। এর সাওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ করার মান্নত করে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী করীম ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকি থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" (বুখারী ৬৬৯৯)

অনুরূপ এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা অতি বৃদ্ধ। তার ফরয হজ বাকি আছে। এখন সাওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দেব? নবী করীম ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।' তাই কর।" (মুসলিম ১৩৩৪-১৩৩৫ নং প্রমুখ)

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ না করে মারা গেছে তার পক্ষ থেকে হজ আদায় কোনো কাজে দেবে না।

(আহকামুল জানাইয ১৭১ পৃঃ টীকা)

আপনি বেশি বেশি নেক কাজ করুন, তাহলে আপনার মৃত পিতামাতাও উপকৃত হবেন। কারণ, মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব লাভ হয় না তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সাওয়াবও মোটেই কমতি হয় না। কারণ, সন্তান হলো পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত সম্পদের ন্যায়।

আর আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ـ

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায়; যা সে করে। (সূরা নাজম : আয়াত-৩৯)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "মানুষ সবচেয়ে হালাল বস্তু যেটা ভক্ষণ করে তা হলো তার নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য। আর তার সন্তান হলো তার নিজ উপার্জিত ধনস্বরূপ।" (আবূ দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪ ইবনে মাজাহ ২১৩৭ প্রমুখ)

তাই সন্তান যদি তার পিতা-মাতার নামে দান করে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করেন তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?" নবী করীম ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকা করলাম।' (বুখারী ২৭৫৬ প্রমুখ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আস ইবনে ওয়াইল সাহমী তার পক্ষ থেকে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। অতএব তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আমর বাকি ৫০টি দাসী মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, 'বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে। তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি

নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকি ৫০টি দাস তার পক্ষ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকা করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সাওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" (আবু দাউদ ২৮৮৩ নং, বাইহাকী ৬/২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪)

তবে হ্যাঁ, দান খয়রাত করার বা মিসকীন খাওয়ানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ বা মজলিস করবেন না, অথবা তাতে নাম নেয়ার আশা পোষণ করবেন না। নচেৎ ভিক্ষার আপনার আত্মীয়ের কোন কাজ হবে না। বলা বাহুল্য, উত্তম হলো গোপনে দান করা। যাতে আপনি মনের ঐ প্রশংসা-বাসনা থেকে দূরে থাকতে পারেন। এ ছাড়া মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া স্বীকৃত প্রবাহমান ইচ্ছাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, কল-কূঁয়া প্রভৃতি তৈরি, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে- সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যজগতেও ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ۔

উচ্চারণ : ইন্না-নাহ্‌নু নুহ্‌য়িল্ মাওতা অনাকতুবু মা-ক্বদ্দামূ ওয়া আসা-রাহুম অকুল্লা শাইয়িন আহ্‌স্বইনা-হু ফী ইমা-মিম মুবীন।

অর্থাৎ, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিপিবদ্ধ রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন : আয়াত-১২)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ব্যতীত তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকায় জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্‌ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম ১৬৩১; আবু দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩ নং প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন, "মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হলো; এমন ইলম যা সে শিক্ষা করেছেন এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তানও মুসহাফ (কুরআন শরীফ) তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফিরখানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকা যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।" (ইবনে মাজাহ ২৪২ নং)

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে করে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ঈসালে সাওয়াব করবে তার ভরসা কোথায়?

পক্ষান্তরে শরীয়ত অনুমোদিত ছাড়া অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করলে তা বেসরকারি ডাকে প্রেরণ হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে তওবা করা, সালাত পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোনো মতেই ঈসাল বা 'রিসিভড' হবে না। (আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদ্যা' ১৩৫ পৃঃ)

পরিশেষে জেনে রাখা উচিত যে– নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও বেনামাযী, যারা কবরের আযাব ও জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না, তাদের নামে যদি কোনো শরীয়ত সম্মত ঈসালে সাওয়াব করা হয়, তাহলেও তা তাদের কোন কাজে আসবে না। সুতরাং বিদআতী ঈসালে সাওয়াব, কুরআন-খতম, ফাতিহাখানী, কুলখানী, চালশে, চাহারম, দুআ মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ভোজ অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কোনো কাজে আসতে পারে? যাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের ধর্মীয় আচার কেন? যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, তাদের পারলৌকিক কল্যাণ বা মুক্তির জন্য এ লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা কেন? এ সব আচার পালনের মাধ্যমে কেবল ছেলেদের বদনাম থেকে বাঁচার, অথবা নাম নেয়ার, অথবা সামাজিক ও প্রথাগত কর্তব্যভার হাল্কা করার, অথবা ভোট নেয়ার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না তো?

৬. ফাতেহা ও কুলখানী

কোনো প্রিয়জনের নামে, তার আত্মার কল্যাণের জন্য, তার পরকালে মুক্তি লাভের আশায় মরণের ৩ দিন পর অথবা অন্য কোনো দিনে হুজুর, মুন্সী, মুসল্লী দাওয়াত দিয়ে ঘরে এনে অথবা মসজিদ-মাদরাসায় ৭০ হাজার বার কালেমা ত্বাইয়েবা পাঠ বা ফাতিহাখানী অথবা কুলকানী করিয়ে মৃতের নামে ঈসালে সাওয়াব করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে বুট বা ছোলা দিয়ে একবার পড়া হলে একটি করে ছোলা সরিয়ে রাখা হয়। সবশেষে থাকে মুনাজাত ও খানাপিনার ব্যবস্থা।

ঈসালে সওয়াবের এমন পদ্ধতি যেহেতু মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের যুগে ছিল না, সেহেতু তা বিদআত বিধায় তা একান্ত বর্জনীয়।

৭. শবীনা ও কুরআনখানী

বহু মুসলমান কর্তৃক বরকত ও সাওয়াবের আশায় এক রাত্রি ব্যাপী কুরআন খতমের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হাফেয অথবা হুজুররা দেখে দেখেই খতম করে থাকেন। কোনো কোনো মজলিসে এক এক হাফেয বা মৌলবী সাহেবকে কুরআন মাজীদের অংশ ভাগ করে তা পাঠ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কেউ কেউ কিছু অংশ পড়ে কিছু অংশ বাদ দিয়ে নিজের ভাগ শেষ করে থাকেন।

মাইকযোগে সারা রাত ঝড়ের গতিতে কুরআনখানী চলে। কয়জন আল্লাহর বান্দাই বা তা যথোচিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে? অতিরিক্ত শব্দে বহু মানুষের কাছে কুরআন অবহেলিত হয়। অনেকের অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাড়ায়। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে, রোগ-পীড়িত মানুষের মনে আঘাত লাগে, আরাম ও ঘুম জরুরি এমন মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে, অমুসলিমদের মনে সৃষ্টি করে বিতৃষ্ণা। সত্যই তো যে বাণী বুঝাই যায় না, সে বাণীর প্রতি কর্ণপাত করবে কয়জন?

খতম শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ হয়। খাওয়া-দাওয়ার ধুমও থাকে বেশ জোরালো। এতে যা খরচ হয়, তা একেবারেই কম নয়। কিন্তু এ সব তো করা হয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তবে হয়তো বা খতমদাতা জানে না যে, সত্যপক্ষে এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। যেহেতু এ কাজ তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী হয় না তাই। ভাড়াটিয়া হাফেয-হুজুরদের এ কুরআনখানীতে কোনো সাওয়াবও নেই; না তাঁদের, না খতমদাতার। কারণ, তাঁরা পড়েন কিছু রোজগারের জন্য। আর খতমদাতার সওয়াব হয় না, যেহেতু তা বিদআত।
(মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৩০৪)

যে হাফেয বা হুজুরদেরকে নিয়ে খতম পড়ানো হয়, কিন্তু তাঁরা তো কোনোদিন ঐরকম খতম পড়ান না। যাঁরা মীলাদ পড়ে অর্থ উপার্জন করে বেড়ান, কিন্তু তাঁরা তো কোনোদিন খরচ করে মীলাদ পড়ান না? নাকি শিষ্যের ঘরের চালে কাক বসে শিষ্যের পাপের কারণে। আর গুরুর ঘরের চালে কাক বসে কাকের পাপ ক্ষয় করার জন্য, বুদ্ধিমান মানুষরা বুঝে না কেন?

অনেকে ফাতেহাখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি করে তার সাওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আম্বিয়াদের নামে) বখশিয়ে দেয়া– যাঁরা সাওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও নিষ্ফল ব্যতীত কিছু নয়?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করলে তা বেসরকারি ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের পক্ষ

থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোনো মতেই ঈসাল বা 'কবুল' হবে না।

(আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫ পৃঃ)

ভাড়াটিয়া কারীর কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, কুলখানী, শবিনাখানী, চালসে চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় তা সমস্ত বিদআত। এসব মৃতের কোনো কাজে আসে না। উপরন্তু মৃত ব্যক্তির যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশরিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। (সূরা তাওবাহ : আয়াত-১১৩)

মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেব মাআরিফুল কুরআনে বলেন, 'ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয।

আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহ্গণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান-ব্যবস্থার মূল্যে আঘাত আসবে। কাজেই এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্তই অবশ্যক। এ জন্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃত্যের ঈসালে-সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়া-কালাম বা অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে।

বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোনো সাওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত।

(তফসীর মাআরিফুল কুরআন, বাংলা অনূদিত সউদী আরব ছাপা ৩৫ পৃঃ)

৮. উরস-উৎসব

আল্লাহর অলী আল্লাহর বন্ধু। তাঁরা আল্লাহর সাথে শিরক অবশ্যই পছন্দ করেন না, করতে পারেন না। তাঁরা শিরক সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোনো শিরক হোক তা তাঁরা কোনোক্রমেই চাইতে পারেন না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, মানুষ তাঁদেরকে ভুল বোঝে এবং তাঁদেরকে নিয়ে তাই শুরু করে দেয়, তা তাঁরা তাঁদেরকে পছন্দ করেন না; পছন্দ করেন না তাঁদের একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ।

মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। মধ্যজগতে না কোনো নামায থাকে, না কোন দুআ। আর না থাকে সে জগতের মানুষের সাথে এ জগতের মানুষের কোনো সম্পর্ক। আউলিয়া হলেও তাঁরা সে জগৎ থেকে এ জগতের কোনো আহ্বান শুনতে পান না; পারেন না কারো আহবানে সাড়া দিতে। তবুও মানুষ নিজের প্রয়োজনে সরাসরি মহান প্রতিপালক ও একক মা'বূদকে না ডেকে কোনো অলীকে মাধ্যম করে; এ মনে করে যে তিনি আর দুআ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সে ধারণা যে আদৌ সঠিক নয় তা মাত্র অল্প লোকেই বোঝে।

আল্লাহকে ভুল বুঝে এবং তাঁর আউলিয়াদের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে লোকে তাঁদের কবরের কাছে একত্রিত হয়। বৎসরান্তে একবার সেখানে বড় ভক্তি ও আগ্রহের সাথে ভক্তরা নিজ নিজ নযর-নিয়ায ও হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা করা হয়। মহাঘটা ও সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয় উরস-উৎসব।

উরসে ঐ কবর যিয়ারতে অতীব পুণ্যলাভ হওয়ার আশা করে লোকে, "করযে আম' অর্জন করার আশা পোষণ করে, নফল রোযা রেখে মাযার যিয়ারত করে।

উৎসব-মুখর ঐ স্থানে মেলা বসে! আল্লাহর আউলিয়া যা পছন্দ করেন না তাই হয় সেখানে। কোনো কোনো উরস-মেলায় গান-বাজনা হয়, নাটক যাত্রা, সিনেমা, সার্কাস এবং আরো অন্যান্য চিত্তরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ঘটে। প্রদর্শিত হয় নারীর সেই রূপ ও সৌন্দর্য যা দেখা ও দেখানো অবৈধ।

শিরক-বিদআত ও কাবীরা গুনাহ পরিবেষ্টিত এমন পরিবেশ কি আল্লাহর কোনো অলী পছন্দ করতে পারেন?

তবুও এমন শিরকী ও বিদআতী মেলায় অংশগ্রহণ করে বহু ভক্ত অর্থ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় সেই ভক্তদের দেখে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ

উপার্জন করে তা নিজের মা-বাপ ও স্ত্রী-পরিজনের উপর খরচ না করে লুটিয়ে আসে ঐ পাপের মেলায়। আর সেই সাথে শিরক, বিদআত তথা কবীরা গুনাহের মতো 'ফরয' তরক করে পাথেয় হাসিল ও সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে।

দূর-দূরান্ত থেকে এক এক আশা নিয়ে লোকেরা অলীর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে; অথচ তা ইসলামে বৈধ নয়। বৈধ নয় কোনো কিছু কেনা-বেচার জন্যও এমন মেলায় উপস্থিত হওয়া।

'উরস' কথাটি আরবি হলেও তার আসল অর্থ বিবাহ-অনুষ্ঠান ও তার ভোজ-উৎসব। কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা তাকে নৈবেদ্য চড়ানো অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহার করে বাৎসরিক মেলার আয়োজন করে অলীর নামে নৈবেদ্য চড়িয়ে থাকে। আর সে সাথে 'উরস মুবারক' বা 'উরস পাক' নামকরণ করে তাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দান করা হয়। অথচ ধর্মের সাথে এ অনুষ্ঠানের নিকট অথবা দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

৯. ফাতিহা-ই-ইয়াযদহম

শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উপলক্ষ্যে এই দিন পালিত হয়। ফরাসী ভাষায় 'ইয়াযদহম' মানে ১১তম। যেহেতু রবিউস সানী মাসের ১১ তারিখে তাঁর ওফাত হয় সে জন্য এই দিনটিকে 'ফাতিহা ইয়াদহম' নামে স্মরণ ও পালন করা হয়। ১১ তারিখের রাতে তাঁর নামে কুরআন-খতম ও মীলাদ -মাহফিল করে লোকেরা 'ফয়েজ' অর্জন করে থাকে।

আমরা জানি যে, ইসলামে ব্যক্তিপূজার কোনো স্থান নেই। মহানবী ﷺ-এর জন্ম মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। সুতরাং তাঁর পরে আর কার জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিধেয় হতে পারে? তাছাড়া তাঁর নামে যা করা হয় তাও তো বিদআত। বলা বাহুল্য, ঐ দিনে ছুটি ঘোষণা বা কাজ-কর্ম বন্ধ করে হালুয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ করা শরীয়তসম্মত কাজ নয়।

১০. ফাতিহা-ই-দোয়াজ-দহম

ইসলামী দুনিয়ায় রবিউল আউয়ালের বারো তারিখটি ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম নামে বিশেষভাবে পরিচিতি। ফাতিহা আরবি শব্দ। এর অর্থ দোয়া করা, সাওয়াব রেসানী করা, মোনাজাত করা। আর দোয়াজ-দহম ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বারো। সুতরাং ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম বাক্যটির সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে, বার তারিখের দোয়া, মোনাজাত বা সাওয়াব রেসানী। প্রকাশ থাকে যে, এখানে বারো বলতে রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই

দিন কুরআনখানি করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা, নফল ইবাদত-বন্দেগী করা, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা, রাসূলের কর্ম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা, রাসূল ﷺ-এর চরিত্র ও আদর্শ বর্ণনা করা, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং এগুলোর সাওয়াব রাসূল ﷺ-এর পবিত্র রূহের উপর বখশে দেয়া প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করা হয়ে থাকে।

আরবি ভাষায় 'রবিউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে বসন্ত, সঞ্জীবনী, সবুজের সমারোহ। রবিউল আউয়াল বলতে প্রথম সঞ্জীবনের মাস বুঝায়। কারণ মক্কার কাফের কোরাইশ সম্প্রদায় অনাবৃষ্টি ও অভাবের কালে কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিল। যে বছর রাসূলে করীম ﷺ মা আমেনার গর্ভে তাশরীফ আনয়ন করলেন, সেই বছর মক্কার উস্ক শুষ্ক মরুভূমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। শুষ্কবৃক্ষ তরতাজা ও ফুল-ফলে ভরে গেল। চতুর্দিকে একটা শান্তির অমীয় বাণী ও আনন্দের ধারা বয়ে যেতে লাগল। মক্কার কোরাইশেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এ বছরকে নাম দিয়েছিল খুশি, আনন্দ এবং সঞ্জীবনের বছর। সর্বোপরি রবিউল আউয়ালের সে সঞ্জীবনের ধারা নিয়ে পৃথিবীর বক্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ। সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের নিকট ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম এত প্রিয় ও সম্মানিত দিন। এ দিবসটি সম্মানিত ঠিক, কিন্তু এটাকে ইবাদাত বলে এ উপলক্ষে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

১১. মুসলমানি (খাৎনা) উৎসব

ইসলামে মুসলিম শিশুর খাৎনা বা মুসলমানি (লিঙ্গত্বকচ্ছেদ) করা বিধেয়। এতে বহু যৌনরোগের হাত থেকে মুক্তির উপায় রয়েছে। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি। তারই উপর রয়েছে ইসলামের সুন্দর স্বাস্থ্যবিধান।

তবে যে লিঙ্গত্বকহীন অবস্থায় জন্মেছে, তার খাৎনা নেই এবং তার লিঙ্গের উপরে ক্ষুর বা চাকু বুলানো অথবা পান কাটা ইত্যাদি আচার বিধেয় নয়; বরং তা অতিরিক্ত বিদআত কাজ। তবে বাড়তি ঐ চামড়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা কেটে ফেলা দরকার। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশু খুব দুর্বল হয় অথবা কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খাৎনা করায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

খাৎনা করার কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই। তবে কৈশরের পূর্বে করাটাই উত্তম। যাতে বড় হয়ে লজ্জা স্থান দেখাতে না হয়। আর এ জন্যই খাতনার সময় নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে বিয়ের মতো অনুষ্ঠান করে সকলের সামনে লিঙ্গত্বকে কাটা বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১২)

বৈধ নয় খাৎনার জন্য শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, উপহার নেয়া এবং সেই সাথে গান-বাজনা পটি মেয়েদের বাজনাসহ গীত গাওয়া, নাচা ও কাপ (নাটক) করা।

শিশুকে সুসজ্জিত করে রিক্সা পাল্কি বা ঘোড়ায় বসিয়ে পাড়া, গ্রাম বা শহর ঘুরানো এবং সে সাথে আলো ও গান-বাজনার সুব্যবস্থা করা, রঙ মাখামাখি করা, দিবারাত্রি মাইকে রেকর্ড বাজিয়ে সি-ডি অথবা ভিডিওর মাধ্যমে ফিলম প্রদর্শন মহল্লা বা গ্রামকে উৎসব-মুখর করে তোলা, কত লোকের সমস্যার ও কত লোকের ইবাদতের ক্ষতি করা, কত যুবক-যুবতীকে অবাধ-মেলামিশার সুযোগ করে দেয়া, ফ্লিম-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চরিত্রর কুলষিত করা অন্ততঃপক্ষে একজন পূর্ণ ঈমানদার মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

লজ্জাস্থানের এক টুকরো চামড়া কেটে ফেলার সময় গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতাই থাকা প্রয়োজন সকলের মনে। এর জন্য আনন্দ উৎসব করা সুরুচিপূর্ণ সভ্য পরিবেশের কাজ নয়। বাকি থাকল এ উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন ও মিসকীনদেরকে কেবল দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর কথা। যাঁরা দাওয়াত দেয়া ও খাওয়া জায়েয মনে করেন, তাঁরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কর্মকে দলীল মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেদের খাৎনার সময় ভেঁড়া যবাই করে খাইয়েছিলেন।(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১৭১৬০, ১৭১৬৪ নং)

পক্ষান্তরে খাৎনা বা মুসলমানী উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেয়া ও খাওয়া আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না বলে বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবী উসমান বিন আবুল আস। একদা তাঁকে খাৎনা-ভোজের দাওয়াত দেয়া হলে তিনি তা কবুল করতে অস্বীকার করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে খাৎনা-ভোজে হাযির হতাম না। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে এটাকে বৈধ মনে করতাম না। অতঃপর তিনি সে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করলেন। (আহমদ ৪/২১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)

আর এ জন্য বহু আলেম-ওলামা বলেন, খাৎনার দাওয়াত বিদআত। উলামা আহলে হাদীসের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, খাৎনা করার সময় যিয়ারত বিদআত।

(ফাতাওয়া আহলে হাদীস ২/৫৪৯)

বলা বাহুল্য যে, হুজুরদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঐ দিনে বা তার আগের দিনে নসীহত করা অথবা মীলাদ পড়া অতঃপর উদরপূর্তির অনুষ্ঠান করাও বিদআত।

১২. ব্যাঙের বিয়ে

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মাদারের বিয়ে দিয়ে থাকে এবং মাদারতলা নির্বাচিত করে মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করে সেখানে ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা করে থাকে! প্রতিবেশীর পরিবেশ দ্বারা তারা এতই প্রভাবান্বিত যে, তাদের পূজার আনন্দ দেখে আর লোভ সামলাতে না পেরে পূজার মৌসুম আবিষ্কার করে পূজার ধূম মাচিয়ে থাকে। (ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধর্মকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করে থাকে। আকাশে বৃষ্টি না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষেরা যেখানে নিজ প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে কেউ বা কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআ করে কান্নাকাটি করে, কেউবা ইস্তিগফার করে এবং অনেকেই ইস্তিস্কার নামায পড়ে থাকে। হাত দুটিকে খুব উঁচু করে তুলে সৃষ্টিকর্তা বৃষ্টিদাতার নিকটে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে থাকে। সেখানে ঐ শ্রেণীর মানুষেরা বৃষ্টির জন্য রাগী লোকের চুলো ভেঙ্গে আসে অথবা তার গায়ে ময়লা ফেলে দেয়। আর ভাবে যে, সে রেগে গালাগালি করলেই আকাশে মেঘ আসবে, বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে!

অনুরূপ নারী-পুরুষ একত্রে উপহাসের পাত্র-পাত্রীরা খেল খেললে, আপোসে রঙ কিংবা কাদা মাখামাখি করলে বৃষ্টি হবে মনে করে আর এক শ্রেণীর মূর্খ মানুষ।

অনেক মুশরিক জাহেল এরূপ ধারণা ও বিশ্বাস রাখে যে, কোলা ব্যাঙের বিয়ে দিলে আল্লাহ খুশী হয়ে বৃষ্টি দেবেন! আর সেই জাহেলী ধারণামতে ব্যাঙ ধরে তেল-হলুদ মাখিয়ে কাপড় পরিয়ে আলমতলায় বসিয়ে গীত বাজনা করে ক্ষীর খাওয়ায়! কোনো কোনো এলাকায় গাধা-গাধীর বিবাহও দেয়া হয়!

আসলে এই ফাঁকে তাদের আনন্দ করার একটি সুযোগ আর কি? কিন্তু আনন্দ করার অবকাশ তো অনাবৃষ্টির সময় নয়। এই সময়ে ধান হবে না এই আশঙ্কায় কত মানুষের চোখে ঘুম আসে না। আর এরা করে আমোদ-ফূর্তি! কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। কারো মোজ হয়, কেউ আমাশয় যায়।

এমন জাহেলী ও শির্কী আনন্দে কোনো মুসলিম শরীক হতে পারে না। না ঐ জাহেলদেরকে জায়গা দিয়ে, আর না কোনো প্রকার চাঁদা দিয়ে। বরং আল্লাহর আদেশমতে আপনিও বলুন–

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

উচ্চারণ : কুল জা-আল্ হাক্কু অযাহাক্বাল্ বা-ত্বিল ইন্নাল বা-ত্বিলা কা-না যহুক্বা।

অর্থাৎ, সত্য এসেছে মিথ্যার অবসান ঘটেছে নিশ্চয়ই মিথ্যার অবসান অনিবার্য।
(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

এমন মূর্খ স্ফূর্তিবাজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করুন। যেহেতু নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো গর্হিত (শরীয়ত বিরাধী) কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হলো সব চেয়ে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।"
(মুসলিম ৪৯ নং, আহমদ, আসহাবে সুনান)

১৩. ঘর উদ্বোধন

নতুন ঘর বানানোর পর ঘরে এসে খুশী হয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনকে ভোজ করে খাওয়ানো দোষের নয়। তাতে তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু নতুন ঘর উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে যদি ঘরের বরকত আনা হয়, অথবা সেখানে জিন বাস করতে পারে এই অশঙ্কায় মীলাদ পড়ে ঘর উদ্বোধন করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বিদআত।

অনুরূপ ঘরের বরকত নিশ্চিহ্ন দেখে অথবা কোন কল্পিত জ্বিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য খরচ করে ঘরের অথবা কোন কল্পিত জ্বিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য খরচ করে ঘরের কোণায় কোণায় মাটির ভাঁড়ের মধ্যে লোহার পেরেক পোঁতা, বাঁশ পুঁতে তার ডগায় আয়না লটকানো এবং দরজায় দরজায় তাবীয ছিটানো শিরক ও বিদআত। এই শিরক সাধারণতঃ ঈমান ও মনের দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে। এই শিরকে মানুষের কাজ হলেও তা মানসিকভাবে কাজের ফর দুষ্ট হয়। অর্থাৎ তার মন সেই বন্ধের প্রতি লটকে থেকে মনের মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হয়। আসলে কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না।

পক্ষান্তরে ঘর থেকে বরকতহীনতা ও জ্বিন দূর করার পদ্ধতি রয়েছে শরীয়তে। কিন্তু সমস্যা হলো, শরিয়তের বিধি-বিধান জেনে ও আমল করে খুব কমই।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : "তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারা পাঠ করা হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।" (মুসলিম ৭৮০)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি ফিতরার যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে "আয়াতুল কুরসী"

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ......

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এতে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরায়রা (রা) একথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "জেনে রেখো, ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। পরপর তিন রাত্রি তুমি কার সাথে কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরায়রা?" (আবু হুরায়রা বলেন,) আমি বললাম, 'না' (রাসূল ﷺ বললেন, "ও ছিল শয়তান!"

(বুখারী ৩২৭৫ নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই আয়াতই যথেষ্ট।"

(বুখারী-৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)

অন্যদিকে ঘরের বরকত নষ্ট করে থাকে নিজেরাই। ঘরের লোকে এমন কাজ করে, যাতে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হতে বাধা দেয়।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর (রহমতের) ফেশেতাগণ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।"

(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কাজেই মন থেকে দুর্বলতা ও সকল কুসংস্কার দূরীভূত করুন। ঘর থেকে দূর করুন সকল প্রকার বরকত দূরীভূতকারী বস্তু। আর সেই সাথে ব্যবহার করুন শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি। আল্লাহ আপনার গৃহ বরকতময় করে দেবেন, ঘরকে জ্বিনমুক্ত করবেন এবং আপনার মনকে করবেন রিকমুক্ত।

১৪. হানিমুন ও বিবাহ-বার্ষিকী

বিবাহ-বার্ষিকী বা বিবাহের তারিখে প্রত্যেক বছর দম্পতির নির্দিষ্ট আনন্দোৎসব পালন করা ইসলাম পরিপন্থী কর্ম পদ্ধতি। স্বামী-স্ত্রী সাজ-সজ্জার সাথে আনন্দ করা কোন দোষের কথা নয়। দোষ হলো নির্দিষ্ট করে বিবাহের দিনে প্রত্যেক বছর সেই প্রথা পালন করা, যা সাধারণতঃ বিজাতির।

তদানুরূপ হানিমুন পালন করার প্রথাও ইসলাম বহির্ভূত । যাতে বিবাহের পরবর্তী প্রথম সপ্তাহ (অথবা এক সপ্তাহেরও বেশি দিন) নব-দম্পতী আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে থেকে ছুটি উপভোগ করে; যাতে রয়েছে অস্বাভাবিক খরচ এবং অপব্যয়।

১৫. হালখাতা বা নতুন খাতা

অনেক মূর্খ মুসলিম ব্যবসায়ী মনে করে অথবা প্রতিবেশীর দেখাদেখি বিশ্বাস করে যে, দোকান খোলার সময় ধূপ-ধুনো দিলে, দাঁড়িপাল্লায় ও দরজায় পানি ছিটালে, প্রথম বিক্রয়ের টাকা কপালে ঠেকিয়ে সালাম করলে, দোকানে কোনো তাবীয, কুরআনের আয়াত, কারো মূর্তি অথবা ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলে দোকান ভালো চলবে বা ক্রেতা বেশি হবে।

অনেক দোকানদার বিভিন্ন বিষয়কে তার দোকান ও ব্যবসার জন্য অশুভ মনে করে থাকে; যেমন প্রথম ক্রেতা অমুক এলে সারাদিন ভালো যাবে না, প্রথমে দোকান খুলতেই বইনি না করে ধার দেয়া যাবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তদানুরূপ নববর্ষের শুরুতে 'হাল খাতা' বা 'নতুন খাতা' খোলার মাধ্যমে নববর্ষ উপযাপন করার সময় আমপাতা ও সিন্দুর দিয়ে দোকান সাজানো, মীলাদ পড়ানো, মিষ্টি বিতরণ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দোকানের বরকতের আশা অথবা অধিকাধিক বেচা-কেনার আশা শিরক ও বিদআত।

নিঃসেন্দেহে ঐ সকল কাজের মধ্যে শিরক ও বিদআত রয়েছে; যা কোনো মুসলিম করতে পারে না। তাছাড়া তা একটি বিজাতীয় প্রথামাত্র, তা পালন করতে বিজাতির মাঝে একাকার হওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মুসলিমের একমাত্র ভরসাস্থল তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা। তাঁরই কাছে রুযী চাওয়া উচিত এবং সকল আশা তাঁরই কাছে করা উচিত। আর নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নিজেকে অপমানিত করা উচিত নয় কোনো মুসলিমের।

যদি কেউ বলেন, 'এই অবসরে ধার-বাকি আদায় করা সুবিধা হয়, তাহলে আমরা বলব যে, এসব বলে সেই সুবিধা লাভের জন্য শিরক বা বিদআত তো করা যায় না। অবশ্যই আপনার অর্থের থেকে আপনার ঈমানের মূল্য অনেক বেশি। অন্য কোনো পার্থিব পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা খুঁজুন। অথবা কেবল বকেয়া টাকা তোলার উদ্দেশ্যে অন্য একটা দিন নির্দিষ্ট করে ধার শোধ নিয়ে মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ্ আপনার ব্যবসায় বরকত দিন। আমীন।

১৬. নবান্ন উৎসব

হৈমন্তী ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় নতুন চাল (নতুন চালের ভাত,) ওঁকে (পিঠা, ক্ষীর) খাওয়ার (ও বিতরণ করার) উৎসব কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটি একটি বিজাতীয় প্রথা।

পক্ষান্তরে ইসলামের নিয়ম হলো, নতুন ফল-ফসল দেখে একমাত্র রিযিক প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করা–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বা রিক লানা ফী সামরিনা, অবারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবারিকা লানা ফী সাইনা, অবারিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বরকত দান কর। (মুসলিম ১৩৭৩ নং)

কিন্তু আনন্দ উপভোগ করার মানসে বিজাতির প্রথাকে ভালো মনে করে পালন করে থাকে এমন উৎসব; যা সত্যই দুঃখজনক ও বেদনা দায়ক।

১৭. পৌষপার্বণ

এটি পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানতঃ নতূন চালের) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করার উৎসব। সুতরাং এ উৎসবে কোনো মুসলিমকে উৎসাহিত হতে দেখা এবং নিজ ঘরে নানা রকম পিঠা প্রস্তুত করে খেয়ে আনন্দবোধ করা আশ্চার্যের কথাই বটে। পৌষ মাসকে বিদায় দেয়ার মানসে শাঁক (শঙ্খ) বাহিয়ে শাঁকরাত পালন করে থাকে অনেক নামধারী মুসলমান। খুশী করার মানসে চোখ বন্ধ করে বিজাতির অনুকরণ কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

তাই বলে পিঠা খাওয়া যে মানা তা বলছি না। পিঠা তো যে কোনো দিনে খাওয়া যায়। তাহলে ঐ দিন কেন নির্দিষ্ট করা হয়?

১৮. জয়ন্তী বা জুবিলী

ফরাসী ভাষায় Jubile, ল্যাটিন ভাষায় Jubiaeus এবং হিব্রু ভাষায় Yobel এই তিনের অর্থ যা, ইংরেজি Jubilee অর্থও তাই। প্রামাণ্য ইংরেজি অভিধানে জুবেলী অর্থ করা হয়েছে The blastt of a trampet Blast অর্থ প্রবল বাত্যা,

ঝঞ্ঝা, বিস্ফোরণ। আর Trampet অর্থ ভেঁপু, ভেরীধ্বনী ইত্যাদি। আভিধানিক অর্থকে সামনে রেখে জুবিলী অর্থ হয়, মহোৎসব, মহা আনন্দ উৎসব ইত্যাদি।

রজব, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই–

১. **সিলভার জুবিলী বা রজত জয়ন্তী :** রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলোর প্রতি পঁচিশ বছর পর জাঁকজমকের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবের নাম তারা দিয়েছে, 'সিলভার জুবিলী।'

২. **গোল্ডেন জুবিলী, সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী :** পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইহুদী কর্তৃক পালনীয় একটি উৎসব বিশেষ। এ সময়ে তারা ক্রীতদাসদেরকে (দাসত্ব থেকে) এবং ঋণদাতাদের (ঋণ থেকে) মুক্ত করে পুণ্য লাভ করে। দ্বীন-দুঃখীদেরও দান করে থাকে।

   ইহুদীরা এ অনুষ্ঠানকে মনে করে পাপ মুক্তির অনুষ্ঠান, অন্যদিকে তারা এটাকে আনন্দ অনুষ্ঠানও মনে করে থাকে।

৩. **ডায়মণ্ড জুবেলী বা হীরক জয়ন্তী :** ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। প্রথমে এক শ্রেণীর খ্রিস্টান (সম্ভবতঃ প্রোটেস্টান্ট) যাদের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হতো, তারা হীরক জয়ন্তী পালন করত। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের বয়স ৬০ বছর হলে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। যে প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত তিনটি জুবেলী অনুষ্ঠানের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি রোমান ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠান, অপরটি ইহুদীদের অনুষ্ঠান, তৃতীয়টিও খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান। তিনটিরই উদ্ভব ঘটেছে ধর্মীয় উৎস থেকে। এ ছাড়া জয়ন্তীর উৎসও অন্য বিজাতি সম্প্রদায় থেকে আসা।

(শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল, জহুরী ৩২-৩৩ পৃঃ দ্রঃ)

জয়ন্তী মানে : পতাকা, ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি বা জন্মরাত্রি, যে কোনো ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব।

অতএব বলাই বাহুল্য যে, বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিমরা সে সব অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না।

১৯. স্বাধীনতা-দিবস

স্বাধীনতা-দিবস, জাতীয়-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, শহীদ-দিবস ইত্যাদি দিবস দেশাচার ও রাজনৈতিক ব্যাপার হলেও তাও এক শ্রেণীর জাতীয় ঈদ। আমরা ইচ্ছা করলেই কোনো ঈদ বা খুশীর দিন নিজেরা তৈরি করে নিতে পারি না। কেননা, আমাদের ইচ্ছা আমাদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে বাঁধা। আমরা মুসলিম অর্থাৎ (আল্লাহর নিকট) আত্মসম্পর্ণকারী। সুতরাং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিভাবে কোনো ঈদ বা খুশীর দিন আবিষ্কার করে নিতে পারি? তাঁর অনুমতি ও অনুমোদন না থাকলে আমাদের কোনো কিছুই করা ঠিক নয়।

এ সকল দিবস পালন করাতে কিছুই না থাকলেও বিজাতির অনুকরণ তো রয়েছেই। তাতে রয়েছে শরীয়ত-বিরোধী নানা কার্য-কলাপ ও অনুষ্ঠান মালা। সুতরাং এগুলোও বিদআত ও শরীয়ত-পরিপন্থী আনন্দ-দিবস।

(অফাদারী ২৮৭-২৮৭ দ্রঃ)

আপনি বলতে পারেন, এটা বিদআত, ওটা বিদআত, তাহলে সুন্নাত কোনটা? আনন্দ করার কি কোনো উপায় নেই ইসলামে?

সুন্নাত কোনটা সেটাই তো শিখতে বলছি আপনাকে। আপনার যা কিছু আছে তা অনেক কিছু। কিন্তু না জেনে পরের প্রথা পদ্ধতি আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে আনন্দ কেন আপনার? নিজ স্বকীয়তা বিকিয়ে অপরের সাথে একাকার হওয়ার মানে কি এই নয় যে, আপনি দুর্বল, আপনি অপরের অনুসরণকারী একজন গোলাম? সৃষ্টিকর্তার দেয়া দেহ-মন নিয়ে আনন্দ করবেন, তাতে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অনুমতি থাকতে হবে। এ কথা আপনি মানুন বা নাইবা মানুন।

আপনি বলেন বা না-ই বলেন। আপনি বলতে বাধ্য যে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

উচ্চারণ : ক্বুল্ ইন্না স্বলা-তী অনুসুকী অমাহ্ইয়া-ইয়া অমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামীন।

অর্থাৎ, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।

(সূরা আনআম : আয়াত-১৬২-১৬৩)

২০. সহস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) পালনের বিধান

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামে হিজরী ইসলামী মাস ও বছর তথা তারিখ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তা বাদ দিয়ে বিধর্মীদের তারিখ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছাড়া বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও হিজরী শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করার তরীকা ইসলামে নেই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, বিজাতির সাল, শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করে অথবা তাদের তা পালন করা দেখে তাদের সঙ্গ দিয়ে উৎসব ও আনন্দ করা বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে জিবরীন বলেন : কাফেরদের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। তাদের সাথে সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখার খাতিরেও ঐ সব নব আবিষ্কৃত অবৈধ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। আসমানী কিতাবসমূহে এবং আল্লাহর শরীয়তে এ ধরনের কার্য-কলাপ বৈধ হওয়ার কোনোই দলীল-প্রমাণ নেই; বরং এ হলো বিধর্মী খ্রিস্টানদের উদ্ভাবিত এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কার্যাবলি। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোনো অনুমতি নেই।

আর এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বিধর্মী-অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অনুষ্ঠান বা তাদের অন্য কোনো ঈদ-উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের আবিষ্কৃত অবৈধ কার্যকলাপে স্বীকৃতি ও সমর্থন তথা বিজাতির সম্মান প্রকাশ হয়ে থাকে। সুতরাং এ উপলক্ষে আয়োজিত কোনোরূপ অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তাদের নির্ধারিত উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন করে ঐ দিনটিকে বছরের অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ একটি দিন মনে করা এবং তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধারণা না রাখা।

ঈমানদারগণ তো ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দিনসমূহেই আনন্দ উপভোগ করে থাকে, পরস্পর শুভেচ্ছা (ও দুআ) বিনিময় করে এবং তাতে যে সব নামায ও ইবাদত রয়েছে তা পালন করে ঈদ উদযাপন করে। আর মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

২১. অলিম্পিক উৎসব

অলিম্পিক গেমস হলো প্রাচীন গ্রীসে প্রতি চার বছরান্তের অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতি চার বছরান্তিক বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম।

অলিম্পাস হলো প্রধান প্রধান গ্রিক দেবতার আবাসরূপে পরিগণিত গ্রিসের কতিপয় পর্বতের নাম। বাস্তবে অলিম্পিক গেমস-এর সম্পর্ক কিন্তু গ্রিকদের ধর্মীয় উৎসবের সাথেই। আরবি বিশ্বকোষে বুত্রুস বুস্তানী বলেন, 'এই সকল খেলা প্রথমতঃ দ্বীনী উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।' (দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ ৪/৬৮৫)

আর এ জন্যই দ্বীনী-দৃষ্টিকোণ থেকেই ওলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত করা, তাতে রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য দুটি কারণে বৈধ নয়–

প্রথমতঃ এই খেলার আসল বুনিয়াদ হলো পৌত্তলিকতা ও শিরক। আর তার মৌসুম গ্রীকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈদের মৌসুম বলে মানা হতো। অতঃপর তাদের নিকট থেকেই রোমান ও খ্রিস্টানরা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ অলিম্পিক তার প্রাচীন নামেই আজও প্রসিদ্ধ আছে; যে নাম নিয়ে তা শুরু হয়েছিল। আর তার প্রাচীন নাম অবশিষ্ট থাকাই এ কথার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, এ খেলা মুসলমানদের জন্য অবৈধ ও নাজায়েয।

সাবেত বিন যাহহাক (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নিয়ত করল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে মান্নত পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোনো পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোনো ঈদ (মেলা) হতো?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নিয়ত পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোনো নিয়ত পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোনো নিয়ত পালন করতে হয় না।"

(আবূ দাউদ ৩৩১৩)

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের অতীতের কোনো শরীয়ত-বিরোধী; যেমন মেলা (বা ওরস) ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক থাকাটাই এ কথার দলীল যে, সেখানে কোন শরীয়ত-সম্মত কাজও করা যাবে না। অথচ মান্নতকারী যখন মহানবী ﷺ-কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন শরীয়ত-বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে যদি কোনো জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ হতে পারে, তাহলে নিজের প্রাচীন নাম ও দ্বীনী প্রতীকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সে জিনিস অধিকরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য, অলিম্পিক গেমস তো সর্বাধিক থেকেই নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রূপ নিয়েই আজও বর্তমান আছে। যেমন এর প্রারম্ভিক উদ্বোধনের সময় আগুনের শিখা নিয়ে দৌড়ানো হয়, প্রত্যেক চার বছর পর অর্থাৎ পঞ্চম বছরে তা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে তার প্রাচীন নাম 'অলিম্পিক' নামেই জানা ও প্রচার করা হয়। (মাজাল্লাতুল বায়ান ১৪৪ সংখ্যা, শা'বান ১৪২১ হিঃ, ২৬-২৭ পৃঃ, অফাদারী ইয়া বেযারী, মাকসূদুল হাসান ফায়যী ২৮৫ পৃঃ)

২২. মাতৃদিবস

পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। বছরে একবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সম্পর্ক বজায় রাখার কোনো যুক্তিই মুসলিম সন্তানের কাছে থাকতে পারে না। যে সন্তানের মায়ের পদতলে রয়েছে জান্নাত, সেই সন্তান বছরে একদিন মাতৃদিবস পালন করে বাকি কর্তব্য থেকে পলায়ন করবে কেন?

এই অনুষ্ঠান তাদের প্রয়োজন, যাদের ডানা বের হতেই মা-বাবার বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। মা-বাবা হতে দূরে থেকে প্রেমিকা অথবা স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে। যারা মা-বাবার খিদমত কি জিনিস তাই জানে না। যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে ঘরে না রেখে বৃদ্ধ-খোঁয়াড়ে বন্দী রেখে আসে। যারা বছরে হয়তো একবারও মা-বাপের চেহারা দর্শনের অবসর অথবা চেষ্টা রাখে না।

কিন্তু যে সন্তানের মা-বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, যে সন্তানের মা-বাবা কাফের হলেও তাদের সাথে দুনিয়ায় সদ্ভাবে বসবাস করতে বলা হয়েছে, যে সন্তান মা-বাপের অনুমতি ব্যতীত (নফল) জিহাদেও যেতে পারে না, সে সন্তান

'মাতৃদিবস'-এর অনুষ্ঠান পালন করে কি করবে? মা-বাপকে সারা বছর খুশী না রেখে একদিন উপহার-পূজা দিলেই কি তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে? নাকি তাদের প্রতি সকল কর্তব্য পালন হয়ে যাবে?

তবে কেন কুসন্তানদের মতো সুসন্তানরাও সেই দিবস পালন করার জন্য পাল্লা ধরেছে? ইসলামের নির্দেশ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

কেন মুসলিম সন্তান আজ বিজাতির অন্ধানুকরণ করে? কেন বিজাতির প্রত্যেক প্রথাকে লুফে নিতে প্রগতিশীল মনে করে? কেন সে আজ হীনমন্যতার শিকার? তার দ্বীন কি পরিপূর্ণ নয়? তার কাছে কি ইসলাম মনোনীত ধর্ম নয়? তবে কেন বিজাতির গড্ডালিকা-প্রবাহে প্রবাহমান হয়ে নিজের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা বিলীন করে দিচ্ছে?

বলা বাহুল্য যে, বিজাতির অনুকরণে ঐ দিবসে মায়ের জন্য উপহারসামগ্রী পেশ করা, মা-কে নিয়ে আনন্দ-অনুষ্ঠান করা, খাস করে ঐ দিনে মায়ের সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি বিদআত ও হারাম। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২৪, ইবনে উসাইমীন ৩/৩০১)

২৩. বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু এবং ব্যভিচারের ঠিকেদাররা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার-মাধ্যম, রঙমহল, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনই রচনা করেছে অবৈধ প্রেম বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন, তৈরি করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেয়ার মতো স্মারক-দিবস। ভালোবাসা দিবস এমনই একটি দিবস।

১৪ ফেব্রুয়ারি পালনীয় এই দিনটি কিন্তু খ্রিস্টানদের। একে তাদের ভাষায় (Valentine Day) বলে। এই ঈদ প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়। সে সময় রোমানরা ছিল পৌত্তলিক। উক্ত Valentine নামক সাধু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। পরবর্তীতে রোমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তার মৃত্যুর দিনকে প্রেমের শহীদদের স্মরণের দিনরূপে পালন করে। আর তখন থেকেই চালু হয়ে যায় ঐ ভালোবাসা দিবস।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উক্ত দিবস সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় যত্ন ও গুরুত্ব পেয়ে যায়।

অবশ্য ঐ দিনটি রোমানদের নারী ও বিবাহের দেবী মহিমময়ী জুনো (Juno) -কে স্মরণ করার জন্যও পবিত্ররূপে পালিত হয়ে থাকে।

আরো বলা হয়ে থাকে যে, একদা রোমান সম্রাট (ক্লাউডিউস) রোমের সকল পুরুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলে অনেক পুরুষ তাতে আগ্রহ দেখায় না। কারণ বিশ্লেষণ করে জানতে পারে যে, সে সব পুরুষরা হল বিবাহিত এবং তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে যেতে রাজি নয়। এ জন্য সম্রাট বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু যাজক (Valentine) সম্রাটের সে আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং গোপনে গোপনে গীর্জার মধ্যে লোকেদের বিবাহ কাজ সম্পন্ন করতে থাকে। এ সংবাদ পেয়ে স্রমাট তাকে গ্রেফতার করে ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তার প্রাণদণ্ড দেয়। আর তারপর থেকে তার স্মরণে ঐ দিনকে প্রেমের দিন বলে পালন করা হয়।

অতঃপর গীর্জার পক্ষ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইটালিতে (Valentine Day) পালন সরকারিভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। যেহেতু তাদের মতে সেই উৎসব ছিল দ্বীন ও চরিত্র-বিরোধী অবাস্তব উপকথাভিত্তিক। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা আজও পর্যন্ত পালন করতে থাকে।

ঐ দিনে পাখিরা নিজ নিজ সঙ্গী নির্বাচন করে বলে রূপকথায় বর্ণিত আছে। এই দিনে (সাধারণতঃ অবৈধ) প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম-হৃদয়ের সততা ব্যক্ত করে থাকে। উভয়ের মাঝে প্রেম-প্রীতির অঙ্গীকার নবায়ন করা হয়। একে অন্যকে প্রীতির সাদর সম্ভাষণ জানায়।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে গ্রীটিং কার্ড বিনিময় করা হয়। সেই কার্ডে লিখা থাকে (Be My Valentine) অর্থাৎ, আমার ভ্যালেনটাইন হয়ে যাও। লিখা থাকে প্রেমের নানা কবিতা, গান, শ্লোক বা ছোট বাক্য। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে লাল ফুল (গোলাপ) বিনিময় করা হয়। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে কেক, মিঠাই ও চকলেট বিতরণ করা হয়। এই দিনে ময়রারা লাল রঙের মিষ্টি (বা কেক) তৈরি করে। তার উপরে প্রেমের প্রতীক হৃদয় অঙ্কন করে।

গ্রীটিং-কার্ডে, উৎসব-স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমিকদের (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। আসলে তা হলো একটি ডানা-ওয়ালা শিশু; তার হাতে আছে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দ প্রকাশার্থে পথে-পার্কে-ময়দানে বের হয়। একত্রিত হয় নাইট ক্লাবে ও বিভিন্ন হোটেলে। চলে ড্রিঙ্ক, ড্যান্স ও ব্যভিচারের বিরাট ধুম! আপনি যদি সত্যিকার মুসলিম হন, তাহলে আপনিই বলুন না, এমন চরিত্র-বিনাশী উৎসব কি কোনো মুসলিম যুবক-যুবতী পালন করতে পারে?

একজন মুসলিম কি বিবাহের পূর্বে কোনো নারীর সাথে অবৈধ প্রণয় ও সম্পর্ক গড়তে পারে? একজন মুসলিম কি কোন বিজাতির উৎসবে আনন্দিত হতে পারে? একজন মুসলিম কি নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের ছাঁচে গড়তে পারে?

যেহেতু নবী করীম ﷺ যে বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সানে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন।"

(আহমদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)

আল্লাহ মুসলিম যুবক-যুবতীকে সুমতি দিন। আমীন।

২৪. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা অন্য কোনো ঘর বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত চালু বা আরম্ভ করার জন্য অনুষ্ঠান করে মীলাদ পড়ে অথবা ফিতা কেটে অথবা হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করে উদ্বোধন করার প্রথা ইসলামে নেই। এ প্রথা আল্লাহর রাসূল বা সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে প্রচলিত ছিল না এবং পবিত্র শরীয়তে এর কোন অনুমোদন নেই। কাজেই তা আমাদের ভালো মনে করে করা বিদআত গণ্য হবে।

কোনো সাহাবীর বাড়িতে নফল সালাত পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করার জন্য মহানবী ﷺ-এর সেখানে গিয়ে নামায পড়া এবং বাড়ির লোকের সে জায়গাকে মুবারক বলে গ্রহণ করার দলীলে মসজিদ-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৈধ হতে পারে না। কারণ, তা তো আসলে সাধারণ মসজিদ নয়। তা ছিল নিছক নফল সালাত পড়ার জন্য বাড়ির ভিতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা। আর তাঁর ইন্তিকালের পর বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে দাওয়াত দেয়াও বৈধ নয়। বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বড় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে ধূম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলে তা শিরক বলে পরিগণিত হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা ১/১৮, ১২৫ দ্রঃ)

২৫. খিযির (আ)-এর নামে শিরনি

খিযির (আ)-এর পরিচয় : কুরআন কারীমে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন।

খিযির (আ)-এর মৃত্যুর দলীল

যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। ইবনে ওমর বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন–

أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهٖ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ـ

"তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর পরে যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১১৬, মুসলিম, হাদীস-২৫৩৬)

খিযির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোন একদিকের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লেখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

খিযির (আ)-এর নামে শিরনি

আমাদের দেশের দীনহীন এক শ্রেণির মূর্খ মানুষের বিশ্বাস "খিযির (আ) জীবিত আছেন এবং নদী-সমুদ্রের ভাঙ্গা-গড়ার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন"। এ জন্য জেলে-ধীবর বেশি মাছ পাওয়ার আশায় নদী-সাগরে শিন্নি দেয়। এ ছাড়া গাজী-কালুসহ বিভিন্ন নামে-বেনামে ও মাজারে শিন্নি দেয়া কিছু লোকের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আর এসবই শিরক।

চতুর্থ অধ্যায়
দৈনন্দিন আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার

যিকিরের ফযিলত

মহান তায়ালা আল্লাহ্ বলেন–

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ـ

উচ্চারণ : ফাযকুরূনী আযকুরকুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাকফুরূন।

অর্থ : 'অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামতের নাশোকরী করো না। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-১৫২)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ

উচ্চারণ : ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয কুরুল্লা-হা যিকরান কাছীরা।

অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো।'

(সূরা আহযাব : আয়াত-৪১)

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৫)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

তোমরা প্রভুকে স্মরণ করো মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীন (গাফিল)দের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

রাসূল ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকির (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার প্রভুর স্মরণ করেন না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো– জীবিত ও মৃতের ন্যায়।'

(সহীহ বুখারী)

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন : 'যে গৃহে আল্লাহর যিক্‌র হয় এবং যে গৃহে যিকির হয় না, ঐ গৃহের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।' (বুখারী, ফাতহুল বারী-১১/২০৮)

নবী করীম ﷺ বলেন : আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা জানাব না, যা তোমাদের প্রভুর কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী (আল্লাহর পথে), সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার যিকির। (সহীহ ইবনে মাজা-২/৩১৬, সহীহ তিরমিযী-৩/১৩৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি ঠিক তেমন ধারণা করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে আমি এগিয়ে আসি তার দিকে এক হাত। আর, সে এক হাত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।
(বুখারী-৮/১৭১), মুসলিম-৪/২০৬১, শব্দগুলো বুখারীর)

আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে, কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। রাসূল ﷺ জবাবে বললেন : "তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী-৫/৪৫৮, ইবনে মাজা-২/১২৪৬)

রাসূল ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পায়; আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম, মীমকে একটি হরফ বলছি না; বরং 'আলিফ', একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"
(তিরমিযী-৫/১৭৫, সহীহ জামে সগীর-৫/৩৪০)

উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-বের হলেন। আমরা তখন সুফফায় অবস্থান করছিলাম। (সুফফা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের পার্শ্বে বাস্তুহারা গরিব সাহাবীসহ নও-মুসলিমদের থাকার স্থান)। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রত্যেক দিন

সকালে বুতহান অথবা আক্বীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসতে ভালোবাসে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তা করতে ভালোবাসি। তিনি বললেন : তোমরা কি এরূপ করতে পারো না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব হতে দুটি আয়াত শিক্ষা দেবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দুটি উট হতে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট হতে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উট হতে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে উত্তম হবে।' (মুসলিম-১/৫৫৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করে না, তার সে উপবেশন আল্লাহর নিকট থেকে নৈরাশ্য ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি কোনো শয্যায় শায়িত হয়ে আল্লাহর যিকি্র করে না, তার সেই শয়নও আল্লাহর নিকট নৈরাশ্যের কারণ। (অর্থাৎ এই উদাসীন অবস্থা তার জন্য ক্ষতিকর, তথা হতাশা ও আক্ষেপের কারণ)। (আবু দাউদ-৪/২৬৪, সহীহ আল জামে)

নবী করীম ﷺ বলেন : 'যদি কোনো দল কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবীর ওপর দরূদও পাঠ না করে, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশার কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের ক্ষমা করবেন। (তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী-৩/১৪০)

যে সব লোক এমন কোনো বৈঠকে অংশ গ্রহণের পর উঠে আসে যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, তারা যেন মৃত গাধার লাশের স্তূপ হতে উঠে আসে। এরূপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ।"

(আবু দাউদ-৪/২৬৪, আহমদ-২/৩৮৯)

যিকির ও দু'আসমূহ

১. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

১. 'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) সকলের পুনরুত্থান হবে।' (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮৩)

২. নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রা থেকে জেগে নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করে : তারপর এই বলে দু'আ করে' : 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।' তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। ওয়ালিদ বলেন, অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন; দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে যথাযথ ওযু করে আদায় করে, তবে তার সালাত কবুল হবে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৩৯, ইবনে মাজা-২/৩৩৫)

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْـكَ لَـهٗ، لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْـدُ، وَهُـوَ عَـلٰى كُـلِّ شَـىْءٍ قَـدِيْـرٌ ـ سُـبْـحَانَ اللّٰـهِ، وَالْـحَـمْـدُ لِلّٰـهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-হি- ওয়ালা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বারু, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল আযীম, রাব্বিগ ফিরলী।

অর্থ : ২. 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর রহমত ছাড়া পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করার কারো কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই। তারপর এই বলে দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, তখন তাকে ক্ষমা করা হয়। ওয়ালীদ বলেন অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন, দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে।

(বুখারী, ফতহুল বারী-৩/৩৯, ইবনে মাজাহ-২/৩৩৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَرَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ، وَاَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهٖ ـ

আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী ফী জাসাদী ওয়ারাদ্দা আলাইয়্যা রূহী ওয়া আযিনা লী বিযিকরিহ।

৩. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার দেহকে (ক্ষয়ক্ষতি, অসুখ-বিসুখ হতে) সুস্থ রেখেছেন, আমার রূহ আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার অবকাশ দিয়েছেন।'

(তিরমিযী-৫/৪৭৩, সহীহ তিরমিযী-৩/১৪৪)

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ج (٢) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (٣) رَبَّنَاۤ اِنَّكَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ (٤)
رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ
فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْاَبْرَارِ ـ (٥) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ (٦) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ
سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ؛ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ـ (٨) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى
الْبِلَادِ ـ(٩) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ
(١٠) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْاَبْرَارِ ـ (١١) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ثَمَنًا قَلِيْلًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ . (١٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا قف وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

৪. ১৯০. আল্লাহর বাণী– 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িতাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করি নি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে অবশ্যই অপমানিত করলে; আর যালেমদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী নেই।

১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও যা তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।

১৯৫. অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না– তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে: তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা সংগ্রাম করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবেশ করব জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।

১৯৬. নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

১৯৭. এটা হলো সামান্যতম ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।

১৯৮. কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন অব্যাহত থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম।

১৯৯. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়, আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপরও, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর, পরস্পরকে ধৈর্যের কথা বল এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হতে পার।

(সূরা আলে ইমরান-১৯০-২০০, বুখারী-ফতহুল বারী-৮/২৩৫, মুসলিম-১/৫৩০)

২. কাপড় পরিধানের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা (সসাওবা) ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালাকুওয়্যাহ।

অর্থ : ৫. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ইহা পরিধান করিছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটি দান করেছেন।'

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, এরওয়াউল গালীল-৭/৪৭)

৩. নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি আসআলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরিমা সুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররিমা সুনি'আ লাহু।

অর্থ : ৬. 'হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিধান করেছেন। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সে সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্টতা এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (আবু দাউদ, তিরমিযী এবং আল্লামা আলবানীর মোখতাসার শামায়েল তিরমিযী-৪৭ পৃঃ)

৪. নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দু'আ

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

তুবলী ওয়াইয়ুখলিফুল্লা-হু তা'আলা।

৭. 'যথাসময়ে পুরাতন হয়ে বিনষ্ট হবে এবং আল্লাহ্ এর স্থলাভিষিক্ত করুক।' (আবু দাউদ-৪/৪১)

اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا-

ইলবাস জাদীদান, ওয়া'য়িশ হামীদান ওয়ামুত শাহীদান।

৮. 'নতুন পোশাক পরিধান করো, প্রশংসিতরূপে জীবন যাপন করো এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করো।' (ইবনে মাজা-২/১১৭৮, ইবনে মাজাহ-২/২৭৫)

৫. কাপড় খুলে রাখার সময় যা বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ - – বিসমিল্লা-হি।

৯. 'বিসমিল্লাহ-আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।' (তিরমিযী-২/৫০৫, প্রমুখ এরওয়াউল গালীল এর ৪৯ এবং সহীহ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৬. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

বিসমিল্লাহ-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইসি।

১০. (বিসমিল্লাহ) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বীন নর ও নারীর (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (বুখারী-১/৪৫, মুসলিম ১/২৮৩)

৭. পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

غُفْرَانَكَ ـ – গুফরা-নাকা

১১. 'হে আল্লাহ, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৮. ওযূর পূর্বে দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ ـ – বিসমিল্লা-হি।

১২. 'বিসমিল্লাহ-আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম।' (তিরমিযী-২/৫০৫, প্রমুখ এরওয়াউল গালীল এর ৪৯ এবং সহীহ্ আল জামে' এর ৩/২০৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৯. ওযূর শেষে দু'আ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ : আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

১৩. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা' ও রাসূল। (মুসলিম-১/২০০৯)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

আল্লা-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাউওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্মাহ হিরীনা।

১৪. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (তিরমিযী-১/৭৮)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা-'ইলা-হা ইল্লা-আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু 'ইলাইকা।

১৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই নিকট তওবা করি।' (নাসায়ী-১৭৩)

১০. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

বিসমিল্লা-হি তাওয়াককালতু 'আলাল্লা-হি-ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

১৬. "আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি, সামর্থ্য নেই অসৎকাজ থেকে বাঁচার এবং সৎ কাজ করার।" (আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিযী-৫/৪৯০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ، اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ، اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ ـ

আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আ'উযুবিকা 'আন আদিল্লা-'আউ 'উদাল্লা, আউ আযিল্লা, আউ উযাল্লা আউ আয্লিমা, 'আউ 'উযলামা, আউ আজহালা, আউ ইয়ূজহালা 'আলাইয়্যা।

১৭. "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অন্যকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হওয়া হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে-অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে। (তিরমিযী-৩/১৫২, ইবনে মাজা-২/৩৩৬)

১১. গৃহে প্রবেশের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা, ওয়াবিসমিল্লা-হি খারাজনা, ওয়া 'আলা রাব্বিনা তাওয়াককালনা।

১৮. 'আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি। (অতঃপর পরিবারবর্গের উপর সালাম বলবে)।' (আবূ দাউদ-৪/৩২৫)

১২. মসজিদে গমনকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا، وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا، وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا، وَمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَعَظِّمْ لِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِىْ عَصَبِىْ نُوْرًاوَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا، وَفِىْ دَمِىْ نُوْرًا، وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا، (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَبْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ) (وَزِدْنِىْ نُوْرًا، وَزِدْنِىْ نُوْرًا وَزِدْنِىْ نُوْرًا، (وَهَبْ لِىْ نُوْرًا) ـ

আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী ক্বালবী নূরান ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী সামঈ' নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়ামিন ফাউক্বী নূরান, ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া ইয়ামীনী নূরান, ওয়া আন শিমালী নুরান, ওয়ামিন আমামি নুরান, ওয়া মিন খালফী নূরান, ওয়াজ'আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া 'আযযিমলী নূরান, ওয়াজ'আলনী নূরান, আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরান, ওয়াজ আল ফী 'আছাবী নূরান, ওয়া ফী লাহমী নূরান, ওয়া ফী দামী নূরান, ওয়া ফী শা'রী নূরান, ওয়া ফী বাশারী নূরান, [আল্লা-হুম্মাজ 'আল লী নূরান ফী ক্বাবরী ওয়া নূরান ফী 'ইযা-মী] [ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান [ওয়াহাবলী নূরান 'আলা নূরান]।

১৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, তুমি আমার শ্রবণ শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নিচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আর জ্যোতিকে আমার জন্য অনেক বড় করে দাও, আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারণ কর, আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জ্যোতি দান কর, আমার বাহুতে জ্যোতি দান কর, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে জ্যোতি দান কর। [হে আল্লাহ! আমার কবরকে আমার জন্য জ্যোতির্ময় করে দাও, আমার হাড্ডিসমূহেও।] [আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতি বৃদ্ধি করে দাও, আমার জ্যোতির উপর জ্যোতি দান করো।]

(মুসলিম-১/৫৩০, বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৬), [তিরমিযী-৩/৪১৯, ৫/৪৮৩)

১৩. মসজিদে প্রবেশের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، (بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلاَةُ) (وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ) (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

'আউযু বিল্লা-হিল 'আযীমি, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীমি, ওয়াসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীমি, [বিসমিল্লা-হি, ওয়াসসালাতু] [ওয়াসসালা মু'আলা রাসূলিল্লা-হি] আল্লাহুম্মাফ, তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা।

২০. 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্তা এবং শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির নামে। আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও।'

(আবূ দাউদ, ইবনু সুন্নী হাদীস নং-৮৮, মুসলিম-১/৪৯৪)

১৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

বিসমিল্লা-হি ওয়াসসালা-তু ওয়াসআলা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা 'ইন্নী'আস'আলুকা মিন ফাদলিকা, 'আল্লা-হুম্মা'সিমনী মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

২১. 'আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তান থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা-১/১২৯)

১৫. আযানের দু'আ

২২. নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযনা শুনতে পাও তখন সে যা বলে, তোমরা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি কর। তবে মুয়ায্যিন যখন হাইয়্যা আলাস সালাহ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলেন, তখন–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

'লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি' বল।

অতঃপর বলবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ـ

উচ্চারণ : "আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনান।"

২৩. মুয়ায্যিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে, "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোনো মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতৃপ্ত।

(মুসলিম-১/২৯০, ইবনে খোযায়মা-১/২২০)

২৪. আযানের জবাব দেয়া শেষ হলে নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পড়বে।

(মুসলিম-১/২৮৮)

২৫. নবী করীম ﷺ (আযান শুনার পর) বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্বা-ইমাতি, 'আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা, ওয়াব 'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া 'আদতাহু [ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ]

২৫. 'হে আল্লাহ, এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা এবং ফযিলত তথা সুউচ্চতম মর্যাদা দান কর। আর, তাঁকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।' (বুখারী-১/২৫২ বায়হাকী-১/৪১০)

২৬. 'আযান ও ইক্বামতের মাঝে নিজের জন্য দু'আ করবে। কেননা, ঐ সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।' (তিরমিযী, আবূ দাউদ, আহমদ)

১৬. তাকবীরে তাহরিমার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَاطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা-বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লা-হুম্মা নাক্বক্বিনী-মিন খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা ইয়ূনাক্বক্বাস সাউবুল আবইয়ায়ু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগসিলনী খাত্বা-ইয়া-ইয়া, বিছছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারাদি।

২৭. হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি কর যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপ মুক্ত করে এমন পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশী পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।' (বুখারী-১/১৮১, মুসলিম-১/৪১৯)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা-জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুক।

২৮. 'হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই।' (আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরিমিযী-১/৭৭, ইবনে মাজা-১/১৩৫)

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ، وَمَحْيَاىَ، وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ : ইন্নি ওয়াজজাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাসসামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা 'আনা মিনাল মুশরিকীনা 'ইন্না সালাতী, ওয়া নুসুকী ওয়ামাহ ইয়াইয়া, ওয়ামামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীনা, লা-শারীকালাহু ওয়াবিযা-লিকা 'উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

২৯. 'আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাই যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ একমাত্র বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।' (মুসলিম-১/৫৩৪)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ، اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ، وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতাল মালিকু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা, আনতা রাব্বী ওয়া 'আনা 'আবদুকা, যালামতু নাফসী ওয়া'তরাফতু বিযামবী ফাগফির লী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা-আনতা ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলা-ক্বি লা ইয়াহদী লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ 'আন্নী সায়্যিআহা, লা ইয়াসরিফু 'আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আনতা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু বিইয়াদাইকা, ওয়াশশাররু লাইসা 'ইলাইকা, 'আনা-বিকা ওয়া ইলাইকা তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ লাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আ'তূবু 'ইলাইকা।"

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপসমূহ সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিচ্ছি কাজেই তুমি আমার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউই

গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত কর, তুমি ব্যতীত আর কেউই উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না, আমার দোষগুলো তুমি আমার থেকে দূরীভূত কর, তুমি ছাড়া অপর কেউই চারিত্রিক দোষ অপসারিত করতে পারে না।' (মুসলিম-১/৫৩৪০)

'প্রভু হে! আমি তোমার হুকুম মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হস্তদ্বয়ে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয় অর্থাৎ মন্দ তোমার কাম্য নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত, আমি তোমার নিকট মার্জনা চাচ্ছি এবং তোমারই তাওবা করছি।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَاِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থ : আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরা'ঈলা, ওয়ামীকাঈলা, ওয়া ইসরা-ফীলা ফা-ত্বিরাস, সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা 'ইহা-দিকা ফীমা কা-নূ ফী হি ইয়াখতালিফূনা, ইহদিনী লিমাখ তুলিফা ফী হি মিনাল হাক্বক্বি, বিইয্নিকা ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা সিরা-ত্বিম মুস্তাক্বীম।

৩০. 'হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশ ও জমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার সুমীমাংসা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেই দিকে পথ প্রদর্শন কর। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাক।' (মুসলিম-১/৫৩৪)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا،
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا،
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবারু কাবীরান, আল্লাহু আকবারু কাবীরান, আল্লাহু আকবারু কাবীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়াসুবহা-নাল্লা হি বুকরাতাও ওয়াআসীলা।

অতঃপর তিনবার বলবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ ـ

আউ'যু বিল্লা-বি মিনাশ শাইত্বা নি মিন নাফখিহী, ওয়া নাফসিহী, ওয়া হামযিহী।

৩১. 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ– অতীব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, অনেক অনেক প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। সকালে ও সন্ধ্যায় দিনে ও রাতে তথা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তিনবার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় চাচ্ছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা থেকে।'

(আবূ দাউদ-১/২০৩, ইবনে মাজাহ-১/২৬৫, আহমদ-১৪/৮৫)

৩২. নবী করীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়াতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন–

(اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ.اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، (وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، (وَلَكَ الْحَمْدُ) (اَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا

اَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ) اَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ،
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ) (اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ)

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়া লাকাল হামদু আনতা ক্বায়্যিমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফী হিন্না-, [ওয়ালাকালহামদু আনতা রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফী হিন্না' [ওয়ালাকাল হামদু লাকা মুলকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফী হিন্না] [ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস, সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া লাকল হামদু, আনতাল হাক্বক্ব, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্বকু, ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্বক্ব, ওয়া লিক্বা-উকাল হাক্বক্ব ওয়াল জান্নাতু হাক্বকুন, ওয়ান না-রু হাক্বকুন, ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্বকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্বকুন, ওয়াস সা-'আতু হাক্বকুন। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াককালতু ওয়বিকা আ-মানতু, ওয়া 'ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফিরলী মা কাদ্দামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়া মা আসরারতু, ওয়া মা আ'লানতু] [আনতাল মুকাদ্দামু, ওয়ালী আনতাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা] আনতা ইলা-হী লা-ইলা-হা ইল্লাআনতা।

'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তুমি তাদের সকলের জ্যোতি এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এদের মাঝে আছে তুমিই ঐ সবের প্রভু।) (আর প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তোমারই।) আর সকল গুণকীর্তন তোমারই জন্য।

তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত (বেহেশত) সত্য, জাহান্নাম (দোযখ) সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ সত্য এবং কিয়ামত সত্য।) (হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। অতঃপর আমার পূর্বের ও পরের সকল গোপনীয় ও প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ ক্ষমা করে দাও।) (তুমিই যা চাও আগে কর এবং তুমিই যা চাও পশ্চাতে কর, একমাত্র তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই।)

(তুমিই একমাত্র উপাস্য তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই।)'

(বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৩, ১১/১১৬, ১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫ ও মুসলিম-১/৫৩২)

১৭. রুকূর দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম।

৩৩. 'আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার)

(আবূ দাউদ, তিরমিযী-১/৮৩, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ -

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

৩৪. 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু। তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

(বুখারী-১/১৯৯, মুসলিম-১/৩৫০)

سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

সুববূহুন কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালা-'ইকাতি ওয়াররূহি।

৩৫. 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)]-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত গুণাবলিতেও পবিত্র।' (মুসলিম-১/৩৫৩, আবূ দাউদ-১/২৩০)

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، خَشِعَ لَكَ سَمْعِىْ، وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ، وَمَا اسْتَقَلَّ بِهٖ قَدَمِىْ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু খাশিআ লাকা সাম'ঈ, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখখী, ওয়া'আযমী, ওয়া'আসাবী ওয়ামাসতাক্বাল্লা বিহীকাদামী।

৩৬. 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকূ (মাথা অবনত) করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্তা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।' (মুসলিম-১/৫৩৫, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ، وَالْمُلْكِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ -

উচ্চারণ : সুবহানা যিল জাবারূতি, ওয়াল মালাকূ-তি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল 'আযামাতি।

৩৭. 'পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।'

(আবূ দাউদ-১/২৩০, নাসাঈ, আহমদ)

১৮. রুকূ থেকে উঠার দু'আ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ـ

উচ্চারণ : সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ।

৩৮. আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে।' (বুখারী-২/২৮২)

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًافِيْهِ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি।

৩৯. হে আমাদের প্রভু! তোমার সমস্ত ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা।' (বুখারী-২/২৮৪)

مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

উচ্চারণ : মিল'আস সামাওয়াতি ওয়া মিল'আল আরদ্বি, ওয়ামা বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ-মা-শি'তা মিন শাই'ইন, বা'দু আহলাছ ছানা-ই ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা-ক্বা-লাল আবদু ওয়াকুল্লুনা লাকা'আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নি'আ লিমান আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা ওয়াল ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

৪০. 'আল্লাহ! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ পরিপূর্ণ করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয় এবং এগুলো ব্যতীত তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মাহাত্ম ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসার শানে যে কোনো বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার দান কর বেশি এর হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধনসম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।' (মুসলিম-১/৩৪৬)

১৯. সিজদার দু'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

উচ্চারণ : সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আলা-।

৪১. 'আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (তিনবার।)
(আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ আহমদ)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী।

৪২. 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' (বুখারী ও মুসলিম)

سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ : সুব্বূহুন, কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহি।

৪৩. 'ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদ্স জিবরাঈল (আ)]-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলিতে পবিত্র।' (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهٗ، وَصَوَّرَهٗ، وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজাদা ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াসাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবা-রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীনা।

৪৪. হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং এর কর্ণ ও এর চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা।' (মুসলিম-১/৫৩৪, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ۔

উচ্চারণ : সুবহানা জীল জাবারূতি, ওয়াল মালাকূতি, ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল 'আযামাতি।

৪৫. 'পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ্ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।' (আবূ দাউদ-১/২৩০, নাসাঈ, আহমদ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী যামবী কুল্লুহূ, দিক্বক্বাহু ওয়া জিল্লাহূ, ওয়া আউওয়ালাহূ ওয়া 'আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা-নিয়্যাতুহূ ওয়া সিররাহূ।

৪৬. 'হে আল্লাহ্! আমার সমস্ত গুনাহ্ মার্জনা করে দাও, ছোট গুনাহ্, বড় গুনাহ্, পূর্বের গুনাহ্, পরের গুনাহ্, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহসমূহ।' (মুসলিম-১/৩৫০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْكَ، لاَ اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বকা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আউ'যুবিকা মিনকা, লা উহসি ছানা-'আ-আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিকা।

৪৭. 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি হতে, তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য, যেরূপ নিজের প্রশংসা তুমি নিজে করেছ।' (মুসলিম-১/৩৫২০)

২০. দু'সিজদার মাঝখানে দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ۔

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী।

৪৮. হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' (আবু দাউদ-১/২৩১, ইবনে মাজা-১/১৪৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ، وَاجْبُرْنِىْ وَعَافِنِىْ، وَارْزُقْنِىْ، وَارْفَعْنِى ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনী, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী।

৪৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার উপর রহম কর, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

২১. সিজদার আয়াত পাঠের পর সিজদায় দু'আ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী।

৪৮. হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' (আবু দাউদ-/২৩, ইবনে মাজা-/৪৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ، وَارْحَمْنِىْ، وَاهْدِنِىْ، وَاجْبُرْنِىْ، وَعَافِنِىْ، وَارْزُقْنِىْ، وَارْفَعْنِىْ ـ

উচ্চারণ :উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী ওয়া'আফিনী, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী।

৪৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার উপর রহম কর, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং তুমি আমাকে রিযিক দান কর ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।' (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ، وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াশাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু, ওয়া বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীনা।

৫০. 'আমার মুখমণ্ডলসহ (আমার সমগ্র দেহ) সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ ও এর চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ সর্বোত্তম স্রষ্টা।'

(তিরমিযী-২/৪৭৪, আহমদ-৬/৩০, হাকেম)

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا، وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকতুবলী বিহা 'ইনদাকা আজরান, ওয়াদ্বা'আন্নী বিহা ওয়িযরান, ওয়াজ'আলহা লী 'ইনদাকা যুখরান, ওয়াতাক্বাব বালাহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদা।

অর্থ : ৫১. 'হে আল্লাহ! তা দ্বারা তোমার নিকট আমার জন্য নেকী লিপিবদ্ধ করে রাখ, আর এ দ্বারা আমার পাপরাশী দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসেবে জমা করে রাখ আর তাকে আমার নিকট থেকে কবূল কর যেমন কবুল করেছ তোমার বান্দা দাউদ (আ) হতে।' (তিরমিযী-২/৪৭৩, হাকেম)

২২. তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ : আততাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ত্ব ত্বায়্যিবা-ত্ত্ব, আসসালামু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু, আসসালা মু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আসহাদু আল্লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

৫২. যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক,

আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপর শান্তি নাযিল হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (বুখারী-ফতহুল বারী ১১/১৩, মুসলিম ১/৩০১)

২৩. তাশাহহুদের পর রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা 'আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহহুমা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা 'আলা ইবরা হীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৫৩. হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের উপরে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত অবতীর্ণ কর যেমন বরকত তুমি অবতীর্ণ করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসাময় ও সম্মানীয়। (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৪০৮)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদিন ওয়ালা আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়্যাতিহী, কামা সাল্লাইতা 'আলা আলি ইবরা-হীমা ওয়া বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী, কামা-বা-রাকতা 'আলা-'আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

৫৪. 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণের উপর রহমত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের উপর। আর তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীগণের এবং সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরগণের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৪০৭, মুসলিম-১/৩০৬)

২৪. সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাবরি, ওয়া মিন আযা-বি জাহান্নামা ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালি।

৫৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে।' (বুখারী-২১০২, মুসলিম-১/৪১২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوْبِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-লি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি।

অর্থ : ৫৬. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মৃত্যুর ফিৎনা হতে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও ঋণভার হতে।'
(বুখারী-১/২০২, মুসলিম-১/৪১২)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا
اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী- যুলমান কাছীরাওঁ, ওয়ালা ইয়াগফিরুয .যুনূবা ইল্লা-আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

৫৭. 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি অত্যাচার করেছি, আর তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং তুমি আমার প্রতি রহম কর, তুমি তো মার্জনাকারী দয়ালু।' (বুখারী-৮/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَسْرَفْتُ، وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা-আখখারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু, ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আনতাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আনভাল মু'আখখিরু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

অর্থ : ৫৮. 'হে আল্লাহ! আমি যেসব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সমস্তই তুমি ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, ক্ষমা করো আমার সীমালঙ্ঘনজনিত গুনাহসমূহ এবং সে সব গুনাহ্ যে গুনাহ্ সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তুমি যা চাও আগে কর এবং তুমি যা চাও পশ্চাতে কর। আর তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই। (মুসলিম-১/৫৩৪)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ،

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা-আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা, ওয়াহুসনি 'ইবা-দাতিকা।

অর্থ : ৫৯. 'হে আল্লাহ! তোমার যিকির, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা কর।' (আবূ দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৫৩)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আউ'যুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউ'যুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আযা-বিল ক্বাবরি।

৬০. 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়াতে ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৫)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্নার।

অর্থ : ৬১. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ-২/৩২৮)

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِىْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاَسْاَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَاَسْاَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَاَسْاَلُكَ نَعِيْمًا لَايَنْفَدُ، وَاَسْاَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَاَسْاَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاَسْاَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقِ اِلَى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিই'লমিকাল গাইবা ওয়া কুদরিতিকা 'আলাল খালক্বি আহয়িনী মা 'আলিমতাল হাইয়া-তা খাইরাললী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা 'আলিমতাল ওয়াফা-তা খাইরাললী। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাশইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ওয়া আস'আলুকা কালিমাতাল হাক্বক্বি ফির রিযা ওয়াল গাযাবি, ওয়া আস আলুকাল ক্বাস্বদা ফিল গিনা ওয়াল ফাক্বরি, ওয়া আস আলুকা না'ঈমান লা-ইয়ানফাদু, ওয়া 'আস'আলুকা কুররাতা 'আইনিন লা

তানকাতি'উ, ওয়া আস' আলুকা বারদাল আই'শি বা'দাল মাউতি ওয়া 'আসআলুকা লাযযাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশ শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইকা ফী গাইরি যাররা-'আ মুযিররাতিন ওয়ালা ফিতনাতিম মুযিল্লাহ। আল্লাহুম্মা যাইয়্যান্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ 'আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ : ৬২. 'হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির উপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে, আমাকে তুমি জীবিত রাখ ততদিন পর্যন্ত যতদিন মনে কর যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও সেই সময় যখন মনে কর যে, মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই (আমার হৃদয়ে) তোমার ভয়-ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে; আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মধ্যমপন্থা গ্রহণের, দরিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার নিকট এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও আমা হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।

আমি তোমার নিকট চাই তকদীরের প্রতি সন্তোষ। আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহে ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোনো অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোনো ফেৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর এবং আমাদেরকে তুমি কর পথ প্রদর্শক এবং হেদায়াতের পথিক।'

(নাসাঈ-৩/৫৪, ৫৫, আহমদ-৪/৩৬৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আসআলুকা ইয়া আল্লা-হু বি'আন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদু ওয়ালাম ইয়াকুললাহু কুফুওয়ান আহাদু 'আন তাগফিরলী যুনূবী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

৬৩. হে আল্লাহ! তুমি এক অদ্বিতীয়, সকল কিছুই যার দিকে মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি এবং যার সমকক্ষও কেউ নেই, তোমার কাছে আমি কামনা করি তুমি আমার সবগুনাহ্ মার্জনা করে দাও নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (নাসাঈ-৩/৫২, আহমদ-৪/৩৩৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْمَنَّانُ، يَابَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আস'আলুকা বি'আন্না লাকাল হামদা লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহদাকা লাশারীকা লাকাল মান্নানু, ইয়া বাদী'আস সামা ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরামি, ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুমু ইন্নী আস'আলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনাননার।

অর্থ : হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো অংশীদার নেই, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সীমাহীন অনুগ্রহকারী, হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়! হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাচ্ছি।' (আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদু ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

৬৫. হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, এমন এক সত্তা যার নিকট সকল কিছু মুখাপেক্ষী যিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

(আবূ দাউদ-২/৬২, তিরমিযী-৫/১৫)

২৫. সালাম ফিরানোর পর দু'আ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (ثَلاثًا) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ـ

আসতাগফিরুল্লা-হা (ছালা-ছানা) আল্লাহুম্মা আনতাস সালা-মু, ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

৬৬. 'আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়! (মুসলিম-১/৪১৪)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

৬৭. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেউই নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার মতো কেউই নেই। তোমার গযব হতে কোনো বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।' (বুখারী-১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালহুল হামদু ওয়া হওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু ওয়া লাহুছ ছানা-উল হাসানু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কা-ফিরূন।

৬৮. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোনো পাপ কাজ ও রোগ, শোক বিপদ আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর সৎকাজ করারও ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপ্রীতিকর।' (মুসলিম-১/৪১৫)

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লা-হু আকবার।

৬৯. আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৩৩ বার) অতঃপর এই দু'আ পড়বে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদরী।

আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (মুসলিম-১/৪১৮)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদু আল্লাহুস সামাদু, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়াকাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদু।

৭০. সূরা ইখলাছ : "তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার নিকট সব কিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি জন্ম দেননি এবং জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, মিন শাররি মা-খালাক্ব, ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ, ওয়ামিন শাররি হা-সি-দিন ইযা হাসাদ।

সূরা ফালাক : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকারময় রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স, মালিকিন্না-স, ইলা-হিন না-স, মিন শারলি ওয়াস ওয়া সিল খান্না-স, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাসে, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

সূরা নাস : “বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, সে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বীনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।” প্রত্যেক সালাতের পর পাঠ করবে। (আবু দাউদ-২/৮৬, নাসাঈ-৩/৬৮)

৭১. “আয়াতুল কুরসী” প্রতি ফরয সালাতের পর পড়বে। (নাসাঈ)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা, হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা, ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

'আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? পূর্বের এবং পাশ্চাতের সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।”

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া 'আলা, কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

৭২. "আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

মাগরিব ও ফজরের পর ১০ বার করে পড়বে। (তিরমিযী-৫/৫১৫, আহমদ-৪/২২৭)

৭৩. ফজর সালাতের সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন ওয়া রিযকান ত্বায়্যিবান, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।' (ইবনে মাজাহ, মাজামাউল যাওয়ায়েদ)

২৬. ইসতেখারার দু'আ

৭৪. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইসতেখারার কল্যাণের ইঙ্গিত প্রার্থনায় সালাত ও দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেনো দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করে অতঃপর এই দু'আ পড়ে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْنِىْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বদরাতিকা, ওয়া আস 'আলুকা মিন ফাদলিকাল 'আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু, ওয়া লা 'আলামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুয়ুব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা'মালু আন্না হা-যাল আমরা, ওয়া ইয়ুসাম্মী হা-জাতাহু, খাইরু লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহুলী ওয়া ইয়াসসিরুহু লী ছুম্মা বা-রিকলী ফীহি, ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররিললী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাসরিফহু 'আননী ওয়াসরিফনী 'আনহু ওয়াক্বদিরনিয়াল খাইরি হাইছু কানা ছুম্মা আরযিনী বিহ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিশালী, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান; আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান অনুসরণ যদি তোমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও। তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে, এই কাজটি তোমার জ্ঞান মোতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি তা হতে দূরে সরিয়ে এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখ।'

যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার নিকট ইস্তেখারা করে এবং সৃষ্ট জীবের মাঝে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে আর তার কাজে দৃঢ়পদ থাকে সে কখনও অনুতপ্ত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

'(হে রাসূল!) তুমি জরুরি বিষয়ে তাদের (সহকর্মীদের) সাথে পরামর্শ কর, তারপর যখন দৃঢ়সংকল্পতা লাভ কর, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে চলবে।'

(বুখারী ৭/১৬২) (আল ইমরান-১৫৯)

২৭. সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, দুরূদ ও সালাম ঐ সত্তার প্রতি যার পরে কোনো নবী নেই।

৭৫. আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

উচ্চারণ : আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইউম লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁওয়ালা-নাউম; লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি মান যাল্লাযী' ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহ। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীত্বুনা বিশাই ইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-'আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল 'আলিয়্যুল আযীম।

'আল্লাহ সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ব্যতীত স্পর্শ করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশ পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এ দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।"

(সূরা বাকারা-২৫৫/ মুসলিম-৪/২০৮৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ : কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

৭৬. সূরা ইখলাস : ১. তিনিই আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ : কুল আউ'যু বিরাববিল ফালাক্বি, মিন শাররি মা-খালাক্ব। ওয়া মিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়ামিন শাররিন নাকফাসাতি ফিল উকাদ ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদা।

সূরা ফালাক :

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকারময় রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكَ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ : কুল আউযু বিরাববিননাস, মালিকিন নাস, ইলা-হিন নাস। মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খাননাস, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অর্থ : "বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বীনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

উক্ত সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করবে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّمَا بَعْدَهٗ، رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ ـ

উচ্চারণ : আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলক লিল্লাহী ওয়াল হামদু লিল্লাহি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ফী হা-যাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা-'দাহু। রাববি আউ'যুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সুই'ল কিবারি, রাববি আউ'যুবিকা মিন 'আযা-বিন ফিন না-রি ওয়া 'আযা-বিন ফিল ক্বাবরি।

৭৭. আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর (আরাধনার ও আনুগত্যের) জন্য সকালে উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

হে! প্রভু এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত রয়েছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত রয়েছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রভু! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, প্রভু জাহান্নামের আযাব হতে এবং কবরের আযাব হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি।'

(বুখারী-৭/১৫০)

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا ، وَبِكَ اَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।

৭৮. 'হে আল্লাহ! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছাতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করব, আর তোমারই দিকে কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হয়ে সমবেত হব।'

আর সন্ধ্যা হলে নবী করীম ﷺ বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا ، وَبِكَ اَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাছীর।

'হে আল্লাহ! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রতুষে উপনীত হই। তোমারই ইচ্ছায় জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তিরমিযী-৫/৪৬৬)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বী-ইলা-হা ইল্লা-আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়াআনা'আলা আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মা-সানা'তু আবূ উলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ উ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লাহ আনতা।

৭৯. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউই গুনাহসমূহের মার্জনাকারী নেই।' (তিরমিযী-৫/৪৬৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিকা ওয়া মালা-ইকাতাকা, ওয়া জামী'আ খালক্বিকা, আন্নাকা আনতাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়াহদাহু লা-শারীকালাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

৮০. 'হে আল্লাহ! (তোমার অনুগ্রহে) সকালে উপনীত হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার আরশের বহনকারীদের এবং তোমার সকল ফেরেশতার ও তোমার সকল সৃষ্টির। নিশ্চয় তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দাহ এবং প্রেরিত রাসূল।' সকালে চারবার এবং সন্ধ্যায় চারবার পাঠ করবে।

(আবু দাউদ-৪/৩১৭, বুখারী-১১২০১)

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মা আসবাহাবী মিননি'মাতিন আওবি আহাদিন মিন খালক্বিক্বা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকরু।

৮১. 'হে আল্লাহ! আমার সাথে যে নেয়ামত প্রাপ্ত অবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, কিংবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে, এসব নেয়ামত তোমার নিকট হতে। তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার হকদার তুমি।'

যে ব্যক্তি সকাল বেলায় এই দু'আ পাঠ করল সে যেন সে দিনের শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করল সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। (আবু দাউদ-৪/৩১৮)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী লা-ইলা হা ইল্লা-আন্তা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যু বিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউ'যুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি, লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

৮২. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান কর, আমার চোখের নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী এবং দারিদ্র্যতা থেকে, আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি আযাব হতে। তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।

(আবু দাউদ-৪/৩২৪, আহমদ-৫/৪২)

সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে।

৮৩. যে ব্যক্তি এই দু'আটি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে ইহকাল ও পরকালের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন–

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণ : হাসবিইয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাববুল 'আরশিল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের একমাত্র প্রতিপালক।'

(আবু দাউদ-৪/৩২১)

৮৪. তিনবার পাঠ করবে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আউ'যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্বা।

অর্থ : আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা তাঁর নিকট আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(তিরমিযী-৩/৮৭, আহমদ-২/২৯০, মুসলিম-৪/২০৮০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ : فِى دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ، وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ، وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَمِنْ خَلْفِىْ، وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ، وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আ-খিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়াদুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী, ওয়া-মা-লী আল্লা-হুম্মাসতুর 'আউরা-তী ওয়ামিন রাও'আ-তী আল্লাহুম্মাহফাযনী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আ'উযু বি' আযামাতিকা আন উগতা-লা-মিন তাহতী।

৮৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের ক্ষমা নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ক্ষমা আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা।

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীর দোষ-ত্রুটিসমূহ আবৃত করে রাখ, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ আমার সম্মুখের সকল বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর

ঊর্ধ্বদেশের গযব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-২/৩৩২)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّنَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانَ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا، اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি ফাত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রাব্বা কুল্লি শাইইন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আউ'যুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশার কিহি ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফসী সূ'আন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

৮৬. হে আল্লাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রভু প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর অধিকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা 'আসমিহী শাই'উন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা-য়ী ওয়াহুয়াস সামী'উল আলীম।

৮৭. আমি সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামে শুরু করলে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো বস্তুই কোনোরূপ অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী) (তিনবার বলবে)

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا-

উচ্চারণ : রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন, নাবিয়্যান।

৮৮. আমি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী রূপে লাভ করে পরিতুষ্ট। (তিনবার বলবে) (তিরমিযী-৫/৪৬৫, আহমদ-৪/৩৩৭)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ : عَدَدَ خَلْقِهٖ، وَرِضَا نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ -

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী ওয়া রিযা নাফসিহী ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।

৮৯. (ভোর হলে তিনবার পাঠ করবে) অর্থ : 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যায় সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ অসংখ্যবার।' (মুসলিম-৪/২০৯০)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ -

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী।

৯০. আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে।' (একশত বার) (মুসলিম-৪/২০৭১)

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

উচ্চারণ : ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীসু আসলিহলী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারাফাতা 'আইনিন।

৯১. হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার বিনীত নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।' (হাকেম-১/৫৪৫, তারগীব-তারহীব-১/২৭)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

৯২. আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকটই প্রার্থনা করছি।' (প্রতিদিন একশতবার পড়বে।) (বুখারী-৪/৯৫, মুসলিম-৪/২০৭১)

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ : فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ـ

উচ্চারণ : আসবাহনা ওয়া আসবাহালমুলকু লিল্লা-হি রাববিল 'আ-লামীনা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাইরা হা-যাল ইয়াউমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ও নূরাহু ওয়া বারাকাতাহু, ওয়া হুদা-হু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা'দাহু।

৯৩. সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা এবং সমগ্র জগত প্রভাতে উপনীত হলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কামনা করি এই দিনের কল্যাণ, বিজয় ও সাহায্য, নূর ও বরকত এবং হেদায়েত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা এই দিনের এবং এই দিনের পরের অকল্যাণ থেকে।' অতঃপর যখন সন্ধ্যা হবে এরূপ বলবে।

(আবু দাউদ-৪/৩২২, জাদুল মা'দ-২/৩৭৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকালে যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু-লা-শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

৯৪. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।"

যে ব্যক্তি সকালে এই দু'আ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশের একজন দাস মুক্ত করার সমান পুণ্যলাভ করবে। আর তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত দিবসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের (প্ররোচনা ও বিভ্রান্তি) হতে তাকে সুরক্ষিত রাখা হয়। আর যখন সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করবে তখন অনুরূপ প্রতিফল পাবে সকাল হওয়া পর্যন্ত।'
(ইবনে মাজাহ-২/৩৩১)

বুখারী ও মুসলিম প্রতিদিন সকালে এই দু'আ একশতবার পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ، وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ، حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণ : আসবাহনা 'আলা ফিতরাতিল ইসলা-মি, ওয়া'আলা কালি; মাতিল ইখলাসি ওয়া 'আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ওয়া'আলা মিল্লাতি' আবীনা ইবরা-হীমা হানীফাম মুসলিমাও ওয়ামা কা-না মিনাল মুশরিকীনা।

৯৫. নবী করীম ﷺ সকালে এবং সন্ধ্যায় বলতেন : '(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরা প্রত্যূষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর ও ইখলাসের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীনের উপর, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের উপর, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।' (আহমদ-৩/৪০৬, ৪০৭, ৫/১২৩)

৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : বল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলব? তিনি বললেন : বল, কুলহু আল্লাহু আহাদ, (সূরা ইখলাস) এবং (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) যখন সন্ধ্যা হয় এবং সকাল হয় তখন তিনবার করে বলবে, এটিই তোমার বিপদাপদ ও ভয়ভীতি থেকে মুক্তি লাভসহ) সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট হবে।'
(আবু দাউদ-৪/৩২২, তিরমিযী-৫/৫৬৭)

২৮. শয়নকালে যে সব দু'আ পড়তে হয়

৯৭. নবী করীম ﷺ প্রতি রাতে যখন তাঁর শয্যায় গমন করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ : কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুসসামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

"তুমি বল, আল্লাহ এক, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার প্রতি সবকিছুই মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং জন্মও নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

তারপর সূরা ফালাক পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ
ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ : কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্বি, মিন শাররি মা-খালাক্বি, ওয়ামিন শাররি গা-সিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব, ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল 'উক্বাদি, ওয়ামিন শাররি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

"বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে অন্ধকারময় রাতের অনিষ্টতা থেকে যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।'

তারপর সূরা নাস পড়তেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكَ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ : কুল আউ'যু বিরাব্বিন্না-স, মালিকিননা-সি, ইলা-হিন না-সি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খাননা-সি, আল্লাযী ইয়ুওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন না-স, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান না-স।

"বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে (খান্নাস বা শয়তান থেকে), যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বীনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসাহ করতেন এবং মাসাহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।'

(বুখারী-ফতহুল বারী-৯/৬২, মুসলিম-৪/৭২৩)

৯৮. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন কর তখন আয়াতুল কুরসী পড়, সর্বদা, তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।'

আয়াতটি হলো–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম, লাহু মা-ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-ফিল আরদি, মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খালফাহুম ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা-শা-'আ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল 'আলিয়্যুল 'আযীম।

অর্থ : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরজাগ্রত, তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান সবই একমাত্র তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? আগে এবং পিছের সব কিছুই তিনি অবহিত। তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন ততটুকু। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এর দু'টির সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা মহান।" (বুখারী-ফতহুল বারী-৪/৪৮৭)

৯৯. রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রাত্রিকালে নিম্নোক্ত সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী-ফতহুল বারী-৯/৯৪, মুসলিম-/৫৫৪)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ، وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

উচ্চারণ : আ-মানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আ-মানা বিল্লাহি ওয়ামালা-ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া-রুসুলিহ। লা নুফাররিক্বু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বা-লূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফরা-নাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ূকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান ইল্লা উস'আহা লাহা-মা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাকতাসাবাত, রাব্বানা লা-তু'আ-খিযনা ইন্নাসীনা আউ আখত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা

মা-লা-ত্বা-ক্বাতা লানা-বিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগফির লানা ওয়ার হামনা আনতা মাওলা-না ফানসুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

অর্থাৎ 'রাসূল ঈমান রাখেন ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনরাও। সবাই বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না, তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং গ্রহণ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ কাউকে তাঁর সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার অর্পন করেন না, সে তাই পায় যা সে রোজগার করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি স্মরণ না করি কিংবা ভুল করে বসি, তাহলে আমাদের পাকড়াও কর না, হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপাইও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের দয়া কর। তুমি আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

১০০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার শয্যা হতে উঠে আসে, অতঃপর তার দিকে (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) ফিরে যায় সে যেনো তার লুঙ্গির এক অঞ্চল দিয়ে (অথবা কোনো তোয়ালা, গামছা প্রভৃতি দিয়ে) তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানেনা সে তার চলে যাওয়ার পর এতে কি পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শয়ন করে তখন যেন বলে–

بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِىْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ.

উচ্চারণ : বিসমিকা, রাব্বী ওয়াযা'তু জামবী ওয়া বিকা আরফা'উহু ফা'ইন আমসাকতা নাফসী, ফারহামহা-ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফাযহা-বিমা-তাহফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস সা-লিহীন।

অর্থাৎ প্রভু! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে শয্যায় স্থাপন করছি (আমি শয়ন করছি), আর তোমারই নাম নিয়ে আমি উঠব (শয্যা ত্যাগ করব) যদি তুমি (আমার নিদ্রিত অবস্থায়) আমার প্রাণ কবজ কর, তবে তুমি তাকে ছেড়ে দাও (বাঁচিয়ে রাখো) তাহলে সে অবস্থায় তুমি তার হেফাযত করো যেমনভাবে তুমি তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাযত করে থাক।

(বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১২৬, মুসলিম ৪/২০৮৪)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা খালাক্বতা নাফসী ওয়া আনতা তাওয়াফফা-হা, লাকা মামা-তুহা ওয়া মাহইয়া-হা-ইন আহ ইয়াইতাহা ফাহফাযহা, ওয়াইন আমাত্তাহা ফাগফিরলাহা আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকাল 'আ-ফিয়াতা।

১০১. হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমি এর মৃত্যু ঘটাবে (অতএব) তার জীবন ও মরণ যেন একমাত্র তোমার জন্য হয়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখ তাহলে তুমি তার হেফাযত কর, আর যদি তার মৃত্যু ঘটাও নিদ্রাবস্থায় তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম-৪/২০৮৩, আহমদ-২/৭৯)

১০২. নবী করীম ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন তাঁর ডান-হাতটিকে তাঁর গালের নিচে রাখতেন, তারপর তিনবার বলতেন–

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াউমা তাব'আছু 'ইবা-দাকা।

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা কর সেই দিবসে যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থান করবে। (আবু দাউদ-৪/৩১১, তিরমিযী-৩/১৪৩)

শয়ন করার দু'আ–

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ـ

উচ্চারণ : বিসমিকাআল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহইয়া।

১০৩. হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠব। (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮৩)

১০৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা) এবং ফাতেমা (রা)-কে বলেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দেব না– যা তোমাদের জন্য হবে খাদেম অপেক্ষাও উত্তম? (তারপর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) গমন কর, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, ৩৩ বার 'আল হামদুলিল্লাহ' বলবে এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে। এটি খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৭/৭, মুসলিম-৪/২০৯১)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ، وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব'ঈ ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইইন ফা-লিক্বাল হাববি ওয়ান নাওয়া, ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীল, ওয়াল ফুরক্বা-নি, আ'উযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাই ইন আনতা আ-খিয বিনাসিয়াতিহি, আল্লা-হুম্মা আনতাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু-ফালাইসা বা'দাকা শাইউন, ওয়া আনতাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউনু, ইক্বযি 'আল্লাদ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি ।]

১০৫. হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু, মহা মহীয়ান আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু। হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহর তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার

উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভু! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত রাখ। (মুসলিম-৪/২০৮৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَاٰوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَفِىَ لَهٗ مُؤْوِىَ -

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব‘আমানা ওয়া সাক্বা-না ওয়া কাফা-না ওয়া আ-ওয়া-না ফাকাম মিম্মান লা কা-ফিয়া লাহু ওয়ালা মু’ওয়িয়া।

১০৬. সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য– যিনি আমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন, পান করেছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করিয়েছেন। এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউই নেই। (মুসলিম-৪/২০৮৫)

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْءًا، اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ‘আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি রাব্বা কুল্লি শাই’ইন, ওয়ামালীকাহু, আশহাদু আললা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আ'উযুবিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়াশির কিহী, ওয়া আন আক্বতারিফা ‘আলা নাফসী সূআন, আউ আজুররহু ইলা-মুসলিম।]

১০৭. ৮৬ নং দু'আয় এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (আবু দাউদ-৪/৩১৭, তিরমিযী-৩/১৪২)

১০৮. নবী করীম ﷺ সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী, নাসাঈ)

১০৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তুমি (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) তোমার শয্যায় গমন করবে তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযূ করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে।

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَامِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াদতু আমরী 'ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআল জা'তু যাহরী ইলাইকা রাগবাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজা-মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল লাযী আরসালাতা।

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলাম, আর এ সবই করলাম তোমার রহমতের প্রত্যাশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ব্যতীত, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার সেই নবী ﷺ-এর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি তুমি (এই দু'আ পাঠের পর ঐ রাত্রিতেই) মৃত্যুবরণ কর তবে ফিৎতরাতের উপরে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।'

(বুখারী-ফতহুল বারী-১১/১১৩, মুসলিম-৪/২০৮১)

২৯. বিছানায় শোয়াবস্থায় পড়ার দু'আ

১১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শোয়াবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন বলতেন–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ الْـوَاحِدُ الْـقَـهَّارُ، رَبُّ الـسَّـمٰـوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَـا بَـيْـنَـهُـمَـا الْـعَـزِيْـزُ الْـغَـفَّـارُ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়াহিদুল কাহ্হার, রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনা হুমাল 'আযীযুল গাফফা-র।

ক্রোধান্নিত এক আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত বস্তুসমূহের প্রতিপালক, তিনি মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল। (হাকেম ও নাসাঈ)

৩০. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে যে দু'আ পড়তে হয়

اَعُوْذُ بِـكَلِمَاتِ اللّٰـهِ الـتَّـامَّاتِ مِنْ غَضَبِـهٖ وَعِـقَابِـهٖ، وَشَرِّ عِـبَادِهٖ، وَمِنْ هَـمَـزَاتِ الشَّـيَاطِـيْـنِ وَاَنْ يَـحْـضُـرُوْنِ.

উচ্চারণ : আউ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাদাবিহি ওয়া ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাযা-তিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আন য়্যাহদারূন।

১১১. আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব হতে এবং তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে। (আবু দাউদ-৪/১২, তিরমিযী-৩/১৭১)

৩১. কেউ স্বপ্ন দেখলে যা বলবে

১১২. নবী করীম ﷺ বলেছেন, নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে এমন কিছু অবলোকন করে যা তার কাছে ভালো লাগে সে যেন তা তার প্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারো নিকট প্রকাশ না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকট না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। সে যেন তা কারো নিকট না বলে।

অতঃপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিল তা পরিবর্তন করে। (মুসলিম-৪/১৭৭২, ১৭৭৩, বুখারী-৭/২৪)

১১৩. রাতে উঠে সালাত আদায় করবে যদি তার ইচ্ছা হয়। (মুসলিম-৪/১৭৭৩)

৩২. দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ، اِنَّهٗ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইতা, ওয়া 'আ-ফিনী ফী মান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মা-কাযাইতা ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লাইয়ুক্বযা 'আলাইকা, ইন্নাহু লাইয়াযিল্লু মান ওয়া লাইতা [ওয়ালা ইয়া'ঈযযু মান 'আ-দাইতা] তাবা-রাক্তা রাব্বানা ওয়া তা'আ-লাইতা।

১১৪. 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকতময় করে দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কারণ, তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারিত করে থাক, তোমার উপরে তো কেউই ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই, তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ সে কোনো দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ সে কোনো দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।
(আবু দাউদ, আহমদ, দারাকুতনী, হাকেম, তিরমিযী-১/১৪৪, ইবনে মাজাহ-১/১৯৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ، لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদা-কা মিন সাখাত্বিকা ওয়াবি মু'আ-ফাতিকা, মিন 'উকুবাতিকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা, লা উহসী সানা-আন 'আলাইকা আনতা কামা-আসনাইতা 'আলা নাফসিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার অসন্তুষ্টির পরিবর্তে তোমার সন্তুষ্টি চাচ্ছি। তোমার শাস্তির পরিবর্তে তোমার ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারব না। যেমনিভাবে তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ।

১১৫. ৪৭ নং দু'আয় এর অনুবাদ করা হয়েছে।

(আবু দাউদ, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে মাজাহ-১/১৯৪, তিরমিযী-৩/১৮০)

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ، وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحَقٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু, ওয়ালাকানুসাল্লী ওয়ানাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু নারজু রাহ রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা 'আযা-বাকা, ইন্না 'আযা-বাকা বিল কা-ফিরীনা মুল হাক্ব, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা, ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়ানুসনী 'আলাইকাল খাইর' ওয়ালা-নাকফুরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাখযা'উ লাকা, ওয়া নাখলা'উ মাই য়্যাকফুরুকা।

১১৬. হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, তোমারই জন্য সালাত আদায় করি ও সিজদা করি, তোমারই দিকে অগ্রসর হই এবং তোমারই আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী হই, তোমারই রহমতের প্রত্যাশা করে থাকি।

তোমার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরদের বেষ্টন করবেই। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উত্তম প্রশংসা করি, আর তোমার কুফরী থেকে বিরত থাকি। একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই আনুগত্য করি, আর যে তোমার কুফরী করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বায়হাকী-২/২১১, ইরওয়াউল গলীল-২/১৭০)

৩৩. বিতর সালাতের সালাম ফিরানোর পর দু'আ

১১৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর সালাতের সূরা আ'লা এবং সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন অতঃপর যখন সালাম ফিরাতেন তিনবার বলতেন–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ - সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দুসি।

এবং তৃতীয়বারে সশব্দে আওয়াজ দীর্ঘ করে বলতেন।

(নাসাই-৩/২৪৪, দারে কুতনী-২/৩১)

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ - রাব্বিল মালা-ইকাতি ওয়ার রূহ।

৩৪. বিপদ ও দুশ্চিন্তায় পড়াকালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ، اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ، وَنُوْرَ صَدْرِىْ، وَجَلَاءَ حُزْنِىْ، وَذَهَابَ هَمِّىْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা ইবনে 'আবদিকাব নু'আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মা-যিন ফিয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিয়্যাকাযা-'উকা, আস'আলুকা বিকুল্লিসিমিন হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ সাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিকা, আবিসতা'সারতা বিহি ফী 'ইলমিলগাইবি 'ইনদাকা আন তাজ'আলাল কুর'আ-না রাবী'আ-ক্বালবী, ওয়া নূরা সাদরী ওয়া জালা-'আ হুযনী ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

১১৮. হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে,

তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী।
(আহমদ-১/৩৯১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি-ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়ালজুবনি ওয়াযালা 'ইদদাইনি ওয়াগালাবাতির রিজা-ল।

১১৯. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।' (বুখারী-ফাতহুল বারী-৭/১৫৮, ১১/১৭৩)

৩৫. বিপদাপদের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা-ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

১২০. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান সহনশীল, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক।'
(বুখারী-ফতহুল বারী ৭/১৫৪, মুসলিম-৪/২০৯২)

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আ'ইনিন ওয়া আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।

১২১. 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই রহমতের প্রত্যাশা করি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (আবু দাউদ-৪/৪২৪, আহমদ-৫/৪২)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

১২২. 'তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিযী-৫/৫২৯, হাকেম)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী লা-উশরিকু বিহী শাই'আন।

১২৩. 'হে আল্লাহ! আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাকেও শরীক করি না।' (আবু দাউদ-০২/৮৭, ইবনে মাজাহ-২/৩৩৫)

৩৬. শত্রু এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ 'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

১২৪. হে আল্লাহ! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মোকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ-২/৮৯, হাকেম)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ، وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ، بِكَ اَجُوْلُ، وَبِكَ اَصُوْلُ، وَبِكَ اُقَاتِلُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা 'আদুদী; ওয়া আনতা নাসীরা বিকা আজূলু ওয়া বিকা 'আসূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিলু।

১২৫. 'হে আল্লাহ! তুমি আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।'

(আবু দাউদ-৩/৪২, তিরমিযী-৫/৫৭২)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

১২৬. আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী-৫/১৭২)

৩৭. শক্তিধর ব্যক্তির অত্যাচারের আশংকায় পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَاَحْزَابِهِ، مِنْ خَلَائِقِكَ، اَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব'ঈ, ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। কুনলী জা-রান মিন ফুলানিবনি ফুলানিন, ওয়া আহযাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফরুত্বা 'আলাইয়্যা আহাদুম মিনহুম আউ ইয়াত্বগা, আযযা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়া-লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা।

১২৭. হে আল্লাহ! তুমি সপ্ত আকাশমণ্ডলীর প্রভু! মহা মহীয়ান আরশের প্রতিপালক! অমুকের ছেলে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট যে, কেউ আমার উপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহা পরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ছাড়া সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই।
(বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৭)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَلْمُمْسِكِ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ اَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ، وَجُنُوْدِهِ وَاَتْبَاعِهِ وَاَشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ، اَللّٰهُمَّ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবারু আল্লা-হু আ'আয্‌যু মিন খালক্বিহী জামী'আন, আল্লা-হু আ'আয্‌যু মিম্মা আখা-ফু ওয়া আহযারু, আ'উযু বিল্লা-হিল্লাযী লা-ইলা-হা

ইল্লা-হুওয়া, আল মুমসিকিস সামা-ওয়া-তিস সাব'ঈ আন ইয়া কা'না 'আলাল আরদি, ইল্লা বি ইযনিহী; মিন শাররি 'আবদিকা ফুলা-নিন; ওয়া জুনুদিহী ওয়া আতবা'ইহী ওয়া আইয়া-'ইহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি, আল্লাহুম্মা কুন লা জা-রান মিন শাররিহিম জাল্লা সানা-উকা ওয়া আযযা জা-রুকা, ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

১২৮. আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহা পরাক্রমশালী, আমি যার ভয়-ভীতির আশংকা করছি তার চেয়ে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কেউ নেই, যার অনুমতি ব্যতীত সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না-তোমার অমুক বান্দার সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারী এবং সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে।

হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার নাম অতি মহান আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। (বুখারী আল-আদাব আল-মুফরাদ-৭০৮)

৩৮. শত্রুর উপর দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা মুনযিলাল কিতা-বি সারী'আল হিসা-বিহযিমিল আহযা-ব। আল্লা-হুম্মাহযিমহুম ওয়া যালযিলহুম।

১২৯. 'হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত কর, তাদেরকে দমন ও পরাজিত কর, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।' (মুসলিম-৩/১৩৬২)

৩৯. কোনো সম্প্রদায়কে ভয় পেলে যা বলবে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাকফিনীহিম বিমা শি'তা।

১৩০. 'হে আল্লাহ! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট। ইচ্ছামতো সেরূপ আচরণ কর, যেরূপ আচরণের তারা হকদার।' (মুসলিম-৪/-২৩০০)

৪০. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

১৩১. অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তথা বলবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

উচ্চারণ : আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

উক্ত দু'আ পাঠে তার সন্দেহ বিদূরীভূত হবে।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৩৬, মুসলিম-১/১২০)

১৩২. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তি বলবে–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ .

উচ্চারণ : আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহি।

আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। (মুসলিম-১/১১৯-১২০)

১৩৩. (উক্ত ব্যক্তি) আল্লাহর এই বাণী পড়বে–

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

উচ্চারণ : হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আ-খিরু ওয়াযযা-হিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাই'ইন 'আলীম।

তিনি সর্বপ্রথম, তিনি সর্বশেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, আর সর্ববিষয়ে সুবিজ্ঞ। (সূরা হাদীদ-৩, আবু দাউদ-৪/৩২৯)

৪১. ঋণ পরিশোধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাক ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

১৩৪. হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট দান কর। (হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয়) এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (তুমি ছাড়া যেনো আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।)

(তিরমিযী-৫/৫৬০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়াল হুযনী, ওয়াল 'আজযি ওয়ালকাসালি, ওয়াল বুখলি, ওয়ালজুবনি ওয়া যালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

১৩৫. ১২০ নং দু'আয় এর অর্থ উল্লেখ হয়েছে। (বুখারী-৭/১৫৮)

৪২. সালাতে শয়তানের প্ররোচনায় পতিত ব্যক্তির দু'আ

১৩৬. উসমান ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং কিরাতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূল ﷺ বলেন : ঐ শয়তানের নাম হচ্ছে খানযাব, যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব কর তখন তা হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, আর তোমার বাম দিকে তিনবার থুথু নক্ষেপ কর।

(মুসলিম-৪/১৭২৯)

৪৩. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلاً۔

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা-জা'আলতাহু সাহলান ওয়া আনতা তাজ'আলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলান।

১৩৭. হে আল্লাহ! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করনি, যখন তুমি ইচ্ছা কর দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য (তথা দূর) করতে পার।

(ইবনে হিব্বান-২৪২৭, ইবনে সুন্নী)

৪৪. কোনো পাপ কাজ ঘটে গেলে যা করনীয়

১৩৮. কোনো মুসলমান কোনো পাপ কাজ করে ফেললে, (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযু করে, তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে।

(আবু দাউদ-২/৮৬, তিরমিযী-২/২৫৭)

৪৫. যে সকল দু'আ শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণাকে দূর করে

১৩৯. শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করা। (আবূ দাউদ-১/২০৬, তিরমিযী-১/৭৭)

১৪০. আযান দেয়া। (মুসলিম-১/২৯১, বুখারী-১/১৫১)

১৪১. মাসনুন দু'আ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ কবরে পরিণত কর না। কেননা শয়তান ঐ ঘর হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। (মুসলিম-১/৫৩৯)

৪৬. বিপদে পড়লে যে দু'আ পড়তে হয়

১৪২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুর্বল মুমিন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। প্রত্যেক বস্তুতেই (কিছু না কিছু) কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা তোমাকে উপকৃত করবে তুমি তার প্রত্যাশী হও। আর মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিজেকে পরাভূত মনে কর না। যদি কোনো কিছু (দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ-আপদ) তোমার উপর আপতিত হয়, তবে সে অবস্থায় একথা বল না যে, যদি আমি এ কাজ করতাম বরং বল আল্লাহ তা নির্ধারণ করেছেন বলে ঘটেছে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ঘটে থাকে। কেননা, 'যদি' কথাটি শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম-৪/২০৫২)

৪৭. সন্তান লাভকারীর প্রতি অভিনন্দন ও তার প্রদুত্তরে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফিল মাউহুবি লাকা ওয়া শাকারতাল ওয়া-হিবা ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু ওয়া রুযিকতা বিররাহু।

১৪৩. আল্লাহ তোমার জন্য এই সন্তানে বরকত দান করুন, সন্তান দানকারী মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর, সন্তানটি পূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার ইহসান লাভে তুমি ধন্য হও।

অভিনন্দনের জবাবে সান্ত্বনা লাভকারী বলবে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهُ وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ.

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জাযা-কাল্লা-হু খাইরান ওয়া রাযাক্বাকাল্লা-হু মিসলাহু ওয়া আজযালা সাওয়াবাকা।

আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দান করুন, তোমাকে সুন্দর প্রতিফল দান করুন, তোমাকেও এর মতো সন্তান দান করুন এবং তোমার সাওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি করুন।

৪৮. সৃষ্টির অনিষ্ট হতে শিশুদের রক্ষার দু'আ

১৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা)-এর জন্য এই বলে আশ্রয় লইতেন ...... আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর নিকট পূর্ণ গুণাবলির বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতির চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী-৪/১১৯)

৪৯. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দু'আ

১৪৫. নবী করীম ﷺ রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন–

لَابَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

[লা বা'সা তুহূরুন ইনশা-আল্লাহ।]

কিছু না, ইনশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। (বুখারী-ফতহুল বারী-১০/১১৮)

১৪৬. নবী করীম ﷺ বলেন : কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যুর আসন্ন না হলে তার সম্মুখে সে এই দু'আ সাতবার পাঠ করবে–

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ ـ

উচ্চারণ : আসআলুল্লা-হাল 'আযীমা রাব্বাল আরশীল 'আযীমি আইয়্যাশফীকা।

আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এর ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। (সাত বার বলবে)। (তিরমিযী-২/২১০, আবু দাউদ)

৫০. রোগী দেখতে যাওয়ার ফযিলত

১৪৭. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন কোনো মুসলমান তার মুসলমান রোগী ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে বসা পর্যন্ত জান্নাতে সদ্য তোলা ফলের মাঝে চলাচল করতে থাকে। যখন সে (রোগীর পার্শ্বে) বসে পড়ে আল্লাহর রহমত তাকে ঘিরে ফেলে, সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত। আর যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয় তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত। (তিরমিযী-১/২৮৬, ইবনে মাজাহ-১/২৪৪, আহমদ)

৫১. মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়ালহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।

১৪৮. আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে একত্রিত করে দাও। (বুখারী-৭/১০, মুসলিম-৪/১৮৯৩)

১৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পানিতে দু'হাত প্রবেশ করাতেন অতঃপর আর্দ্রিত হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন এবং বলতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হু ইন্না লিল মাউতি লাসাকারা-তিন।

আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। (বুখারী-ফতহুল বারী ৮/১৪৪)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবারু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারিকা-লাহু, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুলমুলকু, ওয়ালাহুল হামদু। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়ালা হাওলা ওয়ালাকুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হু।

১৫০. আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসা মাত্রই তাঁর। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কার ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। (তিরমিযী-৩/১৫২, ইবনে মাজাহ-২/৩১৭)

৫২. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া

১৫১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়াতে যার শেষ কথা হবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

[লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্]

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ-৩/১৯০, সহীহ্ আল জামে ৫/৪৩২)

৫৩. বিপদে পতিত ব্যক্তির দু'আ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا ـ

উচ্চারণ : ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জি'উন, আল্লা-হুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা।

১৫২. আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সাওয়াব দান করুন এবং তা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান কর। (মুসলিম-২/৬৩২)

৫৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِفُلَانٍ (بِاسْمِهٖ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاَخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি ফুলা-নিন, (বিসমিহি) ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিয়্যীনা ওয়াখলুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীনা, ওয়াগফিরলানা ওয়ালাহু ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওয়্যির লাহু ফীহি।

১৫৩. হে আল্লাহ! তুমি (মৃত ব্যক্তির নাম ধরে) মাগফিরাত দান কর, যারা হেদায়েত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দাও এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে দাও। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক? আমাদের ও তার গুনাহ্ মার্জনা করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর আর তার জন্য তা আলোকময় করে দাও। (মুসলিম-২/৬৩৪)

৫৫. জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ {وَعَذَابِ النَّارِ} ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়া 'আফিহি ওয়া'ফু আনহু ওয়াআকরিম নুজুলাহু ওয়াওয়াসসি' মুদখালাহু ওয়াগসিলহু বিল মায়ি ওয়াস্‌সালজি ওয়ালবারাদি ওয়ানাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়তাস সাওবাল আবয়াদা মিনাদদানাসি ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহি ওয়া জাওজান খায়রাম মিন জাওজিহি ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আয়েযহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্‌নার।

১৫৪. হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, তার উপর রহম বর্ষণ কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ। তাকে মাফ কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর। তার বাসস্থানটা সুপ্রশস্ত করে দাও। তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির ছাড়া। তুমি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম পরিবার দান কর, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান কর এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও।'
(মুসলিম-২/৬৬৩)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগিরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহয়্যায়তাহু মিন্না ফাআহয়্যেহি আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফায়তাহু মিন্না ফাতাআফফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু অলা-তুযিল্লানা বাদাহু।

১৫৫. 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছ তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ, আর যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সাওয়াব হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না। '(ইবনে মাজাহ-১/৪৮০, আহমাদ-২/৩৬৮)

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানা ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা ফাকিহ মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আযাবিন-নার ওয়া আনতা আহলুল ওফায়ি ওয়াল-হাক্কি ফাগফিরলাহু ওয়ারহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

১৫৬. হে আল্লাহ! উমুকের পুত্র উমুক তোমার যিম্মায়, তোমার প্রতিবেশীত্বে তথা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে। সুতরাং তুমি তাকে কবরের ফিৎনা এবং জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও, তুমিই তো অঙ্গীকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী। কাজেই তুমি তাকে ক্ষমা কর, এবং তার উপর রহম কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (ইবনে মাজাহ-১/২৫১, আবু দাউদ-৩/২১১)

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ احْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ، وَاَنْتَ غَنِىٌّ عَنْ عَذَابِهِ، اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ حَسَنَاتِهِ، وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আবদুকা ওয়াবনু আমাতিকাহতাজা ইলা রাহমাতিকা, ওয়া আনতা গানিয়্যুন 'আন আযাবিহি ইনকানা মুহসিনান ফাযিদ ফীহাসানাতিহি ওয়াইন কানা মুসিআন ফাতাজাওয়ায আনহু।

১৫৭. হে আল্লাহ! তোমার এক বান্দা এবং তোমার এক বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী, আর তুমি তাকে শাস্তি দেয়া হতে অমুখাপেক্ষী। যদি সে সৎ লোক হয় তবে তার নেকী আরো বৃদ্ধি করে দাও, আর যদি পাপিষ্ট হয় তবে তার পাপ কাজ এড়িয়ে যাও।' (হাকেম, জাহাবী-১/৪৫৯, আল-বানী, পৃ. ১২৫)

৫৬. জানাযার সালাতে 'ফারাত্বের' (অগ্রগামীর) জন্য দু'আ

১৫৮. মাগফিরাতের দু'আর পর বলা যায়–

اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيْعًا مُجَابًا، اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَاَعْظِمْ بِهِ اُجُوْرَهُمَا، وَاَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ اِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَسْلَافِنَا، وَاَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْاِيْمَانِ -

আল্লা-হুম্মা আয়িযহু মিন আযাবিল কাবরি আল্লা-হুম্মাজআলহু ফারাতান ওয়া জুখরান লিওয়ালিদায়হি ওয়াশাফিয়ান মুজাবান আল্লা-হুম্মা সাক্কিলবিহি মাওয়াযিনাহুমা ওয়াআযিমবিহি উজুরাহুমা ওয়া আলহিকহু বিসালিহিল মুমিনীন ওয়াজআলহু ফী কাফালাতি ইবরাহীমা ওয়াকিহি বিরাহমাতিকা আযাবালজাহিম ওয়া আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি ওয়া আহলান খায়রান মিন আহলিহি আল্লা-হুম্মাগফির লেআসলাফেনা ওয়া আফরাতেনা ওয়া মান সাবাকানা বিল ঈমান।

১৫৮. 'হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দাও। হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্য "ফারাত" (অগ্রবর্তী নেকী) ও "যুখর" (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ) হিসাবে কবুল করো, এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবূল হয়। হে আল্লাহ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও। আর এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বড় করে দাও। আর একে নেককার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও

এবং ইবরাহীম (আ)-এর যিম্মায় রাখো। আর তোমার রহমতের দ্বারা দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার এই বাসস্থান থেকে উত্তম বাসস্থান দান কর, এখানকার পরিবার পরিজন থেকে উত্তম পরিবার দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী নারী-পুরুষ ও সন্তান সন্ততিদের ক্ষমা কর এবং যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে চলে গেছেন, তাদের ক্ষমা কর।'

(আদদুরুসুল মুহিম্মা, পৃ. ১৫, আল-মুগনী-৩/৪১৬)

১৫৯. হাসান (রা) বাচ্চার (জানাযায়) সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَاَجْرًا ـ

আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাতান ওয়াসালাফান ওয়া আজরান।

হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও।' (শারহে সুন্নাহ-৫/৩৫৭, বুখারী-৬৫)

৫৭. শোকার্তাবস্থায় দু'আ

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ، وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى، ... فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ـ

ইন্নালিল্লাহি মাআখাজা ওয়ালাহু মাআ'তা ওয়াকুল্লু শায়য়িন 'ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা.. ফালতাসবির ওয়ালতাহতাসিব।

১৬০. 'আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই আর যা কিছু দিয়েছেন তাও তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর নিকট পুরস্কারের প্রত্যাশা করা উচিত।'

(বুখারী-২/৮০, মুসলিম-২/৬৩৬)

আর যদি বলে—

اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ، وَاَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ـ

উচ্চারণ : আযামাল্লাহু আজরাকা ওয়াআহসানা আযাআকা ওয়াগাফারা লেমাইয়্যেতেকা।

"আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় সাওয়াব দান করুন এবং তোমার ধৈর্য শক্তিকে আরো উত্তম করুন। আর তোমার মৃত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করুন। সুতরাং উত্তম।' (বুখারী-২/৮০, মুসলিম-২/৬৩৬)

৫৮. কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লাহি।

১৬১. '(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শের উপর রাখছি।' (আবু দাউদ-৩/৩১৪)

৫৯. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফির লাহু আল্লা-হুম্মা সাব্বিতহু।

১৬২. হে আল্লাহ!! তুমি এই মৃতকে ক্ষমা কর, তাকে সুদৃঢ় রাখ কালেমার উপর।'

'নবী করীম ﷺ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তার জন্য সঠিক জওয়াবের সামর্থ্য প্রার্থনা কর কেননা, এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে।'

(আবু দাউদ-৩/৩১৫, হাকেম)

৬০. কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ (وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ) اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম আহলাদদিয়ারে মিনাল মুমিনীনা ওয়ালমুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুনা ওয়াইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়া।

১৬৩. হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।'

(মুসলিম-২/৬৭১, ইবনে মাজাহ)

৬১. ঝড় তূফানে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়াআউযুবিকা মিন শাররিহা।

১৬৪. হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে।'

(আবু দাউদ-৪/৩২৬, ইবনে মাজাহ-২/১২২৮)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرَمَا فِيْهَا ، وَخَيْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا ، وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রামা-ফিহা ওয়া খায়রামা উরসিলাত বিহী ওয়াআ'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা ফীহা ওয়াশাররিমা উরসিলাত বিহী।

১৬৫. হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা এর সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে, আর এর ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।' (বুখারী-৪/৭৬, মুসলিম-২/৬১৬)

৬২. মেঘের গর্জনে যে, দু'আ পড়তে হয়

১৬৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআন মজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়ালমালাইকাতু মিন খীফাতিহি।

"পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা-যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেশতাগণও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে।' (মুয়াত্তা-২/৯৯২)

৬৩. বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ، عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসকেনা গায়সান মুগীসান মারীয়ান মারি'য়ান নাফেয়ান গায়রা যাররিন আজিলান গায়রা আজিলিন।

১৬৭. হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান কর যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকারক নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়।' (আবু দাউদ-৩০৩)

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا . اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا . اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا .

[আল্লা-হুম্মা আগিসনা আল্লা-হুম্মা আগিসনা আল্লা-হুম্মা আগিসনা।]

১৬৮. হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।' (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৩)

اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَاَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাসকি ইবাদাকা ওয়াবাহায়িমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ওয়াআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যেতা।

১৬৯. হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পানি পান করাও, তোমার রহমত দ্বারা পরিচালনা কর, আর তোমার মৃত শহরকে সঞ্জীবিত কর, (আবু দাউদ-১/৩০৫, আযকারে নববী, পৃ. ১৫০)

৬৪. বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

[আল্লা-হুম্মা সায়্যিবান নাফিআন।]

১৭০. 'হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষিত কর।'

(বুখারী, ফতহুল বারী-২/৬১৩)

৬৫. বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ .

উচ্চারণ : মুতিরনা বিফাযলিল্লাহে ওয়ারাহমাতিহি।

১৭১. আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।'

(বুখারী-১/২০৫, মুসলিম-১/৮৩)

৬৬. বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا . اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাওয়ালায়না অলা'আলাইনা আল্লা-হুম্মা আলাল-আকামে অযযারাবে ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতে ওয়ামানাবেতিশ শাজারে।

১৭২. 'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর।' (বুখারী-১/২২৪, মুসলিম-২/৬১৪)

৬৭. নতুন চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضٰى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ .

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবারু আল্লা-হুম্মা আহহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়ালঈমানী ওয়াসসালামাতে ওয়াল ইসলামের ওয়াততাওফিকে লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারদা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

১৭৫. 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাস, আর যাতে তুমি সন্তুষ্টি হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু।' (তিরমিযী-৫/৫০৪, দারেমী-১/৩৩৬)

৬৮. ইফতারের সময় দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

উচ্চারণ : যাহাবাযযামাউ অবতাল্লাতিল উরুকু ওয়াসাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহু।

১৭৪. 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।' (আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯)

১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সায়েমের জন্য ইফতারের সময় দু'আ কবুল হওয়ার একটা সময় রয়েছে যা ফেরত দেয়া হয় না। ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে শুনেছি, তিনি ইফতারের সময় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতি অসিয়াত কুল্লা শায়য়িন আনতাগফিরালি।

১৭৬. 'হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে তার দ্বারা প্রার্থনা জানাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।' (ইবনে মাজাহ-১/৫৫৭, শরহে আয্কার-৪/৩৪২)

৬৯. খাওয়ার পূর্বে দু'আ

১৭৭. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ আহার করে তখন সে যেন বলে-

بِسْمِ اللّٰهِ، – ["বিসমিল্লাহ"]

আর প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে-

بِسْمِ اللّٰهِ فِىْ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ ـ

উচ্চারণ : "বিসমিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখিরিহি"।

১৭৮. নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ যাকে আহার করালেন সে যেন বলে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বারেকলানা ফিহে ওয়াআতয়েমনা খাইরাম মিনহু।

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত প্রদান কর এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার খাওয়ার সুব্যবস্থা করে দাও।'

আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করালেন সে যেন বলে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বারেকলানা ফিহে ওয়াযিদনা মিনহু।

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এই খাদ্যে বরকত দান কর এবং তা আরো বেশি করে দাও।' (তিরমিযী-৫/৫০৬)

৭০. খাওয়ার পরে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতয়ামানা হাযা ওয়ারাযাকানিহে মিন গায়রে হাওলিন মিন্নী অলা কুওয়াতিন।

১৭৯. সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং ইহার সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।'

(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী-৩/১৫৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ـ

উচ্চারণ : আলহামদু-লিল্লাহি হামদান কাসিরান তায়্যেবান মুবারাকান ফিহে গায়রা মাকফিয়্যিন অলামুয়াদ্দায়্যিন অলামুসতাগনান আনহু রাব্বানা।

১৮০. 'পাক পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, হে আমাদের প্রতিপালক! যে খাদ্য হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না, তা কখনও চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, আর তা হতে অমুখাপেক্ষীও না।'

(বুখারী-৬/২১৪, তিরমিযী-৫/৫০৭)

৭১. মেজবানের জন্য মেহমানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম; ফীমা রাযাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হামহুম।

১৮১. হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছ তাতে তাদের জন্য বরকত প্রদান কর, তাদের গুনাহ্ মাফ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ্ কর।'

(মুসলিম-৩/১৬১৫)

৭২. যে পানাহার করাল তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্ব'ঈমান 'আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

১৮২. 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।' (মুসলিম-৩/১২৬)

৭৩. গৃহে ইফতারের দু'আ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ـ

উচ্চারণ : আফত্বারা 'ইনদাকুমুস স-ইমূনা, ওয়া 'আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়া ওয়া সাল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-'ইকাতু।

১৮৩. 'তোমাদের সাথে ইফতার করল সায়েমগণ, তোমাদের আহার গ্রহণ করল সৎলোকগণ এবং তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করলো ফেরেশতাগণ।'

(আবূ দাউদ-৩/৩৬৭, আলবনী-পৃ:-১০৩)

৭৪. সায়েম ব্যক্তির নিকট খাদ্য উপস্থিত হলে পড়বে

১৮৫. 'নবী করীম ﷺ বলেন : 'তোমাদের কাউকে যখন দাওয়াত দেয়া হয় তখন সে যেন ঐ ডাকে সাড়া দেয়। সে যদি সিয়ামরত অস্থায় থাকে তাহলে সে যেন দু'আ করে দেয় (দাওয়াত দাতার জন্য) আর সে অবস্থায় না থাকলে পানাহার করবে।' (মুসলিম-২/১০৫৪, বুখারী-৪/১০৩, মুসলিম-২/৮০৬)

৭৫. রোযাদারকে গালি দিলে সে যা বলবে

اِنِّىْ صَائِمٌ، اِنِّىْ صَائِمٌ - ইন্নী সা-ইমুন, ইন্নী সা-ইমুন।

১৮৫. আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

৭৬. ফলের কলি দেখার পর পঠিত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا -

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা ফী সামারিনা, ওয়াবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়াবা-রিকলানা ফী সা-ইনা, ওয়া বা রিক লানা ফী মুদ্দিনা।

১৮৬. 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বরকত দান কর। বরকত দাও তুমি আমাদের শহরে, বরকত দাও আমাদের পরিমাপ-সামগ্রী 'সা'-এ, ('সা' বলা হয় প্রায় পৌনে তিন সের ওজনের পাত্রকে) আর বরকত দাও আমাদের 'মুদ্দে'-এ।' ('মুদ' বলা হয় প্রায় আধা সের ওজনের পাত্রকে)
(মুসলিম-২/১০০০)

৭৭. হাঁচি আসলে যা বলতে হয়

১৮৭. নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে "আল-হামদু লিল্লাহ" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে, তখন প্রতিটি মুসলমান যে তা শুনবে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা (আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।) যখন সে তার জন্য বলবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" তখন সে (হাঁচি দাতা) তার উত্তরে যেন বলে–

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ -

ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়াইউছলিহু বা-লাকুম।

'আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা উত্তম করুন।' (বুখারী-৭/১২৫)

৭৮. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল-হামদুল্লিাহ বললে তার জবাব

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

উচ্চারণ : ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইয়ুসলিহু বা-লাকুম।

১৮৮. 'আল্লাহ্ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভালো করুন।'

(তিরমিযী ৫/৮২, আহমদ-৪/৪০০)

৭৯. বিবাহিতদের জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ .

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়াবা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইরিন।

১৮৯. 'আল্লাহ তোমাকে বরকত সমৃদ্ধ করুন, আর তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে কল্যাণমূলক কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত ও মিল মুহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ্য প্রদান করুন।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী-/৩১৬)

৮০. বিবাহিত ব্যক্তির নিজের জন্য দু'আ

১৯০. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রারম্ভে) অথবা যখন দাস ক্রয় করে তখন সে যেন এই দু'আ পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا شْتَرٰى بَعِيْرًا فَالْيَاْخُذْ لِذَرْوَةِ سَنَامِيْهِ وَالْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবালতাহা 'আলাইহি' ওয়া ইযাশতারা বা'ঈরান ফালইয়া'খুয বিযারওয়াতি সানামিহী ওয়ালইয়াকুল মিসলা যা-লিকা।

'তোমার নিকট এর (স্ত্রীর বা ক্রীত দাসের) কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার কল্যাণময় স্বভাবের, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হতে এবং তার আদিম প্রবৃত্তির অকল্যাণ হতে

যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর যখন কোন উট ক্রয় করবে তখন তার কুঁজ ধরে অনুরূপ বলবে।' (আবূ দাউদ-২/২৪৮, ইবনে মাজাহ-১/৬১৭)

৮১. স্ত্রী সহবাসের পূর্বের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা-রায়াক্বতানা।

১৯১. আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি), হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ, আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা হতেও শয়তানকে দূরে রাখ। (বুখারী-৬/১৪১, মুসলিম-২/১০২৮)

৮২. ক্রোধ দমনের দু'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

উচ্চারণ : আউ'যু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

১৯২. 'আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান থেকে।' (বুখারী-৭/৯৯, মুসলিম-৪/২০১৫)

৮৩. বিপন্ন লোককে দেখে যে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً ـ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাসীরিন মিম্মান খালাক্বা তাফযীলান।

১৯৩. 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগৃহীত করেছেন।' (তিরমিযী-৫/৪৯৪, ৪৯৩)

৮৪. মজলিসে যে দু'আ পড়তে হয়

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ـ

উচ্চারণ : রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাউয়াবুল গাফূর।

১৯৪. আব্দুল্লাহ 'ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গণনা করে দেখা গেছে রাসূল ﷺ একই বৈঠকে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একশতবার এই দু'আ পড়তেন।

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল।' (তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজাহ-২/৩২১)

৮৫. বৈঠকের কাফফারা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ .

উচ্চারণ : সুবহা-নাকাআল্লা-হুম্মা, ওয়াবিহামদিকা আশহাদুআ ল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

১৯৫. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো প্রভু নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।'

(আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী-৩/১৫৩, ইবনে মাজাহ)

যা দ্বারা বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়

১৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ যখন কোনো মজলিসে বসতেন বা কুরআন পাঠ করতেন অথবা কোন সালাত আদায় করতেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দগুলো দ্বারা। আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোন মজলিসে বসেন বা কুরআন তিলাওয়াত করেন অথবা কোন সালাত পড়েন, আমি আপনাকে দেখি এ সকলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই শব্দগুলো পাঠ করে (এর কারণ কি?) তিনি বলেন : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি কল্যাণমূলক কথা বলে তার সমাপ্তি হবে এই কল্যাণের উপর। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণমূলক কথা বলবে এই শব্দগুলো তার জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ .

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা ওয়া বিহামদিকা লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। (আহমদ, নাসাঈ, মুসনাদ-৬/৭৭)

৮৬. যে বলে, 'আল্লাহ্ আপনার গুনাহ্ মাফ করুক' তার জন্য দু'আ

وَلَكَ – ওয়ালাকা : আপনার জন্যও

১৯৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আগমন করলে তাঁর খাবার হতে আহার করি। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকেও (মাফ করুন)। (আহমদ-৫/৮২, নাসাঈ)

৮৭. যে তোমার প্রতি ভালো আচরণ করল তার জন্য দু'আ

১৯৮. 'যে কেউ কারো প্রতি সদাচারণ করবে, অতঃপর সে ঐ আচরণকারীকে বলবে–

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا – জাযা-কাল্লা-হু খাইরান।

"আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাহলে সে তাকে কৃতজ্ঞতার পূর্ণমাত্রায় পৌছিয়ে দিল।' (তিরমিযী হাদীস নং ২০৩৫)

৮৮. যা পাঠ করলে আল্লাহ্ দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা করবেন

১৯৯. যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করল তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে বাঁচানো হবে।

আর প্রতি সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর তার ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।' (মুসলিম-১৫৫৫)

৮৯. যে বলে 'আমি আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে ভালোবাসি তার জন্য দোয়া–

أَحَبَّكَ الَّذِىْ أَحْبَبْتَنِىْ لَهُ ـ

আহাব্বাকাল্লাযী আহবাবতানী লাহু।

২০০. 'আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসুন যার জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস।'
(আবূ দাউদ-৪/৩৩৩)

৯০. সম্পাদনকারীর জন্য দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ـ

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওমা-লিকা।

২০১. 'আল্লাহ্ তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন।'
(বুখারী-ফতহুল বারী-৪/৮৮)

৯১. ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দু'আ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْاَدَاءُ .

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়ামা-লিকা ইন্নামা-জাযা-'উস সালাফিল হামদু ওয়াল আদা-উ।

২০২. 'আল্লাহ আপনার সম্পদ ও পরিবারবর্গের বরকত দান করুন। আর ঋণদানের বিনিময় হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং সময়মত নির্ধারিত বিষয় আদায় করা।'
(নাসাঈ, পৃ-৩০০, ইবনে মাজাহ-২/৮০৯)

৯২. শিরক থেকে বেচেঁ থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়াআসতাগ ফিরুকা লিমা লা-'আলামু।

২০৩. 'হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অজানা অবস্থায় (শিরক) হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (আহমদ-৪/৪০৩, সহীহ আল জামে-৩/২৩৩)

৯৩. হাদিয়া বা সদকা দাতার জন্য দু'আ

২০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর জন্য একটি ছাগী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরিত হলে তিনি বলেন, তা (যবেহ করে) ভাগ বণ্টন করে দাও (সে মতে তাই করা হলো) খাদেম বিতরণ করে ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বলতেন, তারা কি বলল? খাদেম জবাব দিল, তারা বলল :

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ "বারাকাল্লাহু ফী-কুম" (আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন) তখন আয়েশা (রা) বলতেন– وَفِيْهِمْ بَارَكُمُ اللّٰهُ "ওয়া ফী-হিম বারাকাল্লাহু" (আল্লাহ তাদেরকেও বরকত দান করুন।) তারা যেরূপ বলেছেন আমরাও অদ্রুপ তাদেরকেও উত্তর দিলাম। অথচ আমাদের পুরস্কার (সাওয়াব)– আমাদের জন্য রয়ে গেলো।' (ইবনে সুন্নী পৃঃ ১৩৮)

৯৪. অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে যে, দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ لاَ طَيْرَ اِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা-ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা, ওয়ালা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।

২০৫. "হে আল্লাহ! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, তুমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবুদ নেই।' (আহমদ-২/২২০, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ২৯২)

৯৫. পশু বা যানবাহনে আরোহণের সময় পাঠিত দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল হামদু লিল্লা-হি, সুবহা-নাল্লাযী-সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবূনা।

সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

২০৬. 'আমি আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি ইহাকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রভু প্রতিপালকের দিকে।" তারপর তিনবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে, অতঃপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে, (অতঃপর বলবে) (????))

হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তুমি ব্যতীত গুনাহ মাফ করার আর কেহই নেই।' (আবূ দাউদ-৩/৩৪, তিরমিযী-৫/৫০১)

৯৬. সফরের দু'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ،

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهَلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَاَبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবার, 'সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা 'ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন-ক্বালিবূন।

আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস'আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বিররা ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি, মা-তারদা, আল্লা-হুম্মা হাওওয়িন 'আলাইনা সাফারানা-হা-যা ওয়াত্বওয়ি 'আন্না-বু'দাহু, আল্লা-হুম্মা আনতাস সা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিলআহলি; আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'সা-ইস-সাফারি ওয়া কা'বাতিল মানযারি, ওয়া সূ-ইল মুন ক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।

২০৭. তিনবার "আল্লাহু আকবার" (তারপর এই দু'আ পড়তেন)

অর্থ : পূত-পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য তাকে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের নিকট।" হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি পুণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবারিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে। আর যখন নবী করীম ﷺ সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন নিম্নলিখিত দু'আটিও অতিরিক্ত পাঠ করতেন–

اٰيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণ : আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূনা।

"আমরা (এখন সফর হতে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে।' (মুসলিম-২/৯৯৮)

৯৭. গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا، وَشَرَّ اَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়াতিস সাব'ঈ ওয়ামা আযলালনা, ওয়ারাব্বাল আরদীনাস সাব'ঈ ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়ামা আযলালনা, ওয়া রাব্বার রিযা-হি ওয়ামা যারাইনা, আস'আলুকা, খাইরা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা, ওয়া খাইরা মা-ফীহা, ওয়া আউ'যু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা-ফীহা।

২০৮. 'হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশের এবং এর ছায়ার প্রভু! সপ্ত যমীন এবং এর বেষ্টিত স্থানের প্রভু! শয়তানসমূহ এবং তাদের পথভ্রষ্টদের প্রভু! প্রবল ঝড়ো হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে কল্যাণ আর এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ রয়েছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অনিষ্ট হতে, এর বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা হতে।' (হাকেম, আয্ যাহবী-২/১০০)

৯৮. বাজারে প্রবেশের দু'আ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহঈ-ওয়ায়ুমী-তু ওয়াহুওয়া হায়্যিউন লা-ইয়ামূতু- বিয়াদিহিল খাইরু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাই'ঈন ক্বাদীর।

২০৯. 'আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'

(তিরমিযী-৫/৪৯১, হাকেম-১/৫৩৮)

৯৯. যান-বাহনে পা পিছলিয়ে গেলে যে, দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ – বিসমিল্লাহ!

'(আল্লাহর নামে)' (আবূ দাউদ ৪/২৯৬)

১০০. গৃহে অবস্থানকারীর জন্য মুসাফিরের দু'আ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ ـ

উচ্চারণ : আসতাওদিউ'কুমুল্লা-হুল্লাযী লা-তাযীউ,' ওয়া দা-ইউ'হু।

২১১. 'আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে অবস্থানকারী কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।' (আহমদ-২/৪০৩, ইবনে মাজাহ-২/৯৪৩)

১০১. মুসাফিরের জন্য গৃহে অবস্থানকারীর দু'আ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ـ

উচ্চারণ : আস্তাওদি'উল্লা-হা দ্বীনাকা, ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা।

২১২. আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি।' (আহমদ-২/৭, তিরমিযী-৫/৪৯৯)

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَاكُنْتَ ـ

উচ্চারণ : যাওয়াদাকাল্লা-হুত তাকওয়া, ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুনতা।

২১৩. আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন, আল্লাহ তোমার গুনাহ খাতা মাফ করুন, তুমি যেখানেই অবস্থান কর আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন।' (তিরমিযী-৩/১৫৫)

১০২. উপরে আরোহণকালে 'আল্লাহু আকবার' এবং নিচের দিকে অবতরণকালে 'সুবহানাল্লাহ' বলা

كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ـ

২১৪. যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন "আল্লাহু আকবার" বলতাম এবং যখন নিচের দিকে অবতরণ করতাম তখন বলতাম "সুবহানাল্লাহ"। (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/১৩৫)

১০৩. প্রত্যূষে রওয়ানা হওয়ার সময় মুসাফিরের দু'আ

سَمِّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ، وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، وَافْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণ : সাম্মি'আ সা-মিউ'ন বিহামদিল্লা-হি ওয়া হুসনি বালা-ইহী 'আলাইনা, রাব্বানা সা-হিবনা, ওয়া আফযিল 'আলাইনা 'আ-ইযান বিল্লা-হি মিনান না-র।

২১৫. এক সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য দিল আল্লাহর প্রশংসার আর অগণিত নিয়ামত আমাদের উপর উত্তমরূপে বর্ষিত হলো। হে আমাদের প্রভু! আমাদের সঙ্গে থাকুন, প্রদান করুন আমাদের উপর আপনার অফুরন্ত নিয়ামত, আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম-৪/২০৮৬)

১০৪. ঘরে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্বা।

২১৬. আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রর্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট হতে। (মুসলিম-৪/২০৮০)

১০৫. সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে পঠিত দু'আ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اٰيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَا، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ، وَنَصَرَ عَبْدَهٗ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাই ইন ক্বাদীর আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা-হা-মিদূনা সাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

২১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ যখন কোনো যুদ্ধ হতে অথবা হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন প্রতিটি উঁচু স্থানে আরোহণকালে তিনবার "আল্লাহু আকবার" তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন : 'আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তার কোনো অংশীদার

নেই, রাজত্ব তাঁরই, আর প্রশংসামাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা (এখন সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন।'

(বুখারী-৭/১৬৩, মুসলিম-২৯৮০)

১০৬. আনন্দদায়ক এবং ক্ষতিকারক কিছু দেখলে যা বলবে

২১৮. নবী করীম ﷺ যখন আনন্দদায়ক কিছু দেখতেন, তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ .

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা হিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস স-লি হা-তু।

'সেই আল্লাহর প্রশংসা যার নেয়ামতের কল্যাণে সমুদয় সৎকার্য সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।' অপরপক্ষে যখন কোনো ক্ষতিকর ব্যাপার দেখতেন তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ .

সকল অবস্থাতেই সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' (ইবনে সুন্নী, হাকেম)

১০৭. নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের ফযিলত

২১৯. নবী করীম ﷺ বলেন : 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।' (মুসলিম-১/২৮৮)

২২০. নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা আমার কবরকে উৎসব স্থানে পরিণত করো না, তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর, কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায় তোমরা যেখানেই থাক না কেন। (আবু দাউদ-২২১৮, আহমদ-২/৩৬৭)

২২১. নবী ﷺ বলেন : কৃপণ সেই যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো এরপরও সে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না। (তিরমিযী, ৫/৫৫১, সহীহ্ জামে-৩/২৫)

২২২. রাসূল ﷺ বলেন : পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার একদল ভ্রাম্যমান ফেরেশতা রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে দেন।' (নাসাঈ, হাকেম)

২২৩. রাসূল ﷺ আরও বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাম প্রদান করে তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের উত্তর প্রদান করতে পারি। (আবু দাউদ-২০৪১)

১০৮. সালামের প্রসার

২২৪. রাসূল ﷺ বলেন : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বস্তু শিখিয়ে দিব, না যা কার্যকরী করলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে? (সেটিই হলো), তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের বিস্তার সাধন কর, অর্থাৎ বেশি বেশি করে সালামের আদান-প্রদান কর।' (মুসলিম-১/৭৪)

২২৫. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন : যে ব্যক্তির মাঝে তিনটি বিষয় পাওয়া যাবে তার মাঝে ঈমানের সব স্তরই পাওয়া যাবে : ১. ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ২. ছোট-বড় সকলের প্রতি সালাম প্রদান করা, ৩. স্বল্প সম্পত্তি সত্ত্বেও সৎকাজে ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা।' (বুখারী ফতহুল বারী-১/৮২ মুআল্লাক)

২২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী করীম ﷺ বলেন : অপরকে তোমার আহার করানো, তোমার পরিচিত, অপরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া। (বুখারী-ফতহুল বারী-১/৫৫ মুসলিম-১/৬৫)

১০৯. কোনো কাফের সালাম দিলে জবাবে যা বলতে হবে

২২৭. নবী করিম ﷺ বলেছেন : কোনো আহলে কিতাব সালাম দিলে জবাবে বলবে :

وَعَلَيْكُمْ.

['এবং তোমার উপর হোক'।] (বুখারী-১১/৪১, মুসলিম-৪/১৭০৫)

১১০. মোরগ ও গাধার ডাক শুনলে পঠিত দু'আ

২২৮. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা মোরগের ডাক শোন, তখন আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ কামনা কর। কেননা, তা ফেরেশতাকে দেখে। আর যখন গাধার ডাক শুনো, তখন তোমরা শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা গাধা শয়তানকে দেখে থাকে।' (বুখারী-ফতহুল বারী-৬/৩৫০, মুসলিম-৪/২০৯২)

১১১. রাতে কুকুরের ডাক শুনে যে দু'আ পড়তে হয়

২২৯. 'নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা রাত্রি বেলায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক এবং গাধার চিৎকার ধ্বনি শুনবে, তখন তোমরা তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, তারা যা দেখতে পায় তোমরা তা দেখতে পাও না।' (আবূ দাউদ-৪/৩২৭, আহমদ-৩/৩০৬)

১১২. যাকে তুমি গালি দিয়েছ তার জন্য দু'আ

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتَهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ফাআইয়্যুমা মু'মিনিন সাবাবতুহু ফাজ'আল যা-লিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াউমাল ক্বিয়া-মাতি।

২৩০. রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন : হে আল্লাহ! যে কোনো মুমিনকে আমি গালি দিয়েছি ওটা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নিকট নৈকট্যের ব্যবস্থা করে দাও।' (বুখারী-ফতুহুল বারী-(১১/১৭১, মুসলিম-৪-২২০০৭)

১১৩. এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রশংসায় যা বলবে

২৩১. নবী করীম ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কারো পক্ষে তার সঙ্গীর একান্ত প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে :

اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ ـ اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ـ كَذَا وَكَذَا ـ

উচ্চারণ : আহসিবু ফুলা-নানা ওয়াল্লাহু হাসীবুহু ওয়ালা উযাককী 'আলাল্লা-হি আহাদান আহসিবুহু, ইন কা-না ইয়া'লামু যা-কা, কাযা ওয়া কাযা।

অমুক সম্পর্কে আমি এই ধারণা পোষণ করি, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, আল্লাহর উপর কার সম্পর্কে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না, তবে আমি তার সম্পর্কে (যদি জানা থাকে) এই ধারণা পোষণ করি।' (মুসলিম-৪-২২৯৬)

১১৪. কেউ প্রশংসা করলে মুসলমান তখন কি বলবে

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْ لِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ ـ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লা-তু'আ-খিযনী বিমা-ইয়াকুলূনা ওয়াগফিরলী মা-লা ইয়া'লামূনা [ওয়াজ'আলনী খাইরাম মিম্মা ইয়ায়ুননূনা]।

২৩২. হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না, [তাদের ধারণার চেয়েও ভালো বানিয়ে দাও]।

(বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৬১)

১১৫. মুহরিম ব্যক্তির হজ্জ এবং উমরাতে পঠিত তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ ـ

উচ্চারণ : লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা তলাব্বাইকা, লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা-শারীকা লাকা।

২৩৩. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, তোমার কোনো অংশীদার নেই, তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সর্ব প্রকার প্রশংসা এবং নেয়ামতের সামগ্রী সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।' (বুখারী-৩/৪০৮, মুসলিম-২/৮৪১)

১১৬. হাজরে আসওয়াদের সামনে তাকবীর বলা

২৩৪. নবী করীম ﷺ উটের উপর আরোহণ করে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেছেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌছতেন তখন সে দিকে কোনো জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।'

(বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৪৭৬)

১১৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে পাঠ করার দু'আ

২৩৫. 'নবী করীম ﷺ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করতেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ : রাব্বানা 'আ-তিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল 'আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযা-বাননা-র।

'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।

(আবূ দাউদ-২/১৭৯, আহমদ ৩/৪১১)

১১৮. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে পাঠ করার দু'আ

২৩৬. 'নবী করীম ﷺ-এর হজ্জের নিয়মাবলিতে জাবের (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ যখন সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হতেন, এই আয়াত পাঠ করতেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ।

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি আরো বলেন : "আমি তা দিয়ে আরম্ভ করব যা দিয়ে আল্লাহ পাক আরম্ভ করেছেন।" অতঃপর তিনি সাফা পর্বত হতে আরম্ভ করেন এবং তার উপর আরোহণ করে কাবা শরীফ দেখেন এবং কিবলামুখী হন, তারপর আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করেন এবং তাকবীর বলেন, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করেন :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ، اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাললা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়ানাসারা 'আবদাহু ওয়া-হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।

"আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন আর তিনি একাই শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করেছেন।" (এভাবে তিনি এর মধ্যবর্তীস্থানেও দু'আ করতে থাকেন-এই দু'আ তিনবার পাঠ করেন। (আল হাদীস) উক্ত হাদীসে আরো আছে "এভাবে তিনি মারওয়াতেও অনুরূপ করতেন যেভাবে সাফা পর্বতে করেছেন।' (মুসলিম-২/৮৮৮)

১১৯. আরাফার দিবসের দু'আ

২৩৭. শ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দু'আ, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ (আ) কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম দু'আ হচ্ছে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহা নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।' (তিরমিযী-৩/১৮৪, আলবানী-৪/৬)

১২০. মুজদালিফায় পাঠ করার দু'আ

২৩৮. যাবের (রা) বলেন : নবী করীম ﷺ "কাসওয়া" নামক উটে আরোহণ করে মুজদালিফায়ে গমন করেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেন এবং তাকবীর বলেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করেন এবং তাঁর একত্বের বর্ণনা করেন। তারপর তিনি পূর্ণ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মুজদালিফা ত্যাগ করেন।' (মুসলিম-২/৮৯১)

১২১. প্রতিটি জামরায় কংকর মারার সময় তাকবীর বলা

২৩৯. জামরাগুলোতে প্রতিটি কংকর মারার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বলতেন, অতঃপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রথম জামরা ও দ্বিতীয় জামরায় দু'হাত উঁচু করে দু'আ করতেন। অপরপক্ষে তৃতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন, আর সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসতেন।'

(বুখারী-ফতহুল বারী-৩/৫৮৩, ৩/৫৮৪, মুসলিম)

১২২. আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলবে

سُبْحَانَ اللّٰهِ – সুবহানাল্লাহ

২৪০. আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

(বোখারী-ফতহুল বারী ১/২১০, ২৯০, ৪১৪, মুসলিম-৪/১৮৫৭)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ . – আল্লাহু আকবার

২৪১. আল্লাহ অতি মহান। (বুখারী-ফতহুলবারী-৮/৪৪১, তিরমিযী-২/১০৩, ২/২৩৫, আহমদ-৫/২১৮)

১২৩. আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ আসলে যা করবে

২৪২. নবী করীম ﷺ-এর নিকট যখন কোনো সংবাদ আসত যা তাঁকে আনন্দিত করত অথবা আনন্দ দেয়া হতো তখন তিনি মহান বরকতময় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।' (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা-১/২৩৩)

১২৪. শরীরে ব্যথা অনুভবকারীর করণীয়

২৪৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমার দেহের যে স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করছ সেখানে তোমার হস্ত স্থাপন কর, তারপর বল–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ .

উচ্চারণ : আউযু বিল্লা-হি-ওঁয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া'উহাযিরু।

"বিসমিল্লাহ" তিনবার। অতঃপর সাতবার বল–

'যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহর মর্যাদা এবং কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

(মুসলিম-৪/১৭২৮)

১২৫. বদ-নযরের আশংকা থাকলে যা বলবে

২৪৪. নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ এমন কিছু দেখে যা তাকে আনন্দ দেয়, সেটা তার ভাইয়ের ব্যাপারে অথবা তার নিজের ব্যাপারে অথবা তার সম্পদের ব্যাপারে হলে (তার উচিত সে যেন এর জন্য বরকতের দু'আ করে) কারণ চক্ষুর (বদনযর) সত্য। (আহমদ-৪/৪৪৭, ইবনে মাজাহ)

১২৬. ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় যা বলবে

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . – 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

২৪৫. আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

(বুখারী-ফতহুল বারী-৬৮, মুসলিম-৪/২২০৮)

১২৭. কুরবানী করার সময় যা বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ ـ

বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবারু, [আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা] আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিননী।

২৪৬. আল্লাহর নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ মহান। (হে আল্লাহ! এ কুরবানী তোমার নিকট হতে পেয়েছি এবং তোমার জন্যই।) আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হতে কবুল কর।' (মুসলিম-৩/১৫৯৫, বায়হাকী-৯২৮৭)

১২৮. শয়তানের কুমন্ত্রণার মুকাবিলায় যা বলবে

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَاَ وَذَرَاَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَاَ فِى الْاَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ـ

উচ্চারণ : আউ'যু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতিল্লাতী লা ইয়ূজাওয়িযুহুন্না **বাররুন ওয়ালা ফা-জিরুন;** মিন শাররি মা-খালাক্বা ওয়া বারায়া ও যারাআ, ওয়া মিন শাররি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামা-'ই, ওয়া মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফীহা, ওয়ামিন শাররি মা যারাআ ফিল আরদি, ওয়ামিন শাররি মা ইয়াখরুজু মিনহা, ওয়া মিন শাররি ফিতানিল্লাইলি ওয়ান নাহা-রি; ওয়ামিন শাররি কুল্লি ত্বা-রিক্বিন ইল্লা ত্বা-রিক্বান ইয়াত্বরুকু বিখাইরিন ইয়ারাহ মা-নু।

২৪৭. আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোনো সৎলোক বা অসৎলোক অতিক্রম করতে পারে না। ঐ সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, তবে কল্যাণের পথিক ছাড়া হে দয়াময়।' (আহমদ-৩/৪৯, ইবনে সুন্নী)

১২৯. তওবা ও ক্ষমা চাওয়া

২৪৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর শপথ! আমি দিনে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। (বুখারী-১১/১০১)

২৪৯. রাসূলুল্লাহ বলেন : হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই আমি তাঁর নিকট দিনে একশতবার তওবা করে থাকি।' (মুসলিম-৪/২০৭৬)

১৩০. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পড়বে

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ الاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল 'আযীমাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া 'আতূবু ইলাইহি।

২৫০. 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সদা বিরাজমান, আর আমি তাঁরই নিকট তওবা করছি। তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়নকারী হয়।' (আবূ দাউদ-২/৮৫, তিরমিযী-৪/৬৯)

২৫১. নবী করীম ﷺ বলেন : 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার অধিকতর নিকটবর্তী হন রাত্রির শেষের দিকে, ঐ সময় যদি তুমি আল্লাহর যিকরে মগ্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে সমর্থ হও, তবে তুমি তাতে মগ্ন হবে।' (তিরমিযী-৩/১৮৩, নাসাঈ-১/২৭৯)

২৫২. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'বান্দা যখন সিজদায় অবনত থাকে, তখন সে তার প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা ঐ অবস্থায় বেশি করে দু'আ পাঠ কর।' (মুসলিম-১/৩৫০)

২৫৩. আগার আল মুজানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু সময়ের জন্য আমার অন্তরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। আর আমি দিনে একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

(মুসলিম-৪/২০৭৫)

১৩১. তাসবীহ তাহমীদ, তাকবীর ও তাহলীলের ফযিলত

২৫৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি দিনে একশত বার–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহী।

পাঠ করে তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে। (বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/২০৭১)

২৫৫. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

'যে ব্যক্তি এই দু'আটি দশবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন দাসকে মুক্ত করার সমান সাওয়াব পাবে।' (বুখারী-৭/৬৮, মুসলিম-৪/২০১৭)

২৫৬. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুটি কলেমা এমন যা যবানে (উচ্চারণ করতে) সহজ, (কিয়ামত দিবসে) ওজনে ভারী, তা করুণাময় আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়, কালেমা দুটি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

'আল্লাহর প্রশংসা করার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, কি পবিত্র মহান আল্লাহ।' (বুখারী-৭/১৬৮, মুসলিম-৪/০২৭২)

২৫৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবারু।

আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি-সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

এ কালেমাগুলো আমার যবানে উচ্চারিত হওয়া, সূর্য যে সমস্ত জিনিসের উপর উদিত হয়, সে সমূদয় জিনিসের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এ কালেমাগুলো আমার মুখে উচ্চারিত হওয়া অধিকতর প্রিয়।'

(মুসলিম-৪-২০৭২)

২৫৮. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিনে এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে না? তখন তাঁর সাহাবাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি কি করে (এক দিবসে) এক হাজার পুণ্য অর্জন করতে পারে? নবী ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে তার জন্য এক হাজার পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।' (মুসলিম-৪/২০৭৩)

২৫৯. যাবের (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি বলবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীমি ওয়াবিহামদিহী।

'মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসাও জ্ঞাপন করেছি। তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে। (তিরমিযী-৫/১১, হাকেম-১/৫০১)

২৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! আমি কি জান্নাতসমূহের মধ্যে এক (বিশেষ) রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না? আমি বললাম, নিশ্চয় করবেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন বলেন, বল :

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ : লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

'অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।' (বুখারী-ফতহুল বারী-১১/২১৩, মুসলিম-৪/২০৭৬)

২৬১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালাম, চারটি, এর যে কোনোটি দিয়েই তুমি শুরু কর না, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কালাম চারটি হলো এই :

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ : সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।' (মুসলিম-৩/১৬৮৫)

২৬২. সা'য়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য আরব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলব, নবী ﷺ বললেন, বল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, আল্লা-হু আকবারু কাবীরানা, ওয়াল হামদুলিল্লা-হি কাসীরান, সুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীনা লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হিল 'আযীযিল-হাকীম।

'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ মহান অতীব মহীয়ান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু, আল্লাহ সমস্ত দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পুত্র পবিত্র। দুঃখ-কষ্ট ফিরানোর শক্তি কারো নেই, একমাত্র প্রতাপশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' গ্রাম্য লোকটি বলল, এগুলোতো আমার রবের জন্য, তবে আমার জন্য (প্রার্থনা জ্ঞাপনের কথা) কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ার যুক্বনী।

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি তুমি দয়া কর, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।

(মুসলিম-৪-২০৭২, আবু দাউদ-/২২০)

২৬৩. 'তারেক আল আশযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করলে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাকে প্রথম সালাত শিক্ষা দিতেন। অতঃপর এসব কথা দিয়ে দু'আ করার আদেশ দিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুক্বনী।

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযিক দান কর।

২৬৪. 'যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ "আলআমদু লিল্লাহ" আর সর্বোত্তম যিকির "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

(তিরমিযী-৫/৪৬২, ইবনে মাজাহ-২/২৪৯)

অবশিষ্ট সৎকর্মসমূহ

سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : সুবহা নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবারু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।]

২৬৫. আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মাবূদ নেই, আল্লাহ মহান, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করার কোনোই ক্ষমতা নেই, একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।' (আহমদ-৫১৩, আয-যাওয়াইদ-১/২৯৭)

১৩২. নবী করীম ﷺ যেভাবে তাসবীহ পড়তেন

২৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ কে ডান হাত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।

(আবূ দাউদ-২/৮১, তিরমিযী-৫/৫২১)

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	শব্দার্থ আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	আল লুলু ওয়াল মারজান (মুত্তাফিকুন আলাইহি) বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	১০০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ —মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন —মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না —আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম —হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) — সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা —ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন	
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন	
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায —মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন —যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা —মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় — আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা —মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে —ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) —ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের পূর্বশত —মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন — ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা – শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	ফাজায়েলে আমল	
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ -এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল -এর রোযা	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	৲৭০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল -এর অজিফা, খ. আল্লাহ কোথায়?, গ. পাঞ্জে সূরা, ঘ. চল্লিশ হাদীস, ঙ. বিয়ে ও তালাক, চ. খাছ পর্দা, ছ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, জ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায় ঝ. তওবা ও ক্ষমা, ঞ. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত, ট.আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঠ. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার)।
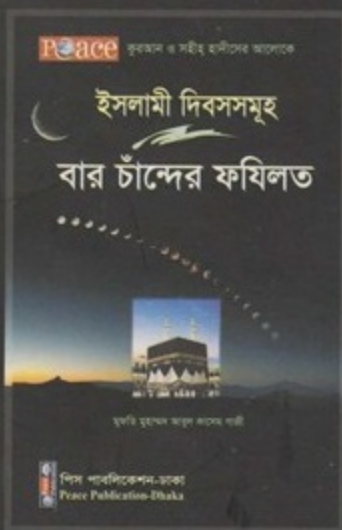
পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peace rafiq56@yahoo.com